[illegible]

প্রমথ-নাথ-বিশী

২০৩৮

পদ্মা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০৩৮

প্রথম সংস্করণ
১লা শ্রাবণ, ১৩৪২

মূল্য দুই টাকা

শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়

প্রীতিভাজনেষু—

ভূমিকা

অধিকাংশ পাঠক মূর্খ। মূর্খের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহাদের মূর্খতার মাত্রা কখনো কমিবে না। শূন্য কুম্ভের অপেক্ষা পূর্ণ কুম্ভ ভাল, যদি তাহা সত্যই জলে পূর্ণ হয়। জনসাধারণের চিত্ত শূন্য হইলে আশা ছিল, কারণ তাহা কখনো পূর্ণ হইতে পারিত, কিন্তু ইহা এমনি নিরেট যে ইহার কিছু মাত্র ধারণা-শক্তি নাই। সার্ব্বজনীন শিক্ষার কৃপায় জগতে এই জাতীয় একদল নব্য বর্ব্বরের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে এখনো তাহার পূর্ণস্বরূপ প্রকট হয় নাই, কিন্তু দিগন্তে তাহার বিকট উদ্ধত নাসিকাগ্র দেখা দিয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রভাবে যে বিরাট জনতা শিক্ষিত (সিকি-শিক্ষিত) হইয়া উঠিতেছে সভ্যতার লড়াই এবার তাহার সঙ্গে। সে লড়াইয়ের পরিণাম ইতিহাসে বহুবার ইতিপূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, এবার তাহার বিপরীত হইবার কোনো কারণ নাই। দুইটি জাতির মধ্যে, একটি সভ্য অপরটি অসভ্য, একটি শিক্ষিত অপরটি সিকি-শিক্ষিত (ইহা অশিক্ষার অপেক্ষাও ভয়ানক), এইরূপ দুইটি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সভ্য জাতির, শিক্ষিত জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ইহা ইতিহাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ নিয়ম। রোমক, গ্রীক প্রভৃতি সকল সভ্যতাই এশিয়াগত বর্ব্বর জাতি সঙ্ঘের সংঘাতে যে আঘাত পাইয়াছিল তাহার ফল তাহাদের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছে। য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধ-শেষ-করার যুদ্ধটা হইয়া গেল (যুদ্ধ শেষ করার নহে; আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম যুদ্ধ) তাহার মত ভীষণ ব্যাপার নাকি পূর্ব্বে আর হয় নাই। (কথাটা য়ুরোপীয়েরা

দুঃখের সহিত স্বীকার করে কিনা আমার সন্দেহ হয়; তাহাদের উক্তিতে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব্বের ভাব আছে।) এযুদ্ধে যে যুধ্যমান জাতি বিনষ্ট হয় নাই (যদিও এখনো সময় যায় নাই। তবু তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, নতুবা আমার যুক্তির গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যায়।) তাহার কারণ ইহাদের মধ্যে সভ্যতার ভেদ তেমন গুরুতর ছিল না।

এই সত্যটাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোপ করিলে দেখি এবারকার দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্ব মহাযুদ্ধের চেয়ে কম নয়, জগতের যথার্থ জ্ঞানী ও নব্য বর্ব্বরদের মধ্যে। এই বৃহৎ বর্ব্বর-সম্প্রদায় স্বকীয় কুরুচি, অশিক্ষা, মানসিক স্থূলতা ও মনঃপ্রকর্ষের অভাব দ্বারা ইতিমধ্যেই জগতের সঞ্চিত মানসিতাকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। য়ুরোপের সকল দেশের সাহিত্যেই এই মন্দা আজ লক্ষিত। আজকাল প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে তাহার সারবত্তা কমিয়াছে। এই বিরাট বর্ব্বরের গল্পগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইতে পারে এমন সাধ্য কাহারো নাই। সিকি-শিক্ষার কৃপায় বিজ্ঞানের প্রতিও ইহার লোভের অন্ত নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্স মিশাইয়া পপুলার সায়ান্সের দুগ্ধ এ ব্যক্তি পান করে। আমাদের দেশে ইহার প্রধান খাদ্য কঁতিনাতাল নবেল। ইহাদের জন্য জনতাযোগ্য এক সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাতে গৌণ সাহিত্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। দশহাজার গ্রন্থের মধ্যে দশখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকিতে পারে, কিন্তু আর ন'হাজার ন'শ নব্বই খানা সংখ্যার দ্বারা সত্যকে চাপিয়া মারিতেছে।

ইহা ছাড়া আবার আমাদের দেশে বেকার সমস্যা আছে। কেরানীগিরির জন্য যাহার কলম সে লেখে কবিতা; মাটি খুঁড়িবার জন্য যাহার কোদাল সে করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান; পকেট কাটিবার জন্য

যাহার কাঁচি, সে এক শিশি আঠা লইয়া সাজে সমালোচক আর সম্পাদকের কলম বোধ করি সিঁদ কাঠি পিটিয়া প্রস্তুত। আমাদের দেশে সাহিত্য রচনার ন্যূনতম গুণ একখানা হাত।

এই নব্য বর্ব্বরের প্রভাবে ও প্রসাদে সাহিত্যের গৌণ অংশ মুখ্য অংশের অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গৌণ সাহিত্য সকল সময়েই থাকে, কালিদাসের আমলেও ছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়া যাহা মরণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আছে, তাহাতে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ভীতি মুদ্রারাক্ষস, এ রাক্ষস মারে না, বাঁচাইয়া রাখে, বোধ করি বাঁচাইয়া রাখিয়াই শেষ পর্য্যন্ত মারে। এযুগে অপ্রধান সাহিত্যের প্রাধান্যের প্রথম কারণ মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ প্রসার। প্রসারের সবটাই সার নহে, বাকিটা উপসর্গ। এই উপসর্গে মানুষের ওজন-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দেয়। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ও রামশর্ম্মা দুইজনের রচনাই এমন সপ্রতিভ ভাবে তাকাইয়া থাকে যে ক্রমে পাঠকের ভেদজ্ঞান লোপ পায়। তার পরে গ্রন্থ রচনা ও বিক্রয় একটা মস্ত ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পকে ক্ষুধার অন্নের বাহন করার অর্থ ভাবজীবনকে জীবনের অভাবের সঙ্গে যুক্ত করা; গ্রন্থের সঙ্গে অর্থের গ্রন্থি পড়িয়াছে, ইহার দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। (অর্থের প্রভাব যে সংসারের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নূতনতম প্রমাণ, জনৈক অর্থনীতির অধ্যাপক সাহিত্য সম্বন্ধে অনুশাসন দিয়া থাকেন!) ছাপার অক্ষরে যেমন ভুল বোঝা যায় না মলাটেও তেমনি গোল [illegible]। কাঁচের জানালার বিচিত্রবর্ণ গ্রন্থমালা পীতালোক-দীপ্ত [illegible]নারীর মত পথিককে লুব্ধ করিতেছে। শুনিয়াছি, রুশ দে[illegible] আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, গ্রন্থপণ্য সম্বন্ধে সেখানে বি[illegible]

তাহা জানি না। শিক্ষা ও শিল্পের নামে নূতন ধরণের পাপবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। (আমার তো মনে হয় বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের শতকরা নিরানব্বই খানা বই দগ্ধ করা উচিত, আমার বইখানা বলা বাহুল্য, শততম।) কোনটা বেশি ভীতিকর? নারী-পণ্যে দেহ ও মনের অপচয়; গ্রন্থ-পণ্যে শুধু মনের। আমার মতে (আমার মত ব্যতীত আর কাহার মত গ্রাহ্য!) শেষেরটাই অধিকতর ভীষণ; সুস্থ-দেহে অসুস্থ মনের মত ভয়ঙ্কর আর কি আছে? অসুস্থ দেহ-মনে খারাপ কাজ করিবার শক্তিই চলিয়া যায়; সুস্থ দেহে অসুস্থ মন যাবতীয় অশুভ কার্য্যের মূল। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক জগতের মূল সমস্যাই ইহা।

এতক্ষণে দুইটি জিনিষ আমরা দেখিলাম। একদল নব্যবর্ব্বর আমাদের পাঠক, আর আমাদের সাহিত্য মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথ সত্ত্বেও প্রায় গ্রাম্য সাহিত্য, urbanity ইহার গুণ নয়, বড় জোর ইহা suburbanityতে পৌঁছিয়াছে। ইহা নাগর-বৃত্তি মাত্র শিখিয়াছে, এখনো নাগরিক অধিকার লাভ করে নাই। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক বুলি অনেক, কঁতিনাতাল গরম-মশলারও অভাব নাই, বৈদেশিক বাক্য অবিরল কিন্তু তাহা যেন সহরে নবাগত গ্রাম্য লোকের মুখে সহরের ভাষার মত। ইহাতেই আরো বেশি করিয়া ধরা পড়ে লোকটা গ্রাম্য।

এই অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানত পাঠক, লেখক ও সমালোচক। ইহার [illegible]তিকারের একমাত্র উপায়, নিউকাস্‌ল্‌-এ কয়লা আমদানী করা। লেখকে[illegible] লিখিতে, পাঠককে পড়িতে ও সমালোচককে বুঝিতে শিখাইতে

যাহার

লেখক

আমাদের লেখকদের প্রধান দোষ তাহারা কেবল লেখার উপরে নির্ভর করে। বাংলা সাহিত্যে এখনো সে সময় আসে নাই, যাহাতে ভালো লিখিব আবার টাকাও পাইব। কারণ এ সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠক মূর্খ। টাকা চাহিলে মূর্খের মত লিখিতে হইবে; নিজের মত লিখিলে টাকার আশা নাই। এ সাহিত্যে সার্থক রচনা নিতান্তই অর্থভাগ্যশূন্য। এখানে এক ঢিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ইহজীবন ও অমরতার, দুই পাখীকে মারা চলিবে না। আমাদের লেখকরা একথাটা বুঝিয়াও বুঝে না। তাই তাহাদের দেখিয়াছি, প্রকাশকের আপিসে শুষ্কমুখে তীর্থের কাকটির মত বসিয়া থাকিতে। তাই তাহারা বই ছাপিয়া ভূমিকায় ভীতি-গদ্‌গদ বচনে একবার স্মরণ করে পাঠককে, একবার স্মরণ করে প্রকাশককে। বইটার কৃতিত্ব যেন তাহাদেরই! যেন মগজের অপেক্ষা কাগজের মূল্য বেশি। আর প্রকাশকও এই দুর্ব্বলতার সুযোগে, কাগজ, কালি, মুদ্রাযন্ত্র, দপ্তরী সকলের বিল শোধ করে (সত্যই কি করে ?) কেবল শুষ্ক মুখে বসাইয়া রাখে লেখককে। আবার মজা এই, মূর্খ পাঠক সম্প্রদায়ও লেখকের দুর্ব্বলতার সুবিধা পাইয়া গম্ভীর মুখে গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে থাকে! (ধৃষ্টতার চরম।) মানসিক পাঠশালায় যে এখনো নিম্নতম শ্রেণীতে বসিয়া নামতা পড়িতেছে, কর্ণ মর্দ্দনের অপেক্ষা গভীরতর ইঙ্গিত যাহার পক্ষে বোঝা অসম্ভব তাহারই মুখে তুলনামূলক সমালোচনা! কিন্তু বাঙালী লেখকদের এ দুর্গতি ভোগ কেন? ইহাদের অধিকাংশই অব্যাপারে নিযুক্ত! আমাদের দেশে সাহিত্যটা একটা [illegible] শক্তির ক্ষেত্র। যাহার আর কোনো গতি নাই, সে-ই সাহিত্যে

অভ্যাস সাধনা ও শক্তি ব্যতীত যাহা লিখিত হয়, তাহাই সাহিত্য! ইহাই বোধ করি বাংলা সাহিত্যের সংজ্ঞা। মুস্কিল এই, বাংলা সাহিত্যের কোন সাধারণ মানদণ্ড না থাকায় প্রত্যেকেই নিজের মানদণ্ডে বড় লেখক! কিন্তু ব্যক্তিগত মানদণ্ড ব্যবহারের পূর্ব্বে মনে রাখা উচিত, মানদণ্ড খানা অন্তত প্রমাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক।

বাঙালী লেখকদের প্রতি আর একটা উপদেশ, তাহারা যদি রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে তবে যত বেশি সম্ভব পরের লেখা চুরি করিতে আরম্ভ করুক। তবে সে মাল যেন চুরি করিবার মত হয়। রাম শ্যামের লেখা ছাড়িয়া দিয়া পৃথিবীর বড় বড় লেখকদের দিকে দৃষ্টি দান করা উচিত। উপদেশের অপেক্ষা উদাহরণ মূল্যবান। আমি নিজেই এ গ্রন্থে অনেক পরস্বাপহরণ করিয়াছি। তবে তাহা আবিষ্কার করিবার ভার পাঠকের বুদ্ধির উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আরও একটি কথা, আমাদের লেখকগণ দু'একখানা বই লিখিয়া যেসে হইলে নানা সভা সমিতিতে মালা কুড়াইতে লাগিয়া যায়। ইহা যে কতখানি উপেক্ষণীয় হাস্যকর তাহা যদি বুঝিতে পারিবে, তবে এমন কাজ করিবে কেন, এমন লেখাই বা লিখিবে কেন?

পাঠক ও লেখকের মধ্যে কে কাহার কাছে কৃতজ্ঞ? বাঙালী লেখক পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাহাদের দোষ নাই। খারাপ বই লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাই অনুচিত। পাঠকের সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট, তার উপরে আর লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া চলে না। ধরুন, [illegible] যদি একখানা ভাল বই লিখি (যদি আর কেন? আমি [illegible] লিখি) পাঠকের কর্ত্তব্য আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া, অবশ্য মানুষ বুদ্ধি[illegible]র মত তাহার মস্তিষ্ক থাকে! বাঙালী পাঠকের কাছে তাহা [illegible]রি না, কারণ, মস্তক থাকিলেই মস্তিষ্ক থাকিবে এমন কথা

নাই। কাজেই বেদব্যাস যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই মহাপুরুষ, আমার গ্রন্থও তেমনি প্রকাশিত হইয়াই ক্লাসিক্‌স্।

সমালোচক

বাংলা মাসিকে যাহারা সমালোচনার কাজ করে, তাহাদের ঠিকাচুক্তি। পাক-প্রণালী হইতে রিলেটিভিটির সমালোচনা এক জনেই করে। বিশেষ, গ্রন্থ সমালোচনা-টা একটা সামাজিক ভদ্রতার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইলে, খাদ্য যেমনই হউক, প্রশংসা করাই সৌজন্য। সাহিত্য সমালোচনাও সেই জাতীয় একটা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। অমুকে আমার আহ্নিকতত্ত্বকে ভাল বলিয়াছে অতএব তাহার পদার্থতত্ত্বকে ভাল বলা আমার কর্ত্তব্য, আমাদের চিন্তা-ধারা এই রূপ। সাহিত্য হইয়াছে আমাদের সামাজিকতার অঙ্গ ; সত্যের সঙ্গে ইহার যেন কোন সংস্রব নাই। আবার যদি কেহ এই গোলে-হরিবোলের বাজারে সত্য কথা বলিয়া ফেলে তবে তাহাকে অসামাজিক বলিয়া একঘরে করিবার রীতি প্রায় প্রচলিত হইয়াছে।

লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, সমালোচকের উপরে এতই অবিশ্বাস তবে আবার তোমার বই সমালোচনার জন্য পাঠাও কেন ? আমি বলিব সেটা দুর্ব্বলতা ; তবে লেখকের নয়, পাঠকের ! মূর্খেরা ছাপার অক্ষরে কিছু না দেখিলে বিশ্বাস করে না। বিশেষ, এযাবৎ সমালোচকেরা নির্ব্বিচারে ভাল মন্দ বলিয়া আসিয়া যে দুষ্কৃতি করিয়াছে, আমার বইকে ভাল বলিবার অবকাশ দিয়া তাহাদিগকে সেই সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দান। কিন্তু সমালোচকদের প্রতি একটি

(অনুরোধ নয়) আছে, তাঁহারা নিজের বুদ্ধি ব্যবহার না করিয়া আমার উক্তিই সমালোচনায় উদ্ধৃত করিয়া দিবেন, নতুবা প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্ত্তে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে পারে। এবং সাহিত্যিক অপরাধের দণ্ডের জন্ত পরকাল পর্য্যন্ত হয় তো অপেক্ষা করিতে হয় না।

এই কয়টি সাধারণ কথা বলিবার জন্তই এত বড় ভূমিকা লিখিতে হইল। পাঠকেরা অধিকাংশ মূর্খ, লেখকরা অধিকাংশ লিখিতে জানে না, সমালোচকরা নিজেদের ব্যবসায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লেখকরা জানে যে পাঠকে কিছু বোঝে না, কিন্তু ভয়ে সে কথা বলিতে পারে না; তাহাদের ইচ্ছা বই বেচিয়া জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে রৌপ্য-উপল কুড়াইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ রৌপ্য-উপল কুড়াইয়া লয় প্রকাশকেরা। সম্পাদক ও সমালোচকগণ এই সব কার্য্যের সহায়ক। সত্য কথা বলিতে কি ভূমিকাই আমার প্রধান বক্তব্য, লক্ষ্য; গল্পটা উপলক্ষ্য মাত্র। শিশুকে ঔষধ পান করাইবার সময় হাতে যেমন কিছু মিষ্টি দেয়, উপন্তাসটা আমার তেমনি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, উপন্তাসখানা ঘুষ আর ভূমিকাটা ঘুষি।

প্র. না. বি.



চন্দ্রচিলমারী

১

বড়দিনের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইয়াছে। সকাল বেলার প্রচুর অবকাশে পড়িবার ঘরে বিনয় তাহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসিয়া ছিল। প্রাত্যহিক প্রথম পেয়ালা চা নিঃশেষ হইয়া দ্বিতীয় পেয়ালাও সমাপ্ত—সময় তবু কাটে না। তাস-পাশার কেহ ভক্ত নহে—হইলেও এমন সকালটা ঘরে বসিয়া কাটাইতে তাহারা রাজি নহে। সংবাদ-পত্রের স্বাদেশিক খবরেও যখন মন উঠিল না—বিনয় বলিল—চল এক কাজ করা যাক্।

কোথায় চলিতে হইবে এবং কাজটা কি জানাইবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া পড়িল, অন্য তিনজন তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল।

বাড়ীর সম্মুখেই পদ্মা। বিনয়ের একখানা ডিঙি নৌকা আছে—সেখানা ঘাটেই বাঁধা থাকে। এই চারি বন্ধুতে শীত গ্রীষ্ম কি বর্ষা প্রায়ই এই ডিঙিখানিতে করিয়া নদীতে বেড়ায়। আজও বিনয় ঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিল—অন্য তিনজন, লগি, বৈঠা লইয়া বাঁধন খুলিয়া দিল।

শীতের পদ্মা—মধ্যে প্রকাণ্ড চর, যেন মাথা তুলিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল। জল অত্যন্ত কম—অনেক স্থানেই নামিয়া নৌকা ঠেলিতে হয়। বিনয় হাল ধরিয়া নৌকা ঘুরাইয়া দিল—সকলেই বুঝিল, ওপারের চরেই তাহারা যাইতেছে। আসন্ন মটরশুঁটির আশায় দীনেশের কণ্ঠ খুলিয়া গেল।

রাজসাহীর পদ্মায় বৃহৎ এক চর পড়িয়াছে—বর্ষার জলেও তাহা ডোবে না—অনেক বসতি হইয়া গিয়াছে। এ দিকের তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ—চরটা চার ক্রোশ দীর্ঘ—এক ক্রোশ প্রস্থ—ইহার অপর দিকে পদ্মার বৃহত্তর শাখাটা বহু দূর প্রসারিত—তাহার পরেই মুর্শিদাবাদ জেলা।

এই চরে ডিঙি বাহিয়া বিনয় বন্ধুদের সঙ্গে অনেকবার গিয়াছে—এবং শীতের সন্ধ্যায় মটরের শাক ও গ্রীষ্মের রাত্রে তরমুজ চুরি করিয়া আনিয়াছে।

বিনয়ের অভ্যস্ত হাতের টানে নৌকা শীঘ্রই গিয়া চরে ভিড়িল। একখানা বড় নৌকা বাঁধা ছিল—তাহার নোঙরের সহিত ডিঙি বাঁধিয়া তাহারা রওনা হইল। প্রথমে খানিকটা শুকনা বালু—তারপরে মটর ও মসুরের ক্ষেত—মাঝ দিয়া সরু আল; দীনেশের সঙ্গীত আপাতত কচি মটরশুঁটির স্বাদে নীরব হইল—কেবল উৎকণ্ঠা ছিল অদূরবর্ত্তী গ্রামের ক্ষেত্রপতির পরিপুষ্ট যষ্টিখানি স্মরণ করিয়া।

বিনয় বলিল—চল, চর থেকে সস্তায় মুরগী নিয়ে যাওয়া যাক—কাল বনভোজন হবে।

মহীন্দ্র ঠাট্টা ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—একেবারে নিষিদ্ধ পক্ষী!

বিনয়—না, সিদ্ধ করে খাওয়া যাবে।

মহীন্দ্রের ঠাট্টা পাছে টিকিয়া গিয়া উক্ত বিহঙ্গের আশা অকালে উড়িয়া যায়—তাই দীনেশ ও প্রবীর যুগপৎ বলিয়া উঠিল—অন্ততঃ কুসংস্কার দূর করবার জন্যেও খাওয়া দরকার। কুসংস্কার দূর করিবার জন্য চারিজনে এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামী তখন বাখারি চাঁছিয়া বেড়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। গোটা দুই গরু কুলগাছটার সহিত আবদ্ধ হইয়া পরম আলস্যে রৌদ্র পোহাইতেছিল—একবার অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে আগন্তুকদের দিকে চাহিয়া জিহ্বা দিয়া পরস্পর গাত্রলেহন করিতে লাগিল।

উঠানে, আশেপাশে, গোবরের গাদায় একদল মুরগী চরিতেছিল।

বিনয়ের কথা শুনিয়া লোকটি হাতের দা মাটিতে রাখিয়া গলাটা কাসিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া গৃহস্বামী-উচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—মুরগী বিক্রি করাই তাহার পেশা বটে কিন্তু বাবুরা সন্ধ্যাবেলায় আসিলেই ভাল হয়—এখন মুরগী ধরা সহজ নহে। দীনেশ বিরক্ত হইয়া বলিল—মুরগী তাহারা এখনি চায়, সে দিতে পারে ভাল—নতুবা তাহারা অন্য বাড়ী যাইবে। অগত্যা গৃহস্বামীকে উঠিয়া তাহার ছেলেদের মুরগী ধরিবার হুকুম দিতে হইল।

তখন এক মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। মুরগীপরিবার অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া, চীৎকার করিয়া, পাখা ঝাড়িয়া, পালক খসাইয়া, উড়িয়া পাড়া অস্থির করিয়া তুলিল। মুরগীও যে উড়িতে পারে ইহার পূর্ব্বে

দীনেশের সে ধারণাটা ছিল না—সে কেবলি বলিতে লাগিল; কি অন্যায়, কি অন্যায়! অন্যায়টা কি জানি না—বোধ করি, সে ভগবানের অবিচারের কথা ভাবিতেছিল—যাহাকে খাদ্য করিয়াই সৃষ্টি করা হইল, তাহার আবার অনর্থক এক জোড়া পাখা কেন? মুরগীরা তাড়া খাইয়া গোটা দুই কুলগাছে, কয়েকটা চালের উপরে, গোটা চার পাঁচ দুর্ভেদ্য সিমগাছের মাচায় আশ্রয় লইল। আর গোটা কয়েক দুঃসাহসী ঘরের ভিতরে, জালার মধ্যে, শিকার উপরে, নানা অসম্ভব স্থানে আত্মগোপন করিল। এই মুরগী শিকারে বিনয়েরা এবং বাড়ীর মেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইয়া পড়িল। পাড়ার অন্য মেয়েরা বাবুদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহারা মাঝে মাঝে সহরে গিয়া বাবুদের দেখে বটে কিন্তু একেবারে এত কাছে বিশেষত এমন দুর্দ্দশায় দেখে নাই। বিনয়েরা তিনজন বসিয়া পড়িল—দীনেশ তখনও উড্ডীয়মান একটা মুরগীকে তাড়া করিতেছিল। বিনয় বলিল—দীনেশ একটু বিশ্রাম কর। পাখীটার দোদুল্যমান পুচ্ছটা করায়ত্ত হইয়াছে ভাবিয়া দীনেশ গম্ভীরভাবে বলিল—শরীরপাতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।

বিনয় বলিল—শরীরপাতন কার হে? মুরগীর নয় তো!

মহীন্দ্র বলিল—কিম্বা ও যে রকম ওড়বার পাল্লা দিচ্ছে—ওর হলেও বেশি আশ্চর্য্য হব না।

দীনেশ এসব তুচ্ছ ঠাট্টার উত্তর না দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বন্ধুদের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। এমন নির্ব্বাক অনুনয় উপেক্ষা করা যায় না—সকলে উঠিয়া আবার আক্রমণ সুরু করিল। এইমাত্র যে দলপতি মোরগটা এতক্ষণে তাহাদের জয়লাভ হইয়াছে মনে করিয়া গোময়স্তূপের শিখরে বুক-ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড়ের ফুল দোলাইয়া, ইতস্তত সগর্ব্ব দৃষ্টিপাত করিয়া, অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বৃক্ষচূড়াশ্রিত

পলাতক মোরগটার দিকে তাকাইয়া—সানন্দে ডাকিতে যাইতেছিল—সহসা শত্রুদলের পুনরাক্রমণে সে অপ্রত্যাশিত দ্রুতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত পলাতক স্বজাতিটার পাশে গিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিনয়ের দল নবোদ্যমে আক্রমণের জন্য যখন ব্যূহরচনা করিতেছে এমন সময়ে মেয়েদের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—ছি ছি, তোমরা মুরগী খাও!

সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, বছর পনেরো ষোলর একটি বালিকা—কথাটি বলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কথাটা নূতন নহে—বিনয়েরা এই কথাটি স্বজন পরিজন ও গুরুজনদের নিকট হইতে অনেকবার শুনিয়াছে কিন্তু তাহা আজিকার মত মর্ম্মান্তিক মনে হয় নাই। একে তাহারা মুরগী ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় পরিশ্রান্ত,—তার উপরে এমন নিদারুণ শ্লেষ—সকলেরই উৎসাহে কেমন ভাটা পড়িয়া আসিল। প্রবীর বলিল—বেলা অনেক হয়েছে, চল বিনয়, ফেরা যাক্!

বিনয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দীনেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—শুধু হাতে, তাও আবার একটা মেয়ের কথায়!

মহীন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনেই যেন কহিল—মেয়ে কোথায় হে! তন্বী!

তখনো মাঠের মধ্যে একটা ছোট জাম গাছের আড়াল হইতে তাহার দোদুল্যমান কেশের প্রান্ত দেখা যাইতেছিল। বিনয় সমস্যার সমাধান করিল—চল মুরগী যখন পাওয়া গেল না—হাঁসের খোঁজ করা যাক্!

একেবারে এত বড় পরিবর্ত্তন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বয়স যখন পঁচিশের নীচে, সম্মুখে যখন প্রচুর অবকাশ—চারিদিকে যখন শীতের রৌদ্রে নিস্পন্দ কচি রবিশস্যের ক্ষেত—আকাশের নির্মেঘ

নীলিমায় যখন অদৃশ্য চিলের করুণ ক্রন্দন—আর সুদূর দিগন্তের বন-রেখা যখন নীলাভ বাষ্প-কুহেলিকায় কম্পমান, তখন তরুণীর কণ্ঠস্বর করিতে পারে না এমন অসাধ্য কার্য্য জগতে অল্পই আছে।

অতএব হাঁসের খোঁজেই চলিতে হইল। গৃহস্বামীর আদেশে তাহার পুত্র বিনয়দের ডাকমুন্সীর বাড়ীতে লইয়া চলিল। সে নাকি হিন্দু, বাড়ীতে হাঁস আছে, বিক্রয়ও করিয়া থাকে। সরু আলের পথ বাহিয়া, দুই দিকের কঞ্চির বেড়ার কাঁটা হইতে কাপড় বাঁচাইয়া খানকয়েক বাড়ী ও তিন চারখানা আখের ক্ষেত অতিক্রম করিয়া বিনয়েরা একটি পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে আসিয়া থামিল।

উঠানে ছোট একখানি কাঠের টুল পাতিয়া অৰ্দ্ধনিমীলিত চোখে এক বৃদ্ধ রোদ পোহাইতেছিল। চাষার ছেলেটি ডাকিল—ডাকমুন্সীজি! বৃদ্ধ না ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ বাড়ী?—করিম সেখের?—চিঠি নাই। চাষার ছেলেটি বুঝাইয়া বলিল চিঠি লইতে সে আসে নাই—এই কয়টি বাবু হাঁস কিনিতে আসিয়াছে—বিক্রয়ের মত আছে কিনা!

বৃদ্ধ এইবার ফিরিয়া বিনয়দের বসিতে বলিল। তাহারা ক্লান্ত হইয়াছিল—ঘরের বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিল। বিনয় লক্ষ্য করিল—বৃদ্ধের মুখের চর্ম্ম লোল, দুই চক্ষুর নীচে খানিকটা করিয়া ফুলিয়া ওঠাতে চক্ষু দুইটি ছোট দেখায়—শাদা এক থোপা দাড়িও আছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা হাঁস চান? রাজহাঁস?

বিনয়—[illegible] কি।

বৃদ্ধ—রাজহাঁস একেবারে সেরা! কিন্তু দাম লাগবে যে।

মহীন্দ্র—দাম লাগবে বই কি!

বৃদ্ধ—কিন্তু হাঁস নিয়ে কি করবেন?

কন্যার বয়স যখন ছয় মাস—তখন সে গাঁয়ের নায়েব মহাশয়ের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিল—নিজের গাঁয়ে না ফিরিবার সে-ও এক কারণ বটে !

সংসারে খাটুনি কম, নাই বলিলেই চলে—যে জমি ছিল তাহাই আধিতে চাষ হইয়া যে ধান ও কলাই পাইত তাহাতেই তারণের সংসার চলিত। কঙ্কণ বড় হইয়া শোলার ফুল, টোপর গড়িতে শিখিয়াছিল—তাহার হাতের জিনিষ এত সুন্দর হইত যে রাজসাহী সহরে ও মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার ধারের অনেক গাঁয়ে লোকে বিবাহ-আদিতে আদর করিয়া তাহা কিনিত।

উপর্য্যুপরি দুইটা আঘাতে তারণের মাথার বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সে সারাটা সকাল উঠানে বসিয়া ডাকঘরের কাজের অভিনয় করিত। একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলি ছোট ছোট খোপ তৈয়ারী করিয়া বিভিন্ন গাঁয়ের নাম আঁটিয়া দিয়াছিল। কতকগুলা পুরাতন চিঠি ঠিকানা অনুসারে সেই সব খোপে রাখিত এবং বিকাল বেলা তাহার বাড়ীর রাখাল চিঠিগুলি পাড়ার বাড়ী বাড়ী বিলি করিয়া আসিত এই মুসলমান চাষী-পল্লীর সরল অধিবাসীরা তাহার এই খেলায় সকৌতুক আনন্দ পাইত। সকলে তারণ দাসকে ডাকমুন্সী বলিয়া ডাকিত, ক্রমে এমন হইল গাঁয়ের লোক তাহার আসল নামটি ভুলিয়া গেল। ছেলে মেয়েরা জন্মিয়াই তাহাকে ডাকমুন্সী বলিয়া জানিত। বাদল তাহার বাড়ীর রাখাল—সকাল বেলায় সে ডাকমুন্সীর এক নম্বর পিওন—বিকাল বেলা সে-ই পিওন নম্বর দুই।

নিত্যকার মত সেদিনও ডাকমুন্সী রৌদ্রে পিঠ দিয়া চিঠি সাজাইতেছিল। বারান্দায় মাদুরে বসিয়া কঙ্কণ শোলা ও রাংতা দিয়া বিবাহের টোপর গড়িতেছিল। বাদল একটা কঞ্চি দিয়া গাছ

হইতে কুল পাড়িতেছিল—পাড়ার তিন চারিটি ছেলে মেয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সংযত হইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

এমন সময়ে হাঁসটি হাতে করিয়া বিনয় আসিয়া সিমগাছের মাচার নিকটে দাঁড়াইল। আজ উক্ত হাঁসের সাহায্যে বনভোজন সমাধা হইবার কথা। কিন্তু কাল সারা রাত বিনয়ের ঘুম হয় নাই—ভোর বেলা বন্ধুরা আসিবার আগেই সে হাঁসটি লইয়া রওনা হইয়া পড়িল। আসিবার সময় টেবিলের উপরে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল—

ন খলু ন খলু দাত্রঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি হংসশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

বিনয় পিছনে দাঁড়াইয়া—কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে দেখিতে লাগিল কঙ্কণ সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকিয়া টোপর গড়িতেছে—পিছন হইতে ডান হাতের কিয়দংশ ও আঙুলগুলির মৃদু সঞ্চালন দেখা যাইতেছিল। চুল খোঁপা করিয়া জড়ানো—এক খোপা ডান হাত ও পিঠের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল—সেই চুলের স্নিগ্ধ অন্ধকার ও আঁচলের স্বচ্ছ অবকাশ দিয়া দক্ষিণ স্তনের পার্শ্বভাগ চোখে পড়িতেছিল। বিনয় বোকার মত কতক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত জানি না—হাঁসটা পরিচিত স্থান অনুভব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা উভয়েই চাহিল;—বৃদ্ধ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম? ঠিকানা কি? কঙ্কণ কাছে আসিতেই হাঁসটা ডানা ঝটপট করিয়া তাহার কোলে ছুটিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিনয় বলিল—হাঁসটা ফিরিয়ে দিতে এলাম! হাঁসটা ফিরিয়া পাইয়া কঙ্কণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কিন্তু দাম ফিরাইয়া দিলে ওষুধ হইবে না ভাবিয়া পরক্ষণেই তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধ একটু উঠিয়া আসিয়া বলিল—হাঁস খাওয়া তো ভাল—এখন শীতকাল। বিনয়ের কোনো উত্তর মনে আসিল না—হাঁ এবং না-র মাঝামাঝি কোনো একটা শব্দ কেবল মুখ হইতে বাহির হইল।

কঙ্কণ বিনয়কে একখানা মাদুর বিছাইয়া বসিতে বলিয়া হাঁসটিকে খাইতে দিতে গেল। বিনয় বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ একজন শিক্ষিত শ্রোতা পাইয়া তাহার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। বিনয়ের সেদিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না—সে দেখিতেছিল বাড়িতে তিন খানা ঘর।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পাবনা জেলায় গোবিন্দপুর দেখা আছে কি? প্রকাণ্ড গ্রাম, সোনামুখী নদীর ধারে—

বিনয় দেখিতেছিল, একখানা ঘর শোবার, একখানা গোয়াল, একখানা পাকঘর।

বৃদ্ধ বলিতেছিল—সেই গ্রামের ডাকঘর—মস্ত টিনের আটচালা। কয়েক বৎসরের মধ্যে কল্পনার বলে খড়ের চারচালা টিনের আটচালা হইয়াছে—ভবিষ্যতে কে বলিবে অট্টালিকায় পরিণত হইবে না!

—শয়ন ও পাকঘরের কাঁচা বারান্দা সুন্দর ভাবে লেপা, লাল মাটির আলপনা দেওয়া। শয়ন ঘরের চালের বাতায় এক রাশ শোলা গোঁজা।

সেই ডাকঘরে দুইটা সিন্দুক, তিনটি আলমারি, চারিজন পিওন।

—দুইটি পরিপুষ্ট গাভী রৌদ্রে দাঁড়াইয়া পরস্পরের পিঠ লেহন করিতেছিল। তাহাদের গা গড়াইয়া যেন তেল চকচক করিতেছে।

ডাক-মাষ্টারের বেতন পঁয়ষট্টি টাকা দশ আনা।

—উঠানের চারিদিকে একসার গাঁদা ফুলের গাছ—বড় বড়, জলন্ত ফুল, মিষ্ট গন্ধ ছড়াইতেছে—পাঁচ সাতটা প্রজাপতি উড়িতেছে।

এমন সময় কঙ্কণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তাইতো আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

বিনয় সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারে—কিন্তু এসব স্থানে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে বলিল—

—বাঃ, তুমি বেশ টোপর গড়তে পার তো।

—কাল একটা বিয়ে আছে—দু'খানা টোপর গড়ে দিতে হবে।

—আমাকে একটা দাও না।

—আপনার বিয়ে নাকি!

বিনয় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—দাম দেব!

—দামতো দেবেন! কিন্তু বিনা কাজে টোপর আবার কেনে কে।

—টেবিলের উপর রেখে দেব।

—কঙ্কণ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। টেবিলের উপর আবার টোপর রাখে কে! বই রাখে, দোয়াত রাখে, কলম্ রাখে।

এই উচ্ছল হাসি বিনয়ের ভালো লাগিলেও তাহার কান মুখ লাল হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা আপনাকে একটা টোপর তৈরি করে দেব।

—দাম নিতে হবে কিন্তু।

—দাম নেবো বইকি। আমরা গরীব মানুষ দাম না নিলে চলবে কি ক'রে?

—কিন্তু কবে পাবো?

—কথা দেব কেমন করে? আমি মরবার আগে নিশ্চয়ই পাবেন। বৃদ্ধ বলিল, তাহলে দামটা ফেরৎ দিতে হয়। বিনয় ব্যস্ত হইয়া বলিল, থাক থাক পরে নেব। সে সিম গাছের মাচার কাছে আসিয়া কঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করিল—গোটা কয়েক সিমের ফুল নিতে পারি?

সিমের ফুল আবার মানুষে নেয়! তার চেয়ে গাঁদা ফুল নিন্ না। দেখুন দেখি কত বড় বড় ফুল—এ আমি নিজে লাগিয়েছি—উঃ কত কষ্ট করেই না জল দিয়েছি।

বিনয়কে বাধ্য হইয়া গাঁদা ফুল লইতে হইল। ফুল লইয়া যখন উভয়ে ঘরের পিছনে সরু পথটার উপরে আসিয়া দাঁড়াইল, কঙ্কণ বলিল—একটু দাঁড়ান। বিনয় দাঁড়াইলে, সে আঁচল হইতে খুলিয়া আড়াইটা টাকা তাহার হাতে দিল। বিনয় কি একটা আপত্তি করিতে যাইতেছিল—কিন্তু সেই চোখের দিকে চাহিয়া—এবং কিছুক্ষণ আগেকার সেই হাসি মনে করিয়া আপত্তি করিতে সাহস করিল না।

টাকা লইয়া চলিতে চলিতে এতক্ষণ যে সুরের আবেশ তাহার মনে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল—কোথায় কি যেন একটা কাঁটার মত খচ্ খচ বিঁধিতে লাগিল। কিছু দূর আসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল—কঙ্কণ তখনো সেখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিনয়কে তাকাইতে দেখিয়াই যেন অপ্রস্তুত ভাবে সরিয়া গেল। এই ঘটনাটি বিনয়ের এত ভাল লাগিল যে এই মাত্র যে-সুরের জাল ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল তাহা আবার দ্বিগুণ জমিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে তাহার মুখে সঙ্গীত ধ্বনিত ও পদক্ষেপে নৃত্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এই মাত্র টাকা ফেরৎ দিবার ঘটনাটি যে তাহাকে এমন কষ্ট দিতেছিল—তাহাই অন্যভাবে মনে উদয় হইতে লাগিল। টাকা ফেরৎ দিবার সময় সে এত কাছে আসিয়াছিল যে তাহার চুলের গন্ধ পর্য্যন্ত পাইয়াছিল—বোধ হয় উত্তরে বাতাসে এক গোছা চুল উড়িয়া তাহার কাঁধও স্পর্শ করিয়াছিল। সেই চুলের গন্ধ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গাঁদা ফুলের গন্ধে মিশ্রিত হইয়া

তাহাকে অত্যন্ত উন্মনা করিয়া তুলিল। নীলাকাশব্যাপী শীতের স্বর্ণাভ রৌদ্রে এই বৃহৎ পৃথিবীকে স্বর্ণশলাকাবেষ্টিত একটি পিঞ্জরের মত মনে হইতে লাগিল। এই বিশাল পিঞ্জরে দুইটি মাত্র পাখী……।

৩

হঠাৎ অনেক দাম দিয়া বিনয় এক ছিপ কিনিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে সে কিছুদিনের জন্য মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি মৎস্য-শিকারের আগ্রহের কারণ লোকে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই দুবেলা সে মাছ ধরিতে লাগিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল—সেখানে তাহার ছিপে মাছ পড়িল না। মাছের দোষ দেওয়া যায় না—কোনো মৎস্য-অভাগ্যের নেহাৎ আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকিলে বিনয়ের ছিপে ধরা দেওয়া অসম্ভব।

তিন চার দিনের চেষ্টাতেও যখন মাছ পড়িল না, তখন বিনয় আবিষ্কার করিল, এপারের সহরের পুকুরের মাছগুলি চতুর—অতএব চরের সরল-স্বভাব মাছগুলিকে তাহার দেখা আবশ্যক।

পর দিন অতি ভোরে ছিপ লইয়া নৌকাযোগে সে ওপারের চরে গিয়া পৌঁছিল। কঙ্কণদের পাড়া হইতে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল, মনুষ্যকৃত নহে, স্থানটা নীচু, বর্ষার জল আসিয়া জমে, চৈত্র-বৈশাখেও শুকায় না। বাংলা পাঁচের আকারের সেই জলাশয়টার একদিকে একটি শিরীষ ফুলের গাছ—তাহারই তলায় বিনয় আসিয়া বসিল। জলাশয়টার চারিদিকে প্রচুর 'কাঁটাখুড়া' ও ভাঁটফুলের গাছ,

জল হইতে দুলিয়া কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠিতেছে, জলটি এমন শান্ত ও নিশ্চল যেন এখনো তাহার ঘুম ভাঙে নাই—শিরীষ শাখা হইতে এক আধটি শুক্‌না পাতা জলে পড়িতেই এমন ভাবে কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঘুমন্ত মানুষকে স্পর্শ করিলে যেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। পাশেই একটা শূকরে দাঁত দিয়া খানিকটা ঘাস ও মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, সেই স্থান হইতে একটা উদ্ভিদের ও মৃত্তিকার সিক্ত স্নিগ্ধ গন্ধ বিনয়ের নাকে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিশিরে শাদা ঘাসের উপরে বিনয় অত্যন্ত অভিভূতের ন্যায় বসিয়া রহিল। একবারও তাহার মনে হইল না—এই অবস্থায় তাহাকে লোকে দেখিলে কি মনে করিবে। জলাশয়ের কুয়াশা ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল—বিনয় ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, মাঠের চারিদিকে কুয়াশা জমিয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ তাহার মনে যে ক্ষীণ আশা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এই কুয়াশায় মাছ কি তাহার টোপ গিলিবে। ক্রমে কুয়াশা গাঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক অবলুপ্ত করিয়া ফেলিল—পুকুরের জল, পাশের আগাছা, শিরীষ গাছের কাণ্ডটি, তাহার ছিপটি, এমন কি তাহার হাত পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া উঠিল। তখন সেই সিক্ত, আর্দ্র, নিখিলপরিব্যাপ্যমান কুয়াশার অন্ধকারে হতভম্বের ন্যায় সে বসিয়া রহিল। নিজের কাছে হইতে নিজে অদৃশ্য হইয়া নিঃসঙ্কোচে সে ভাবিতে লাগিল—কি জন্য আজ এত ভোরে সে এখানে আসিয়াছে। মাছধরা! সে এত নির্ব্বোধ যে একথা বিশ্বাস করিবে। প্রাতভ্রর্মণ! উৎসাহের আতিশয্য তাহার এত অধিক নয়। সে তো কঙ্কণের জন্যই আসিয়াছিল—কিন্তু তাহার বাড়ীতে গেলেই তো চলিত, এখানে এই মাছ ধরিবার অভিনয় কেন! উভয়ের মধ্যে একটু সঙ্কোচের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে? তা! মন্দ কি—শোনা যায় ভালবাসার সূত্রপাতে এমন নাকি

হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, যে-অন্ধকারে সে নিজেকে নিজে দেখিতে পাইতেছে না—সেখানে কঙ্কণ তাহাকে অতদূর হইতে দেখিবে কি করিয়া! সত্যই ত! তখন সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিপ ফেলিল বারে বারেই মাছে 'চার' খাইয়া যায়—ধরা আর দেয় না। শেষে তাহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল, মাছগুলিকে খাদ্য দান করা। অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিল—দেখিল কুয়াশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে—মাঠের মধ্যে কে একখানা সূক্ষ্ম মসলিন ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল—সেই দিকেই বটে—যেন কে আসিতেছে। না, বোধ হয় একটা গাছ নড়িতেছে—শুধু একটা অস্পষ্ট আকার, শুধু গতির ভঙ্গি। এ ভঙ্গি তাহার পরিচিত—সম্মুখে ঈষৎ একটু ঝুঁকিয়া—বাঁ হাতটা বেশ একটু দোলাইয়া। বিনয়ের হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—এই অসময়ে অস্থানে ধরা পড়িয়া গেলে আর কোনো বাধা-ই থাকিবে না। ভালই হয়, যদি অন্ধকারে না দেখিতে পায়। কিন্তু নারীমূর্ত্তি যেন পিছাইতে লাগিল। বিনয়ের বুকটা এক হাত বসিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল—পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যায়। নারীমূর্ত্তি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুয়াশা-অন্তে তীব্রমধুর রৌদ্রে আকাশ ভরিয়া গেল। শিরীষ পাতা হইতে টপ্-টপ্ করিয়া শিশির-ফোঁটা জলে পড়িয়া টোপ তুলিতে লাগিল। ভাঁটগাছের শাদা ফুল হইতে সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় পিছন হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"ন খলু ন খলু ছীপঃ সন্নিপাতোঽয়মস্মিন্—"

বিনয় তাকাইয়া দেখিল—মহীন্দ্র ও দীনেশ। সেই হাঁস ফেরৎ দিবার পর হইতে দীনেশ তাহাকে দুষ্মন্ত এবং কঙ্কণকে শকুন্তলা

বলিয়া উপহাস করে। বলা বাহুল্য তাহার এই উপহাস গভীরতর প্রদেশ হইতে উত্থিত।

—কি হে পৌষ-পার্ব্বণের নিমন্ত্রণ কি মাছ দিয়ে খইঁড়া, মুড়কি, স্বহস্তে বধ করে!

মহীন্দ্র বলিল—ওর হাতের ধরা মাছ, ধন্যি! শেষের শব্দটা সে মনে কার তন্বীর প্রতিধ্বনি। বিনয়ের মনে পড়িল, আজ পৌষ-সংক্রান্তি, বন্ধুদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—কিন্তু মাছ-শিকারের আগ্রহে সব ভুলিয়া গিয়াছে।

বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আরে এস এস—

—ওঃ মাছ যে অনেক ধরেছ!

বিনয় বলিল—এখন কেবল অভ্যাস করছি।

মহীন্দ্র চাপাহাসির সহিত বলিল—এই নির্জ্জনে, এত ভোরে, ...ভাল ভাল। কিন্তু ওহে বিনয়, জগতে যেমন মাছ আছে তেমনি নিউমোনিয়াও আছে, অন্তত এক আধটা দাঁতাল শূওর থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে বারটার কাছাকাছি গেল।—সকলে বাড়ীর দিকে রওনা হইতেছিল—এমন সময় দেখিতে পাইল, বাদল ছুটিয়া আসিতেছে। বিনয়ের কেমন একটা ধারণা হইল, সে তাহাদিগকেই খুঁজিতেছে। বাদল কাছে আসিয়া 'দিদিমণি' বলিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

বিনয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি, অসুখ হয় নি তো!

—দিদিমণি তোমাদের ডাকছে!

এ আহ্বান অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারো ছিল না। বিনয়রা

হইয়া থাকে। ঢুকতে পৌঁছিতেই বিনয়ের হাতের ছিপ দেখিয়া কঙ্কণ পাইতেছে না—একি, আপনি মাছধরা আরম্ভ করেছেন না কি?

করিয়া! সত্ নয়, অভ্যাস করছি!

বারে বাপ চট্ করিয়া বলিল—ওর হাতে ধরা পড়বার জন্যে মাছেরও কাজ অভ্যাস করতে হবে।

—আচ্ছা, এত ঠাট্টাই যখন সকলে করছ, মনে কর না কেন—এই উপলক্ষে মাছদের খাদ্য দিচ্ছি।

মহীন্দ্র বলিল—সাংঘাতিক উপলক্ষ। উপলক্ষের বঁড়শিটা থাকে অলক্ষ্যে—খেতে এসে খাদ্যে পরিণত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়।

—দেখুন, বেলা বারটার সময় কারো বাড়ীর উঠান দিয়ে না খেয়ে চলে যাওয়া কি ভালো—আমার হাতে তো আবার ভাত খাবেন না! যাই হোক চট্ করে স্নান করে নিন না,—যা হয় কিছু জল খেয়ে নিতে আপত্তি কি?

দীনেশ তাহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল—কিছুই আপত্তি নাই।

তিনজনে একখানা ধুতি চাহিয়া লইয়া পদ্মায় স্নান করিতে গেল।

পদ্মায় অনেকটা চর পড়িয়াছে, তাহার নীচে সামান্য একটুখানি জল—অত্যন্ত অগভীর। তিনজনে আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিল, বালি লইয়া খেলিতে লাগিল, বালির উপরে নানা ছবি আঁকিতে লাগিল। মাছের আঁশের মত খাঁজকাটা জলের ছোট ছোট ঢেউ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জলতলের স্বচ্ছ সিক্ত বালিতে ছোট ছোট ছায়া ফেলিতে লাগিল। সেখানে স্রোত না থাকায় একপাশে শেওলা জমিয়াছিল তাহারি আর্দ্র গন্ধ এবং ধানবাহী গরুর গাড়ীর চাকার আর্তনাদ,

রহিয়া রহিয়া আসিতে লাগিল। ওপারে বর্ষার জলে থাক্-কাটা তীরের তলে রৌদ্রমুগ্ধ নীলাভ ছায়াখানি ছল ছল করিতে থাকিল।

তিনজনে খাইতে বসিয়া দেখে প্রচুর আয়োজন। চিঁড়া, মুড়কি, উৎকৃষ্ট দধি, গুড় এবং পাকা কলা। এতক্ষণে দীনেশের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিনয়ের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল কঙ্কণ তাহাকে কেমন অবহেলা করিতেছে, যথেষ্ট মনোযোগ তাহার প্রতি দিতেছে না। মহীন্দ্র নীরবে অভ্যস্ত চোখে বিনয়ের দুর্দ্দশা ও দীনেশের লুব্ধ ভাব দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল। বিনয়ের বিস্ময় কত—এই এতটুকু মেয়ে, সেদিন হাঁসের শোকে অস্থির —আজ কেমন সুদক্ষ গৃহিণীর মত, মাতার ন্যায় আদর ও আব্দার করিয়া খাওয়াইতে বসিয়াছে। এক হিসাবে মেয়েদের জীবনে কোনো পরিবর্ত্তন বা পরিণতি নাই। (তাহারা জন্মিয়াই মাতা—মরিবার সময়ও সেই মাতা। তাই তাহারা পুরুষের অপেক্ষা বয়সে স্বভাবতই বড়। বিশেষত এই খাওয়ানো কাজটাতেই তাহাদের মাতৃত্বের প্রধান প্রকাশ। পেটুক ছেলেটিকে মাতা বিশেষ করিয়া ভালবাসে।

—দীনেশ বাবু, আপনাকে আর একটু দই দি!

—থাক থাক! পাতে অনেকটা দই পড়িল।

—তাই ত দই বেশী হয়ে গেল—আর একটু মুড়কি!

—বাঃ আপনার গাছের কলা তো বেশ! দীনেশের পাতে আর দুটো কলা পড়িল।

—দীনেশ, খাওয়ার সময় মনে রাখা দরকার খাদ্যটা অপরের হলেও পাকস্থলীটা নিজের।

—আঃ মহীন্দ্র বাবু, আপনি নিজে খেতে পারেন না, তাই অতিথিকে ঠাট্টা করেন কেন? কলধ্বনি, তা

—বলেন কি, ঠাট্টা! পাকস্থলী নিয়ে কি ঠাট্টা চলে।

—উনি এমনই বা কি খেয়েছেন। দীনেশ বাবু, আর একটু দই!

—থাক্ থাক!

বিনয়ের মুখে গুড় তিক্ত এবং দধি কটু লাগিতেছিল।

—দেখুন, বিনয়কে কিছু দিন! কঙ্কণ পরম গম্ভীর উদাসীন ভাবে বলিল—তাই তো, বিনয় বাবুকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, তাই উনি রাগ করেছেন, বিনয় বাবু, দই—

—থাক থাক।

—আর একটু গুড়।

বিনয় যে মনোযোগ চাহিতেছিল, এখন আবার সেই মনোযোগ পাইয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

আহারান্তে তিনজনে তিনটি পান পাইল। দীনেশ পরম তৃপ্তির সহিত বলিল—বাঃ একেবারে 'ফিনিশিং টাচ' পর্য্যন্ত।

—দেখুন মহীন্দ্র বাবু, আজ পৌষ-পার্ব্বণের দিনে পিঠে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে গেরস্থর অমঙ্গল হয়।

মহীন্দ্র বলিল—এর উপরে আরো খাইয়ে ছেড়ে দিলে এই হত-ভাগ্যদের অমঙ্গল নিশ্চিত।

দীনেশ কথাটা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—আঃ মহীন, গেরস্থর মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। সে ভাবিতেছিল, বাড়ীতে পিঠার অংশ তো থাকিবেই—এটা উপরি পাওনা।

মহীন্দ্র বলিল—বেশ তাই হোক—আজ বিনয়ের বাড়ীতে খাবার ছিল তার বদলে না হয় আপনার বাড়ীতেই হবে।

টার মধ্যে কি ছিল জানি না—কঙ্কণের অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ রক্তিম হইয়া উঠিল। সে এই ত্রুটি লুকাইবার জন্য

দিল। সে-ও চোখ মুছিতে মুছিতে অর্দ্ধভুক্ত কদলীপিণ্ড গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

কোঁচড়ের মুড়কি নিঃশেষ করিয়া, আরো চারটি কলা ও কিছু মুড়কি সংগ্রহ করিয়া বাদলচন্দ্র চরে যাত্রা করিল। বিনয় বসিয়া দেখিতে লাগিল ক্ষুদ্র বালকটি দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া চরের বালু ভাঙিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে।

সে যে আধ ঘণ্টা এখানে ছিল তাহার চলিয়া যাওয়াতে বিনয়ের কেমন একটু বিষাদের মত বোধ হইতে লাগিল। যেন ঐ ছেলেটি তাহার কত প্রিয়! প্রিয়জনের চারিপার্শ্বে যাহারা থাকে—কি যাদুমন্ত্র-বলে তাহারাও প্রিয় হইয়া ওঠে—প্রিয়জনের ব্যক্তিত্বের তাহারাও যেন অংশী—তাহাদের বিচ্ছেদে প্রিয়-বিরহের দুঃখই অনুভূত হইতে থাকে

৫

এতদিন যে চাকার দাগ ধরিয়া কঙ্কণের জীবন চলিতেছিল—সহসা তাহার গতি কে পরিবর্ত্তন করিয়া দিল! সে ছিল শীতের প্রা[illegible] কুন্দফুল, তাহার দর্শক কেহ ছিল না, সে ছিল শীতের রাতের জ্যোৎস্না তাহাতে মুগ্ধ হইবার কেহ ছিল না। রূপ, যৌবন, যাহাতে মেয়েরা সচেতন হইয়া উঠে, সে সব থাকা সত্ত্বেও তাহার কোনো আত্মচৈতন্য ছিল না। এই সহজ আত্মবিস্মৃতিই রক্ষা-কবচের মত তাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

আজ তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! তাহার ক্ষুদ্র জীবন-স্রোতস্বিনীতে কোথা হইতে নূতন স্রোত আসিয়া পড়িল, তাই এত কলধ্বনি, তা[illegible]

এত উন্মাদনা! এই নূতন জীবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া পিছনে ফিরিয়া সে তাকাইল—সেই সুদূর শৈশব—গোবিন্দপুরে; সেই অতিদূর বাল্যকাল—চরচিলমারীতে। মাতৃহীন নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী তাহার পিতা—আর কাহারও অভাব সে অনুভব করিত না। কিন্তু আজ ক্ষণে ক্ষণে তাহার একি অতৃপ্তি, একি ব্যাকুলতা, একি আশা-বিমিশ্র প্রতীক্ষা। গৃহস্থালীর কাজ, গোহালের কাজ, পিতার সেবা সারিয়া তাহার হাতে যে প্রচুর অবকাশ থাকিত, সেই সময়ে শোলার ফুল, মুকুট গড়িত, সহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইত। শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া কাঁথা শেলাই করিত। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কোমরে আঁচল জড়াইয়া ফুলের গাছে জল দিত—তবু যে-সময় থাকিত বসিয়া বসিয়া বাংলা বই পড়িত—ইংরেজি হাতের লেখা লিখিত। সামান্য ইংরেজি, অনেকটা বাংলা সে পিতার নিকট হইতে শিখিয়াছিল।

এতদিন যে রুদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে নিশ্চিন্তে সে বাস করিতেছিল হঠাৎ তাহাতে প্রকাণ্ড এক ফাটল দেখা দিয়াছে। সেই অবকাশ দিয়া বৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র আভাস রহিয়া রহিয়া আসে; যাহা একদিন অজ্ঞাত ছিল আজ তাহাই অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পিতার সেবায় তাহার অবহেলা হয় না, কারণ এই অসহায় শিশুস্বভাব পিতাটি তাহার চিত্তে যুগপৎ কন্যা ও মাতৃস্নেহের উৎস খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সব কাজেই তাহার আর সেই পূর্ব্বের মনোযোগ নাই। ধবলী ও শ্যামলী পূর্ব্বের সে যত্ন পায় না, বিবাহের ফরমাইসি টোপর গড়িতে গড়িতে হঠাৎ কোন অজ্ঞাত বাসনা নিঃশ্বসিত হইয়া ওঠে—কেবল গাঁদাফুলের গাছগুলিতে জল দিবার, যত্ন করিবার অবহেলা দেখা যায় না। সে ফুলে দেবতার পূজা হয় না—বাড়ীতে বিগ্রহ নাই—পাড়ার অধিকাংশই মুসলমান—তাহারাও ফুল তুলিতে আসে না। যে দিন

বিনয় আসে, সে ফুল ভালবাসে, ফুল তোলে—তার পরে—তবে সেই জন্যই কি ফুলের গাছের এত যত্ন—কে জানে।

মাঘ মাসের শেষ। দু'তিন দিন ধরিয়া মেঘ-কুয়াশা করিয়া বৃষ্টি হইয়া সেদিনকাল মেঘনির্মুক্ত প্রভাতটি একান্ত উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। ডাকমুন্সী পাড়ার চিঠিপত্রের তদ্বির করিতে বাহির হইয়াছে, বাদল পেয়ারা গাছের তলায় সকাল বেলা ভাত খাইতেছে। কঙ্কণ ঘরের বারান্দায় নিস্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে তাকাইয়া বসিয়া ছিল।

তাহার বয়স ষোল সতেরো, এই বয়সে হিন্দু গৃহস্থের মেয়েরা বিবাহিতা হইয়া প্রায়ই মাতৃত্বলাভ করে। অথচ তাহার বিবাহের কোনই কথা নাই। ষোল বছর বয়সে বিবাহের কথা ভাবে নাই—এমন মেয়ে বাংলা দেশে বিরল! তাহায় বিবাহের কথা কে তুলিবে? পিতা! ইহা শুধু অসম্ভব নয়, হাস্যকর। সংসারে তাহাদের আর কেহই নাই—থাকিলেও সে জানে না।

[illegible]য়ের ইতিহাস সে জানে না—শুধু জানে তাহার শৈশবে তিনি স্বর্গে [illegible]য়াছেন। কিন্তু এই চরে হিন্দু বসতি থাকিতেও কেন যে অনে[illegible] এই মুসলমান-পল্লীর প্রান্তে বাস করে—ইহা সে বুঝিয়া উঠিত বাহি[illegible]আর বুঝিত না হিন্দু গৃহস্থরা তাহাদের বাড়ীতে কেন তেমন [illegible]ত করে না।

প্রান্ত[illegible]র আখ-ক্ষেতের আড়ালে একটি আগন্তুক মনুষ্য-মূর্তিকে সে নাই-[illegible]বিষ্ট মনে লক্ষ্য করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে করিম ফুলে[illegible]দিতে কাঁদিতে উঠানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

এক [illegible]দিদি-ঠাকরুণ, সব গেল।

[illegible]ণ চমকিয়া উঠিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিল। অনেক প্রশ্ন গোটা যাহা সংগ্রহ করিল তাহা এই—চরের নদীর ধারের যে

অংশটাতে কঙ্কণদের জমিতে করিম বর্গাতে চৈতালি চাষ করে—তাহারি খানিকটা পদ্মায় ভাঙিতে সুরু করিয়াছে। কঙ্কণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—সে আরো কিছু ভয়ানক ভাবিয়াছিল। তাহার অত্যন্ত কাতর ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল—পদ্মায় ভাঙলে আর আমি কি করব।

করিম বিরক্ত হইয়া উঠিল—সব কলাই মশুর গেল—আপনি হাসছ!

—আরে পাগল, কাঁদলেই কি নদী থামবে।

—আমি কি কাঁদতে কইছি—সব যে গেল।

—গেল তো গেল!. তুই পুরুষ মানুষ যদি কিছু করতে না পারিস

—আমি কি করব।

—একবার গিয়া দেখ্যা আইসেন। শেষে যে বলবেন … নতে চইতালি কম দিলাম—সে হইব না।

এতক্ষণে ব্যাপারটা কঙ্কণ বুঝিল। সে একবার ক্ষেতের … লইয়া গিয়া সাক্ষী করিয়া রাখিতে চাহে—শেষে তাহার উপ… অবিশ্বাস না হয়।

করিমের বয়স চব্বিশ, পঁচিশ। ছিপ ছিপে গড়ন—রংটা … কঙ্কণদের পাড়াতেই বাড়ী। তাহারই জমি আধিতে চা… ধান, কলাই কঙ্কণদের বাড়ী পৌছাইয়া দেয়। কঙ্কণ যাহা … মনে করে তাহা সহরে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা আনি… হাতে দেয়। দরকার হইলে জরুরি ফরমাইসটা খা… সমাজের ভয়ে গোপনে আসিয়া দিদিঠাকরুণের হাতের … খাইয়া যায়। প্রথম প্রথম সে কঙ্কণকে মা-ঠাকরুণ ডাকি… অনেক ধমক খাইয়া দিদি-ঠাকরুণে নামিয়াছে

কিছুতেই যখন সে ছাড়িল না—বাধ্য হইয়া কঙ্কণ উঠিল। এবং কৌতূহলী বাদলকে এক রকম জোর করিয়া বাড়ীর পাহারায় রাখিয়া দুইজনে ভাঙনের দিকে চলিতে সুরু করিল।

সাধারণত বাংলা দেশে মাঘ মাসের শেষে যেমন হইয়া থাকে—তিন চারিদিন বৃষ্টিবাদল, মেঘকুয়াশা অন্তে সেদিন প্রভাতটি অত্যন্ত নির্ম্মল, উজ্জ্বল। আকাশ মেঘখণ্ডহীন, বাতাস ধূলিবিমুক্ত হইয়া অত্যন্ত শী— এবং স্বচ্ছ এবং দূরের বনরেখা একান্ত হাতের কাছে মনে হইতেছে নাই— [illegible] প্রকৃতি যেন শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ একখানি চিত্র—শ্বেত [illegible]রের শীতলতায়, উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ।

স্বে বাতাস বেশ শীতল কিন্তু ঘরে থাকিতে মন চাহে না। বিনয় অনেক্ষণই বই লইয়া বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে এক সময় পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ম্লান ঝাউ-বীথিকার অতিউচ্চ শাখা, চাপা আর্ত্তনাদ, আকাশের প্রান্ত হইতে সুদূর দৈববাণীর মত শ্রুত হইতেছিল। পথে ধূলি নাই—পথের পাশের গোটা দুই কাঞ্চন গাছ ইতিমধ্যেই আগাগোড়া ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; শাদা, গোলাপী, রক্তাভ ফুলগুলি এক ঝাঁক ছোট পাখীর মত ঈষৎ বাতাসে কাঁপিতেছিল।

বিনয় আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গোটা কয়েক ভূপতিত কাঞ্চন কুড়াইয়া লইল—কিন্তু একটু নাড়া

খাইতেই শিথিল বৃন্ত হইতে পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে ঝরিয়া গেল। তখন গাছ হইতে ফুল পাড়িতে সুরু করিল, একটি, দুটি অনেকগুলি। কাঞ্চনের স্বচ্ছ, লঘু, সূক্ষ্ম শিরাটানা পাপড়ি গুলিতে তখনো শিশিরের শীতলতা ছিল, আঙুলের ডগাগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল, ফুল যখন অনেকগুলি হইয়া একটা ভারে পরিণত হইল, তখন সেই পুঞ্জীকৃত স্তূপ লইয়া কি করিবে সে ভাবিয়া পাইল না।

পৃথিবীতে অনেক বস্তু আছে কিন্তু তাহার অধিকাংশই আমাদের অগোচরে থাকিয়া যায়। ঘটনাক্রমে যে সামান্য-কয়টি আমাদের চৈতন্যের স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়ে—তাহাই বস্তুত পক্ষে আমাদের নিকটে সত্য। সৌভাগ্যক্রমে সেই বস্তুর মধ্য হইতে যে কয়টি আমাদের প্রেমের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, আমাদের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে স্থান পায় তাহাই বাস্তবিক ভাবে আমাদের জীবন-গঠনের উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য ধূলিজাল হইতে বৃহত্তম নক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত মানুষের এই প্রেমের সংস্পর্শে আসিবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। আর্য্যভট্ট একদিন সৌর-জগতের সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবকে নিকটতর করিয়া দিয়াছিলেন। বিনয় আজ একমুঠি কাঞ্চনফুল কঙ্কণের হাতে দিবার ছলে এই উভয় জগৎকে খানিকটা ঘনিষ্ঠতর করিয়া দিল। ভালবাসিয়া যাহা আমরা দিই সেইটুকুই কেবল আমরা যথার্থ ভাবে পাই।

কঙ্কণের কথা মনে পড়িতেই তাহার সব সমস্যার যেন সমাধান হইয়া গেল। এতক্ষণ এই অতি সহজ কথাটা কেন মনে পড়ে নাই—ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইল।

বিনয় তৎক্ষণাৎ ঘাটে আসিয়া ডিঙি খুলিয়া দিল। স্রোতের মৃদু টানে নৌকা আপনিই ভাসিয়া চলিল। ডিঙির মুখে শান্ত জল

তবুতত্ত্ব করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। মাঝখানে একটা চরের মুখে অনেকগুলি মাছ-ধরা জেলেডিঙি বাঁধা, উনুনে পাক্ চড়িয়াছে, খাদ্যের সুগন্ধ ও ধোঁয়া উঠিতেছিল। একস্থানে এক ঝাঁক চড়ুই উড়িতে উড়িতে হঠাৎ সাঁ করিয়া জলের সঙ্গে প্রায় বুক ঘষিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহাদের পাখার বাতাসে জলে কাঁপন উঠিতেছিল। বিনয়ের ডিঙি চরে আসিয়া লাগিল। দ্রুত লাফাইয়া পড়িয়া সে কঙ্কণদের পাড়ায় যাত্রা করিল। এতক্ষণ তাহার মনে যে নিশ্চিন্ত আনন্দ ছিল, অভীষ্ট বস্তুর কাছে আসিয়া তাহা কেন যেন নষ্ট হইয়া গেল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাইতে লাগিল—দুই পায়ের মধ্যে শির্ শির্ করিতে লাগিল। এ কেমন! বালুর জমি ছাড়াইয়া, তরমুজের ক্ষেত পার হইয়া, মটরের ক্ষেতের আল বাহিয়া, সেই জামগাছটার ছায়ার তল দিয়া,, সরু আলের দুইপাশের কঞ্চির বেড়ার আক্রমণ হইতে সাবধান হইয়া কঙ্কণদের বাড়ীর পিছনে আসিয়া পৌছিল। থমকিয়া দাড়াইল, দেখিল উঠানে ডাকমুন্সী নাই—মনটা কেমন যেন খুসী হইয়া উঠিল। খাদ্য-গ্রহণের পূর্ব্বে যেমন তাহার ঘ্রাণ-গ্রহণ—এ তেমনি। আগামী সুখটাকে মনে মনে কল্পনা করিয়া লাভের পূর্ব্বেই ফাওটুকু অনুভব করিতে লাগিল। এক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল উঠানে কেহ নাই, বারান্দাও শূন্য। নিশ্চয়ই সে পাক-ঘরে—একেবারে পা টিপিয়া গিয়া চোখ চাপিয়া ধরিবে। উঠানে উপস্থিত হইয়া বিনয় দেখিতে পাইল—গোহালের পাশে সরু পথ দিয়া কঙ্কণ মাঠের দিকে চলিয়াছে। তাহার আগে কে একজন অপরিচিত যুবা। বিনয়ের বুকের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠিল। ডাকিতে পারিল না—ইচ্ছাও ছিল না। একাকী কোথায় চলিয়াছে! একাকী হইলে বিনয়ের

হয়তো আশঙ্কা হইত—কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া—বুকের ভিতরকার সেই ব্যথাটা তীক্ষ্ণ শূলের মত ক্রমে কণ্ঠের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—গলা শুকাইয়া আসিল।

পলমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে ফিরিল। তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধবলী নৈমিত্তিক তৃণগুচ্ছ-প্রত্যাশায় গ্রীবাটি অগ্রসর করিয়া দিল। কিছু না পাইয়া জিহ্বা দ্বারা একবার তাহার হাতটা লেহন করিতে চেষ্টা করিল। বিনয় ফিরিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল, কঙ্কণ রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইল—কিন্তু কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া আরো দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। বিনয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। এতক্ষণ ফুলগুলার কথা তাহার মনেই ছিল না, হঠাৎ সেগুলা নজরে পড়িয়া সমস্ত ক্রোধ উহাদের উপরে পড়িল। দুই হাতে সেগুলা দলিত করিয়া, ছিন্ন করিয়া, নিষ্পেষিত করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে যে নির্ব্বোধের মত পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিজের উপরে বিরক্ত হইয়া দ্রুত হাঁটিতে লাগিল।

হায়, কোথায় গেল প্রভাতের সেই উজ্জ্বল মধুর সুর, চিত্তের সেই নির্ম্মল জ্যোতি—সমস্ত পৃথিবীটা শ্মশানের ভস্মে ধূসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিনয় প্রতিজ্ঞা করিল—আর কখনো এখানে আসিবে না—স্থির করিল—সে নির্ব্বোধ, মূর্খ। কঙ্কণের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ! কয়দিনের পরিচয়!

৭

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আকাশ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইহা তো সূর্য্যোদয়ের রঙ নয়। মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ এবং জনতার চীৎকার······আগুন! আগুন! বিনয় ছুটিয়া বাহির হইল। সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেলে রাত্রে দিক ঠিক করা যায় না—বিনয় প্রথমটা দিক্‌নির্ণয় করিতে পারিল না—কিন্তু অধিকক্ষণ না যাইতেই বুঝিতে পারিল—আগুন চর-চিলমারীতে।

কর্ত্তব্য যেন নির্দ্ধারিত হইয়াই ছিল—তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বিনয় ডিঙিতে উঠিয়া বসিল—পরিপুষ্ট বাহুর তাড়নে ডিঙি উড়িয়া চলিল।

আজ দিন পনেরো সে যে কঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া চরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে—এমন কি আর কখনো কঙ্কণের কথা মনেও ভাবিবে না ঠিক করিয়াছিল—সে কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা আজ একবার মনেও পড়িল না। হায়রে মানুষের মন!

বিনয়ের ডিঙির আশপাশ দিয়া আরো অনেক নৌকা আগুন নিভাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছিল। রাজসাহী সহর হইতে বহু লোক, বিশেষত কলেজের ছাত্রদের অনেকেই ইহার পূর্ব্বে চরে পৌঁছিয়াছিল—তখনো অনেকে যাইতেছিল—নৌকা পাইবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহারা অনেকে সাঁতরাইয়া পার হইতেছিল।

লোকের পরোপকারের এত আগ্রহ কেন যেন বিনয়ের ভাল

লাগিল না—কেমন যেন একটু ঈর্ষ্যার ভাবের উদয় হইল। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখী হইলেও তাহাতে একটু আনন্দের ভাগ মিশান থাকে। তাহার দুঃখে আর কেহ সাহায্য না করিলেই যেন স্বস্তি। দুঃখের টানে অবিমিশ্র ভাবে সে নিজের হইয়া উঠে—ভালবাসার নিকষিত স্বর্ণে এইটুকু স্বার্থপরতার খাদ চিরদিন থাকিয়া যায়।

বিনয়ের ডিঙি নদীর মাঝখানে আসিতে সে দেখিতে পাইল—ক্ষুব্ধ নদী-স্রোত অগ্নির স্বর্ণাভ পীত বর্ণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অগ্নিকুণ্ডের প্রচণ্ড আলোকে সেখানটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—গাছপালা ঘর বাড়ী সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—কিন্তু কিছু দূরের অন্ধকার চতুর্গুণ বাঁড়িয়া গিয়াছে। বিনয়ের চিন্তা ছিল—পাছে আগুন কঙ্কণদের বাড়ীতে লাগে।

নৌকা চরে লাগিতেই বিনয় লাফাইয়া ডাঙায় পড়িয়া ছুটিতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিল—আগুন কঙ্কণদের বাড়ীতে নয়—পাশে মুসলমান পাড়ায়—তবে বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছে এই যা রক্ষা।

মুসলমানপাড়ায় ঘর চালে চালে সংলগ্ন, রৌদ্রে খড় শুকাইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক চালে আগুন ধরিলে পাড়ার কোনো বাড়ী বাঁচিবার আশা থাকে না। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ খানা ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, এক একবার আগুন কমিয়া আসে, আবার একটা দমকা বাতাস আসে, পাশের চাল ধরিয়া উঠে, আগুন বাড়িয়া যায়, বাঁশ ফাটিতে থাকে, কান্না ও কোলাহলে সকল শব্দ ছাপাইয়া যায়।

ঘরের কিছু কিছু জিনিষপত্র বাহির হইয়াছে, একখানা চৌকি,

কিছু কাঁথা কম্বল, দু'একটা, জালা, কয়েকটা ধামা কাঠা—এইতো সম্বল! বাসনপত্র এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক গৃহস্বামী বৃদ্ধ তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে গফুর, গফুর করিয়া ডাকিয়া পাগল। সকলেই তখন গফুর, গফুর রব করিতে লাগিল—কিন্তু গফুরের কোনো সন্ধান মিলিল না। হঠাৎ কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে এই যে গফুর। দেখা গেল গফুর ঘুমের ঝোঁকে বাহির হইয়া আসিয়া যেখানে পড়িয়াছিল—সেইখানেই পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘটনা-স্থানে যে পরিমাণ লোক জমিয়াছিল, তাহার সিকি হইলেই কাজ উদ্ধার হইত। ইহাতে কাজ নষ্ট হইতেছিল—সকলেই হুকুম করে, পরামর্শ দেয় এবং তাহার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা একেবারে প্রমাণ-প্রয়োগে উল্লেখ করিয়া বর্ণনা করে, যাহাতে অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ থাকে না। মেয়েদের মধ্যে যে পরিমাণ অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল, তাহা উত্তমরূপে সিঞ্চিত হইলে একটা লঙ্কাকাণ্ড নিভিয়া যাইবার কথা।

বিনয় কঙ্কণদের বাড়ী হইয়া আসিয়াছে—সেখানে তাহাকে দেখিতে পায় নাই—এখানে সে তাহাকেই খুঁজিতেছিল। এমন সময়ে দেখিতে পাইল—ডাকমুন্সী অদূরে দাঁড়াইয়া কাহাকে কি বলিতেছে, শুনিতে না পাইলেও তাহার হাতে চিঠির তাড়া মুখের নিতান্ত সুচতুর প্রসন্ন ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল—অপরিচিত ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে এই বিপদের মধ্যেও অপূর্ব্ব কৌশলে এই অতি প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রগুলি সে বাঁচা সক্ষম হইয়াছে। নিশ্চয় ইহাই। তাহার প্রসন্ন ব্যগ্র মুখের প্রত্যে রেখা এই কথাই প্রচার করিতেছিল। নিতান্ত অবজ্ঞার স অগ্নিকাণ্ডটা দেখিতেছিল—যেন কিছুই হয় নাই—যেন ছেলেদের

কতকগুলি খেলাঘর পুড়িয়া যাইতেছে—যেন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক দলিলগুলি বাঁচাইতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার এত আত্মপ্রসাদ।

বিনয় কঙ্কণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রায় যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল অদূরে একটি অর্দ্ধঝলসিত নিম গাছের তলায় একদল মেয়ে—দল হইতে একটু দূরে কঙ্কণ—প্রচণ্ড অগ্নির আলোকে তাহার মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রোম-সম্রাট নীরো কবি ছিল সন্দেহ নাই। অমরাবতীলাঞ্ছন বিশাল রোম নগরের বিরাট হুতাশনের স্বর্ণপটে কে সেই সৌভাগ্য-বতী যাহার মূর্ত্তি এক রাত্রির জন্য দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল! আবার আর একদিন বিপুল ট্রয় নগর একটি অখণ্ড শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কাহার অমর মুখচ্ছবি ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল! স্বর্ণলঙ্কার বিপুল স্বর্ণরাশিও যথেষ্ট হয় নাই—অমূল্য ইন্ধনে আপনার সমস্ত খাদ ভস্মীভূত করিয়া—অক্ষয় স্বর্ণপটে সীতার করুণ মুখচ্ছবি সে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে।

কঙ্কণ একাকী দাঁড়াইয়া। অদূরে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের বিরাম নাই। সেই বিপুল সুবর্ণের পটে কঙ্কণের ভীত কাতর [illegible]চ্ছবি কোন অমর শিল্পীর একমাত্র চিত্র-সম্পদের মত ফুটিয়া [illegible]ইয়াছে। গায়ে পীতাভ একখানি শাড়ি, আঁচলটা স্কন্ধ বাহিয়া ব[illegible]র উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ডান হাতের দুটি আঙুল চিবুকে [illegible]। স্রস্ত কেশপাশ কোনো রকমে একটা পাক দিয়া জড়াইয়া [illegible]য়াছে, এক গোছা বাম স্কন্ধের উপরে স্খলিত, মৃদু বাতাসে [illegible]চারিটি চুল উড়িতেছে—অগ্নির তীব্র আলোকে তাহাও চোখে [illegible]ড়ে। চোখে অর্দ্ধ ঘুমের ঘোর, ভয়ে, বিস্ময়ে, করুণায় একান্ত অসহায়। বিনয় একদৃষ্টে এই অপূর্ব্ব ছবি দেখিতে লাগিল।

ক্রমে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে শব্দ, স্পর্শ, দৃশ্য লুপ্ত হইয়া আসিল, আর সে জনতার আর্ত্ত কোলাহল নাই, নিশীথের অন্ধকার নাই—কেবল একখানি প্রদীপ্ত অত্যুজ্জ্বল কনকচ্ছদে একখানি অমূল্য মুখচ্ছবি। জগতে কেবল সেই একটি মাত্র দৃশ্য এবং জগতে কেবল সেই একটি মাত্র দর্শক—এমন মুহূর্ত্ত জীবনে কয়টি আসে!

৮

ক্রমে আগুন যতই নিভিয়া আসিতে লাগিল—চারিদিক ততই পূর্ব্বতন গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এতগুলি পরিবারের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, প্রচণ্ড আলোকে এতক্ষণ তাহা বোঝা যাইতেছিল না, এইবার অন্ধকার হইতে না হইতে সর্ব্বনাশ এবং ক্ষতি দ্বিগুণ হইয়া মনের উপর চাপিয়া বসিতে থাকিল। পাড়া-প্রতিবেশীরা যে যাহার বাড়ী ফিরিতেছিল—বিনয়ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু আসিয়া সে পিছনে পিঠের উপরে একটি কোমল স্পর্শ পাইয়া ফিরিয়া দেখে কঙ্কণ।

এতক্ষণে প্রথম তাহার সেই কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা পড়িল—কিন্তু আর তাহার ফিরিবার শক্তি ছিল না, বোধ ইচ্ছাও ছিল না।

কঙ্কণ প্রথমে কথা বলিল—আগুন নিভতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ!

—ভাগ্যিস আগুন লেগেছিল তাই দেখা পেলাম—নইলে বোধ হয় আর আসতেন না!

—না।

(বিনয়ের উত্তরগুলি একশাব্দিক—মনে মনে সে প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়া উভয় দিক রক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ততম উত্তর প্রয়োগ করিতেছিল।)

—পড়াশুনা কেমন হচ্ছে!

—মন্দ না—এক রকম।

—পরীক্ষা কবে?

—বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি।

(প্রতিজ্ঞা যতই টলিতেছিল উত্তর ততই দীর্ঘ হইতে সুরু করিল।)

—সেদিন যে হঠাৎ ফিরে গেলেন!

বিনয় নিরুত্তর!

—আপনি যা ভেবেছিলেন—তা জানি; কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও তো করতে পারতেন।

বিনয় নীরব।

—আপনিসুদ্ধ যখন আমাকে এই রকম অবিশ্বাস করেন, তখন ব বস্থায় আমাদের দেখ্‌লে অন্যে কি মনে করত! চলুন আমাকে পৌছে দিন।

বিনয়ের মনে আনন্দের সুর বাজিতে লাগিল; কেবলি ধ্বনিত হইতে লাগিল 'আপনিসুদ্ধ' 'আপনিসুদ্ধ!' তাহা হইলে বিনয়ের একটু বিশেষ অধিকার আছে—সে অন্যের দলে নয়।

অপরিচিত পথের বন্ধুরতায় বিনয় দু'চারবার হুঁচোট খাইতেই—

কঙ্কণ বলিল—অজানা পথে পড়বেন, তার চেয়ে আমার হাত ধরুন —এই বলিয়া বিনয়ের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিল। বিনয়ের বুকের রক্তে তোলপাড় আরম্ভ হইল। অন্ধকার রাত্রে অনাত্মীয় যুবতী রমণীর স্পর্শ বিনয়ের স্নায়ুমণ্ডলীতে মদের মত কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

বন্ধুর পথটুকু পার হইয়া আসিয়া বিনয় বেশ একটু আবেগ ও আগ্রহের সহিত তাহার কোমল মুঠাটি চাপিয়া ধরিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অনুভব করিল, কঙ্কণের হাতটি কেমন যেন আড়ষ্টভাব ধারণ করিয়াছে। সেইটুকু অনুভব করিতেই বিনয়ের উৎসাহ ও কথাবার্ত্তার স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া আসিল, বিনয় হাতের মুঠি শিথিল করিয়া কোনোক্রমে ধরিয়া রাখিল মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহার মুঠি শিথিল হইতেই স্পষ্ট অনুভব করিল কঙ্কণের মুঠি নিবিড়তর, অধিকতর কোমল হইয়াছে, তাহার সেই কপোতের ন্যায় মৃদু ও উত্তপ্ত ক্ষুদ্র হাতখানি কুণ্ঠিত একটি মূর্ত্তিমান্ চুম্বনের মত তাহার আঙুল কয়টির ডগার ভিতর দিয়া রক্তের মধ্যে সহস্র ধারায় যুগপৎ মদ ও মধু, শিশির ও বৃষ্টি, অমৃত ও গরল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহারা এ কোন্ পথে চলিয়াছে, বাড়ী তো এত দূরে নয়! অন্ধকারে ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হইয়া তাহারা চলিল. অব... অদূরে পদ্মার স্রোতের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। একটু ... উভয়ে আসিয়া পদ্মার ধারে দাঁড়াইল।

উভয়েই ক্লান্ত হইয়াছিল—বিনয় বসিয়া পড়িল।

—বাঃ বস্‌লেন যে!

—চল্‌তে পারছি না।

—আমি বুঝি চল্‌তে পারছি!

—চলতে কে বল্‌ছে, বসো না!

—না না, ছিঃ, তা কি হয়?

কিন্তু দেখা গেল মৌখিক গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পরমুহূর্ত্তেই বসিয়া পড়িল।

তখন গভীর রাত্রি, নির্জ্জন প্রান্তর, লুপ্ত দিক্‌মণ্ডল, আর পৃথিবীর সমস্ত সজীবতার প্রতিনিধির মত অদৃশ্য পদ্মার একটানা কলধ্বনি। এমন সময়ে ভাষা ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না, উভয়ে পাশাপাশি নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে বাতাসে কঙ্কণের আঁচল উড়িয়া বিনয়ের চোখে, মুখে, বুকে স্পর্শ করিতে লাগিল। মাঝে, মাঝে সেই অর্দ্ধস্খলসিত নিমশাখার কচি গন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বিনয় পাশে হাতখানা রাখিতে গিয়া দেখে কঙ্কণের হাতের উপর তাহার হাত পড়িল, কঙ্কণ হাত টানিয়া লইল না, বিনয় হাতখানি ধরিল, মুঠা করিয়া বন্ধ করিল, বুকের কাছে লইল এবং তাহার পরিপুষ্ট বাহুদ্বয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারা সবলে সেই কোমল মুঠিখানি নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। অন্ধকারে কঙ্কণের মুখ দেখা গেলে দেখা যাইত—খানি লাল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তাহা ব্যথায় নহে ইহা নিশ্চিত।

অন্ধকার রাত্রি ও নির্জ্জন স্থান বড়ই বিশ্বাসঘাতক; সত্য-মিথ্যার ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া কত কি কাণ্ড করিয়া বসে! বিনয় তাহাদেরই প্ররোচনায় হঠাৎ কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেছিল, ভালো করিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল, কঙ্কণ তাহার হাত ছাড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যে রওনা হইয়াছে। সমস্ত মোহ কাটিয়া গিয়া বিনয় স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। কি করিতে গিয়া সে কি

করিয়া ফেলিল ! সঙ্কোচ ভাঙিবার পূর্ব্বেই কাজটা বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গিয়াছে কিন্তু রাত্রি যে অন্ধকার এবং স্থান যে নির্জ্জন !

কিন্তু বিনয়, তার এই অসন্তোষ, সঙ্কোচেও হইতে পারে, অভিমানেও হইতে পারে। তোমার কাছে একটি চুম্বন সে অনেক আগেই আশা করিতে পারে—কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন লগ্ন অতিক্রম করিয়া আসিল—তখন অভিমান কি মোটেই সম্ভব নয় !

বিনয় এত ভাবিতেছিল না—সে ভাবিতেছিল কঙ্কণ তাহার এই অভদ্রতায় রাগ করিয়াছে। হয় তো তাহার মনের ভাব ঠিক ইহার বিপরীত। পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝা দূর হইলে জগতের বারো আনা দুঃখ অশান্তি কাটিয়া যায়।

কঙ্কণ কিছু দূরে আসিয়া বুঝিতে পারিল এ কী সে করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তখন আর ফিরিবার সময় নাই। নিরুপায় হইয়া সে অগ্রসর হইতেই লাগিল—যতই অগ্রসর হইতে থাকিল ততই ফিরিবার উপায় সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকিল—ক্রমে বিনয় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সে তো বিনয়ের উপর রাগ করে নাই, চুম্বনটা প্রত্যাশাও করিত, বরঞ্চ এতদিন কেন সে চুমা খায় নাই, সেই জন্যই মনে মনে তাহার উপর অভিমান করিয়াছে। যখন সেই চিরবাঞ্ছিত ধন আসিল, তখনই তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিল মনের ইচ্ছার যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। আসল কথা, বহু যুগ মন ও শরীর একত্র বাস করিয়াও উভয়ে উভয়কে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। উভয়ের ভাষা ভিন্ন, আকারে ইঙ্গিতে কাজ চালাইতে হয়, এক আধটা ভুল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল করিতে এক মুহূর্ত্তই যথেষ্ট—সংশোধন হয় তো সারাজীবনেও আর হয় না !

—চঞ্চল একটা চুম্বন, নলের রাজহংসের মত তাহার কাছে আসিয়া রহিয়া গেল—তাহারই অনাস্বাদিত মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত শরীর মন দ্বিগুণ রাঙিয়া উঠিল। অনাস্বাদিত সেই মাধুর্য্যে তাহার মন অহরহ অনুতপ্ত হইতে লাগিল এবং যে ঐশ্বর্য্য তাহারি নির্বুদ্ধিতায় ভ্রষ্ট হইল মনে মনে শত ভাবে লক্ষ ভাবে তাহারই সৃষ্টি করিয়া নানা ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, আশায় আভাসে ইন্ধন জোগাইয়া সদ্য-জ্বালিত বাসনার হুতাশন-শিখাকে সে অন্তরের মধ্যে দীপ্যমান করিয়া রাখিল।

৯

সেবার চৈত্র মাসের প্রথমে দোল। সারাদিন মহীন্দ্র ও দীনেশের সহিত মাতামাতি করিয়া বিনয় যখন বাড়ীতে ফিরিল তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। স্নানাহার শেষ করিয়া পিসি-মাতার কঠিন তত্ত্বাবধানে আসন্ন পরীক্ষার পড়ায় সে মন দিল। কিন্তু রঙের ছাপ কাপড়-জামা হইতে ধুইয়া ফেলিলেও মনটা তখনো রঙীন ছিল—তাই জানালার গরাদ গলিয়া রৌদ্রদীপ্ত পদ্মার শূন্য বালুচরে ঘোড়দৌড় করিয়া ফিরিতে লাগিল। এক একটা দমকা বাতাস দেয়, বালু উড়িয়া উড়িয়া উঠে; আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। পদ্মা তাহার স্বর্ণাভ বালুকারাশি প্রকাণ্ড মুষ্টি ভরিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে বালু উড়িয়া আকাশ তাম্রাভ হইল, বাতাস ধূসর হইল, পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, আকাশ বাতাস

পৃথিবী কিছুই দেখা গেল না—কেবল একটা অদৃশ্য শিরীষ ফুলের শাখা হইতে মৃদু গন্ধ অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বিনয়ের জানালা দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনয় জানালা বন্ধ করিল, ক্রমে বই বন্ধ করিল, পড়িবার ইচ্ছা অনেক পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। তখন সে একাকী নির্জ্জন সেই পাঠগৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়িল কি যেন একটা কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। কান পাতিয়া শুনিল পাশের ঘরে পিসিমাতার রামায়ণ পাঠ বন্ধ। সে এক মুঠি আবির লইয়া পদ্মার চর ভাঙিয়া যাত্রা করিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, চরের ধূলি-তাণ্ডব থামিয়া গিয়াছে। চরের খানিকটা জায়গা চাষ করিয়া ধান বোনা হইয়াছিল, সেই কচি ধানের ক্ষেত হইতে একটি মৃদু আতপ্ত সুগন্ধি শ্বাস উঠিতে লাগিল এবং অন্যমনস্ক বিনয়ের পায়ের শব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুয়ের মত এক রকম পাখী ক্ষেতের আশ্রয় ছাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল।

বিনয়ের ভয় ছিল—আজকার দিনটা ডাকমুন্সীর সম্মুখে পড়িয়া পাছে নষ্ট হয়। কিন্তু ব্যাঘ্রের ভীতি যে স্থানে, সন্ধ্যা সেই স্থানেই আসন্ন হইয়া থাকে। বাড়ীর পিছন দিক দিয়া ঢুকিতে যাইতেই ডাকমুন্সীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। ডাক মুন্সী মহাখুসী—অমনি সুরু হইল—পাবনা জেলায় গোবিন্দপুর প্রকাণ্ড গ্রাম—সুবৃহৎ টিনের আটচালায় সাব পোষ্টাফিস—পাকা মেঝে—চারজন ডাক পিওন। (ডাকমুন্সীর পূর্ব্বের বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান বর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখিলে ইতিহাস কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে—

তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।) বিনয় অত্যন্ত কাতর ভাবে সেই শত-বারশ্রুত ক্রমোন্নতিশীল কাহিনী শুনিতে লাগিল, ঘামে তাহার হাতের আবির ভিজিয়া উঠিল।

এমন সময় বিনয়ের মুক্তি কঙ্কণের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কঙ্কণ বিনয়ের দুরবস্থা বুঝিয়া ডাকমুন্সীকে করিমদের পাড়ায় চিঠিবিলি করিতে পাঠাইয়া দিল। ডাকমুন্সী চলিয়া গেলে কঙ্কণ হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছিলেন—না? বিনয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—

—আজ দোল জান না বুঝি!

—জানি বই কি! আঃ করেন কি, করেন কি!

বিনয় তাহার মুখে রঙ মাখাইতে আসিল, কঙ্কণ ঘোর আপত্তি করিল কিন্তু সরিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না! বিনয় তাহার দুই গালে আবির মাখাইয়া দিল—এই সামান্য কাজে সময় যতটা লাগা উচিত, তাহার চেয়ে অনেক বেশিই লাগিল। কিন্তু গালে আর রঙের প্রয়োজন ছিল না, বিনয়ের স্পর্শে তাহার শিরায় উপশিরায় রক্তের যে হোলি চলিতেছিল, দুই কপোলে তাহাই ফাটিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

—ইস, কি বিরক্তটাই করলেন! আমিও আপনাকে বিরক্ত না ক'রে ছাড়ছি নে। চলুন পলাশ ফুল পেড়ে দিতে হবে।

কঙ্কণ একখানা গোলাপী রঙের শাড়ী পড়িয়াছিল, বাহুতে ও মণিবন্ধে রক্তকরবীর কঙ্কণ, গলায় অশোক ফুলের হার, কটিতে কন্দে ফুলের মেখলা, খোঁপায় কেবল কিছু দেওয়া হয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল, খোঁপায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া নেয়। বাড়ীর কাছেই একটা পলাশ গাছ আছে, ফুলও তাহাতে অনেক, কিন্তু ডালটা

একটু উঁচু, নত করিয়া না ধরিলে হাতে পাওয়া অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার লোক উপস্থিত, এই আশাই সে এতক্ষণ করিতেছিল।

বিনয় মাটিতে দাঁড়াইয়া ডালটা নীচু করিয়া ধরিল, কঙ্কণ গাছের গুঁড়ির এক হাত উপরে একটা শুষ্ক ডাল লাগিয়াছিল, তাহার উপরে উঠিয়া ফুল তুলিতে লাগিল। হাতের কাছের ফুলগুলি শেষ করিয়া যখন সে ডালের আগার দিকে হাত বাড়াইল, তাহার মুখ বিনয়ের মুখের এত কাছে আসিয়া পড়িল যে তাহার নিঃশ্বাস বিনয়ের মুখে চোখে লাগিতে লাগিল। তাহার স্রস্ত অলক বিনয়ের চোখে উড়িয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সরাইবার উপায় নাই, হাত বন্ধ। হঠাৎ এমন সময়ে কঙ্কণের পায়ের তলাকার শুষ্ক ডালটি মচ্ করিয়া ভাঙিয়া গেল উভয়ে সাবধান হইবার পূর্ব্বেই কঙ্কণ আসিয়া বিনয়ের দেহের উপরে পড়িল, তাহার বুক বিনয়ের বুকে এবং তাহার ওষ্ঠ বিনয়ের মুখে গিয়া লাগিল। কোথা হইতে কি ভাবে কি ঘটিল কেহই বুঝিতে পারিল না, কেবল দুই জনেই অভিভূতের ন্যায় একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় প্রথম চেতনা পাইল, কিন্তু সে এক পা-ও নড়িল না, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কণের কম্পমান দেহ-যষ্টির তপ্ত, কোমল, কম্পনশীল, স্পন্দমান, বাসনাময়, সেই বসন্ত-পুষ্পমঞ্জুরীসদৃশ ভার বহন করিয়া, সমগ্র দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কঙ্কণ সত্যই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, সে আপনার অবসন্ন দেহভার বিনয়ের বুকে রাখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য অচেতন অবস্থায় ছিল। পরমুহূর্ত্তে নিজের হৃৎপিণ্ডের উপরেই বিনয়ের হৃৎপিণ্ডের আছড়ানি অনুভব করিল। তৃতীয় মুহূর্ত্তে, বিনয়ের ওষ্ঠ হইতে একটা অতি তীব্র, অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত মদির স্পর্শ তাহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে

গিয়া পৌঁছিল। চতুর্থ মুহূর্ত্তে সে বেশবাস সম্বৃত করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বিনয় কিছুক্ষণ মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কঙ্কণকে দু'একবার নাম ধরিয়া ডাকিল। কিন্তু কোনো সাড়া না পাইয়া এই নূতন লব্ধ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে মনে মনে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিতে করিতে রওনা হইল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না।

ভূমিকম্পে নাড়া খাইয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ধন-রত্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তেমনি এই কিছুক্ষণ আগেকার আকস্মিক ঘটনায় এক নিমিষে কঙ্কণের গুপ্ত নারীত্ব নিজের কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল—সুগভীর সুখ ও তীব্র বেদনা। এই মাত্র যাহা গভীর আনন্দ—তাহাকে ভালো করিয়া অনুভব করিতে গিয়া দেখা গেল তাহা পরম বেদনা। তীব্র ব্যাথাকে অনুসরণ করিতে করিতে—একি অলৌকিক আনন্দ! এতদিন পর্য্যন্ত কঙ্কণের কাছে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা দুই বিভিন্ন কোঠায় বিভক্ত ছিল, আজ প্রথম সে বুঝিতে পারিল, জীবনের এই মহামূল্য উত্তরীয়খানির এক পিঠে সুখ, এক পিঠে দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ তাহার দুই পিঠ। যেমন করিয়াই এই উত্তরীয়খানি গায়ে দাও না কেন—কোনো না কোনো ভাঁজে তাহার অপর পিঠ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

কঙ্কণের কপালের পাশের শিরা দুইটি উন্মত্তের মত দপ্ দপ্ করিতেছিল, গাল দুইটি লাল হইয়া উঠিয়া কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়াছিল। সমস্ত শরীর দিয়া আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সেই ওষ্ঠের স্পর্শখানি, তাহাকে নামাইয়া দিবার সময় বিনয় যে পরিপুষ্ট বাহু দ্বারা একবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই আবেষ্টনখানি,

মনে মনে বহুবার করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না—একটু মনে আসিতেই কেমন সব ঘোলাইয়া যায় কেবল একটা অস্পষ্ট তীব্র নিবিড়তা শরৎ কালের সন্ধ্যায় বর্ণোজ্জ্বল আতপ্ত কুয়াশার মত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া জমিয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি আশ্চর্য্য হইল হঠাৎ যখন তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! একি—এ অশ্রু কেন! আজ তো তাহার আনন্দের অবধি নাই। তবে কি সে উন্মত্ত হইল?

এই রকমই হয়। আজ সে অভীষ্ট লাভ করিয়াছে, কিন্তু নিতান্ত স্বেচ্ছাতেও কৌমার্য্য বিসর্জ্জন দিতে প্রত্যেক রমণীরই অহঙ্কারে আঘাত লাগে। যেন তাহার একটা পরাজয় ঘটিল। যে কৌমার্য্য তাহার কোমল হৃদয়কে এতদিন ধরিয়া শক্তির মত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আশৈশবের সেই পরম সুহৃদকে বিদায় দিতে আজ তাহার এই ক্রন্দন। কেমন অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল—এতদিনকার তটভূমি হইতে আজ তাহার বিদায়—যদিও সম্মুখে অভীষ্ট, ঈপ্সিত, পরম আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়—তবু যেন তাহাতে কেমন অনিশ্চয়ের ভাব। অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই সুখ চিরদিন আনন্দ দেয়।

চরের সেই জলাশয়টাতে বিনয় মাছ ধরিতেছিল—অর্থাৎ জলে ছিপ ফেলিয়া সেদিনকার কাণ্ডটার বিষয় ভাবিতেছিল। এতদিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে বাঁধটা ধীরে ধীরে ক্ষইয়া আসিতেছিল হঠাৎ কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল, লজ্জা সরম, সীমা, শালীনতা, সংযম, সংশয়ের অবকাশ পর্য্যন্ত রহিল না। একদিকে যখন তাহারা চিন্তা করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া একভাবে চলিতেছিল তখন কোথা হইতে আসিল সর্ব্বনাশী এই আকস্মিকতার দমকা হাওয়া, উভয়ের মধ্যকার ক্রমসূক্ষ্মায়মান পর্দ্দাখানা একটানে সরাইয়া দিল। ইহার মধ্যে কোনটা বিশ্বের বিধান, মানুষের সুচিন্তিত নির্দ্দিষ্ট পথ, কোনটা বিধিবিধানরহিত খামখেয়াল? কোনটা সত্য! যোগশৃঙ্খলিত সংযত মহেশ্বর, না, নিয়ম-পাশ মুক্ত তাঁহার ভূতপ্রেতের দল!

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যায়; মানুষ সেই ঘটনা-শ্রেণীকে পরম্পরায় শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, বিধি-বিধান রচনা করিয়া প্রায় যখন আদর্শের এক বিশ্ব গড়িয়া তোলে, অমনি কোথা হইতে আসে এক প্রচণ্ড, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আঘাত, সব ভাঙিয়া চূরিয়া পড়ে। অমনি সেই আদর্শবাদীর দল হয় অবিশ্বাসী, নাস্তিক, বিদ্রোহী! কিন্তু কেন? যাহাতে কোনো পারম্পর্য্য, ঔচিত্য, শৃঙ্খলা মূলেই নাই তাহাকে কেন তোমার মন গড়া শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার হাস্যকর এই প্রচেষ্টা!

এই আকস্মিকতাই বিধান। জীবনের কোন্ এক পরম মুহূর্ত্তে

হাতের রুমাল খসিয়া পড়ে। মৃত্যুর পরপার হইতে প্রেতাত্মার আহ্বান আসে। কখন প্রণয়ী অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদের বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল, বৈশাখের দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—তবে সূর্য্য এখনো অস্ত যায় নাই—ধূলিআচ্ছন্ন দিক-মণ্ডলের ঠিক কোন স্থানটায় যে সূর্য্য তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। বাম পাশের ছোট নদীতে একখানা পালের নৌকা অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে। ডান দিকের বড় পদ্মায় লালগোলা-গামী জাহাজখানার ধূম-রেখা নিষ্কম্প আকাশে সুবৃহৎ একটা রোমশ বিহঙ্গের মত নিশ্চল হইয়া আছে। পূর্ব্বতম দিগন্তের ধূসর বনরেখার শিরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবার ক্ষীণ একটা আভাস।

হঠাৎ ছিপে টান পড়িল—বিনয় চাহিয়া দেখিল 'চার' খাইয়া একটি মৎস্যশাবক তর্ তর্ করিয়া জল কাটিয়া পলায়ন করিতেছে। আবার 'চার' দিয়া ছিপ ফেলিল। সেই নীলাভ জলাশয়ের ছোট ছোট মাছের গতিবিধি অনায়াসে লক্ষ্য হয়—কিন্তু ছিপে একটিও ওঠে না। মাছ ধরা-ই যেখানে এত কঠিন, মানুষ ধরা কি সেখানে সম্ভব! একদৃষ্টে ছিপের দিকে চাহিয়া বিনয় কত কি ভাবিতে লাগিল। সহসা ছিপের ডগা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! ভালো করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িতেই পিছন হইতে কে তাহার দুই চোখ টিপিয়া ধরিল—অনেক দিন পরে ছিপে মাছ পড়িয়াছে! বিনয় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল—আঃ ছাড়ো, ছাড়ো মাছ পালালো! কেহ উত্তর দিল না, কেবল মৃদু চুড়ির শব্দমিশ্রিত চাপাহাসি তাহার কানে প্রবেশ করিল। বিনয় জোরে ছিপে টান দিতেই মাছ যথারীতি পলাইল—কঙ্কণ আসিয়া পাশে পড়িল।

—দেখলে তোমার জন্যই মাছটা পালালো।

—আমি না আসলেও পালাতো।

—ইস্ কত বড় মাছটা!

—বাস্তবিক—একটা পুঁটি।

—তা আমি কি করবো বল—তোমাদের চরে কি বড় মাছ আছে!

—তা বই কি—আমাদের চরের মাছ কি আর পছন্দ হবে! কঙ্কণের স্বরে অভিমান মিশ্রিত।

বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—সে কথা আমি বলিনি।

—থাক্ থাক্ বুঝেছি।

পূর্ব্ববনান্তের শিয়রে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষের মনে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিতেই সমস্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূসর পৃথিবী স্বর্ণাভ হইল, তারকা-হীন নভস্তল বিরাট দুই পাখা মেলিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল, নিকটে, দূরের তরুশ্রেণী নানা অপ্রাকৃত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই যে বাতাসটি উঠিবে সেই তালে তালে কাঁপিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আর ক্ষুদ্র সেই জলাশয়টির চারিদিকের কিনারা বেষ্টন করিয়া সোনালী একখানা পাড়ের মত তক্ তক্ করিয়া কাঁপিতে থাকিল।

বিনয় প্রথম কথা কহিল।

—কঙ্কণ, আমি ক'লকাতা যাচ্ছি।

—কবে?

—মাস দুয়েকের মধ্যেই।

—আবার কবে ফিরবে?

—পূজোর সময়।

কঙ্কণের বুক ঠেলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল। তবে এখানকার খেলা শেষ। পূজায়, তার তো অনেক দিন বাকি, একবার গেলে আর কি মানুষ ফেরে! আর ফিরলেও কি সেই সুরটি আর বাজিয়া ওঠে!

—আচ্ছা আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি নেতিবাচক উত্তর।

এবারে বিনয়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। মেয়েদের চোখ, কান পুরুষের অপেক্ষা সজাগ, সে নিঃশ্বাসটি তাহার কানে বাজিল। বিনয় যে তাহার উত্তরে দুঃখিত ইহা কেন যে তাহাকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিল—সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ইচ্ছা হইল বলে, তাহার নেতিবাচক উত্তর একান্ত মিথ্যা, বিনয় না থাকিলে তাহার সুখ কিসের! কিন্তু মনের কথা কণ্ঠে প্রকাশ যে অসম্ভব। কোন্ দারুণ বিধাতা মানুষের মনে ও ভাষায় এমন পরম অসামঞ্জস্যের বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। মুখের কথায় যখন প্রাণটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়, তখন একবার ভালো করিয়া চোখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে ভুলিয়ো না—কি জানি তাহাতে হয় তো ঠিক বিপরীত ভাব।

বিনয় কঙ্কণের হাত ধরিয়া টানিল, কঙ্কণ শক্ত হইয়া বাধা দিল। হঠাৎ দক্ষিণ হইতে ঝির ঝির করিয়া একটি বাতাস উঠিল, প্রথমে দূরের, অদূরের, নিকটের, অবশেষে ঠিক তাহাদের মাথার উপরকার শিরীষ শাখার পাতাগুলি কাঁপিয়া উঠিল। জলাশয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-লেখা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। বিনয় আবার তাহাকে কাছে টানিল। কঙ্কণ যেন অনিচ্ছায় পাশে সরিয়া বসিল। তাহার মুক্ত অলক বিনয়ের গায়ে স্পর্শ করিল, তাহার চুলের কষায়-মধুর তীব্র গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিল।

বিনয় তাহাকে আরো কাছে টানিল। একটা পথভ্রান্ত পাপিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে আকাশের মর্ম্মভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। কঙ্কণ নিজেকে বিনয়ের বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে একান্ত ভাবে সমর্পণ করিল। যুগল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনীর তালে তালে যুগল দেহের শিরা উপশিরায় রক্তধারার বিচিত্র জাল ধাবমান হইল। বিনয়ের মুখ কঙ্কণের মুখের দিকে নমিত হইল। কঙ্কণ মুখ সরাইয়া লইল। কোকিল ডাকিতে লাগিল। আবার—এবার আর সরিল না। বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে নদীগর্ভে শরবন যেমন অকস্মাৎ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, বিনয়ের ওষ্ঠস্পর্শে কঙ্কণের সর্ব্বদেহ তেমনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও নারীর মনে যে স্মৃতিটি অত্যুজ্জ্বল থাকে, সে তাহার প্রথম প্রণয়ের চুম্বনের।

সেই অবাতক্ষুব্ধ স্বচ্ছ সরোবরে পূর্ণিমার চাঁদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, দুইটি ছায়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, একের দেহসীমা হইতে অপরের দেহসীমা সেই পূর্ণিমার আলোকেও পৃথক করিয়া লক্ষ্য করা যায় না। নীলকান্ত সেই সরোবরের শিলাখণ্ডে যুগল মূর্ত্তির মীনার কাজ! রহিয়া রহিয়া জল শিহরিয়া উঠে, দুইটি ছায়া শিহরিত হয়, দুইটি মুখ একত্র হয়, ছায়া তদনুরূপ করে, দুইটি কপোল একত্র হয়, ছায়া তদনুরূপ, দুই জোড়া ওষ্ঠাধরের তীব্র তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী শীৎকার শব্দে দুইটি দেহ আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপে—ছায়া-যুগল আপাদমস্তক কাঁপিতে থাকে।

সেখানে একদল লোক, বালক, বালিকা, যুবতী, কিশোরী, দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, রাজসাহী হইতে লালগোলা-গামী জাহাজখানা কষ্টে প্রবল স্রোতের উজান ঠেলিয়া অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজের ধূমকল হইতে নির্গত ধূসর ধোঁয়া সেই বায়ু-লেশহীন সন্ধ্যার আকাশে স্তরে স্তরে জমিয়া বৃহৎ একটা সরীসৃপের মত, কেবল পিছনে অনেক দূরে তাহার সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার আভাস।

সকলে জাহাজটা দেখিতেছিল, কেহ কেহ ডেকের যাত্রীদের গুনিতে চেষ্টা করিতেছিল, দু'একটা ছেলে জাহাজের ধীরগতি দেখিয়া ছুটিয়া তাহার সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে নিকটের আউশের ক্ষেতের খানিকটা করিয়া ভাঙিয়া নীরবে জলের তলে চলিয়া যাইতেছে, প্রথমে সবটা জলের তলে চলিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে ধানগুলা আলগা হইয়া একবার ভাসিয়া উঠিয়া একটা পাক খাইয়াই তীরবেগে ছুটিয়া পলায়। ছেলেরা চীৎকার করিতে থাকে, ওই, ওই, ওই যাইতেছে,···বাস্, আর দেখা যায় না।

১১

বর্ষার সন্ধ্যা। পদ্মা এপার হইতে অতিদূর পরপার পর্য্যন্ত একটানা অখণ্ড একখানি গেরুয়া জলের চাদর। কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া মনে হয় না, কেবল যখন নৌকাগুলি নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিয়া যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় স্রোত কি তীব্র।

চরচিলমারীর অধিকাংশই ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল এক এক স্থানে পুঞ্জিত বসতির ধূসর খড়ের চাল গেরুয়া জলের উপর জাগিয়া আছে। চরের দক্ষিণ ধার দিয়া পদ্মার বৃহত্তর শাখাটা, সেদিকে প্রবল ভাঙন লাগিয়াছে। বর্ষার প্রথম হইতে ভাঙিতে সুরু করিয়াছে, এখনো অল্প অল্প করিয়া চলিতেছে।

আকাশের মধ্যস্থলে মেঘ বিশেষ নাই, কিন্তু ওপারের তীরে জলের মাথার উপর দিয়া সারিবন্দী স্তরে স্তরে মেঘ, আকাশ ধূসর, জলতল গেরুয়া, পৃথিবীর শ্যামচিহ্ন প্রায় লুপ্ত, অদৃশ্য একটা বিরাট বিহঙ্গের প্রসারিত পক্ষচ্ছায়ায় সমস্ত সৃষ্টিটাকে যেন ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

সেই দলের একান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ জাহাজের কাঠরার উপরে ঝুঁকিয়া-পড়া একটি মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিতেছিল। বিনয় কলিকাতা যাইতেছে। জাহাজের গতি মন্থর, লক্ষ্য করিবার অসুবিধা ছিল না, জাহাজ অনেকটা দূরে, ভালো করিয়া দেখিবার উপায় নাই, তবু মূর্ত্তিটি যে তাহার ইহাতে আর সন্দেহ নাই। মূর্ত্তি একবার ঋজু হইয়া দাঁড়াইল, আবার কাঠরার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। ডেকের উপরে আর সকলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কেবল ওই মূর্ত্তিটি নিশ্চল।

কঙ্কণ কি ভাবিতেছিল কি জানি; হয়তো বিশেষ কিছু ভাবিতেছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কায়াহীন অস্পষ্টতার মত বিদায়ের প্রদোষে তাহার মনের মধ্যে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, কেবল একটা অনির্দ্দেশ্য অনিশ্চয়তা, চিরন্তন বিচ্ছেদের অমূলক আশঙ্কা! হয় তো কিছু ভাবিতেছিল, কিন্তু সে ভাবনার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না।

কলিকাতা সে কতদূর! সে নাকি মস্ত সহর, এই রাজসাহীর অপেক্ষাও বড়। সেখানে নাকি অনেক লোক—বিজয়াদশমীর দিন রাজসাহীতে পদ্মার ধারে যত লোক জমা হয়, তাহার চাইতেও বেশি!

বিনয়ের মুখে সে কলিকাতার বর্ণনা কিছু কিছু শুনিয়াছে, সেখানে নাকি অনেক বাড়ীঘর, কত হাওয়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, অসংখ্য পথঘাট, অগণিত লোক। সেখানে মেলা ইস্কুল কলেজ, উহারি একটা কলেজে বিনয় পড়িবে, সেখানে কত মাষ্টার, তাহারা অনেক জানে। এক একটা কলেজে হাজার হাজার ছাত্র। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিনয় বলিয়াছিল, আজকাল মেয়েরাও ছেলেদের সহিত পড়ে। মেয়েরা কলেজে পড়ে! কঙ্কণও লিখিতে পড়িতে জানে, কিন্তু কলেজে পড়া? সে যে আর এক ধরণের। সেখানকার মেয়েরা কত জানে, কত বুদ্ধি তাদের, কত বিদ্যা, তাহারা কত সুন্দর। কঙ্কণের ভাবনায় কেমন জট পড়িয়া গেল—ওই জাহাজ, এই চর, কলিকাতা সহর, কলেজের মেয়ে সবসুদ্ধ মিলিয়া কেমন একটা গোল পাকাইয়া গেল!

হঠাৎ পাশের লোকদের চীৎকারে তাহার চমক ভাঙিল। খানিকটা মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে দুটা বাবলা ও খেজুর গাছ বহুদিন হইতে পরস্পর পাক খাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল, চরের একটা বিস্ময়ের বস্তু। সে দুটাও ধ্বসিয়া জলের তলে তলাইয়া গেল। খানিক পরেই আবার তাহারা জাগিয়া উঠিল, তাহাদের বহুদিনের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, আর একবারমাত্র তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া প্রবল টানে দুইটি দুইদিকে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

কঙ্কণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। আহা, উহারা কতদিনের

সাথী! পদ্মার কি নিষ্ঠুর স্রোত! এমনি করিয়া কত বন্ধন, কত কত সাথী, কত কি ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

জাহাজ ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, তীরের দলও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আকাশে মেঘ ও সন্ধ্যার দ্বিগুণিত ছায়া ক্রমেই ঘনায়িত হইয়া উঠিল। কঙ্কণ প্রায় একাকী।

মানুষ কি দূরে গেলে ফেরে! ফিরিলেও কি আর আগের মত থাকে! কি জানি। সে যে কলিকাতা সহর। কত বাড়ি ঘর, ইস্কুল কলেজ, ছাত্রছাত্রী। না, আর ফেরে না!

বিনয় জাহাজের রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চরের এই দলের মধ্যে একটি কিশোরীকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্রথমে কিছুতেই সে ঠাহর করিতে পারে নাই। আগাগোড়া দৃষ্টি বুলাইয়া যাইতে অবশেষে তাহাকে দেখিতে পাইল—ঐ যে একান্তে কঙ্কণ দল হইতে একটু পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া, নিকটে তাহার রাখাল ছেলেটি। কাল তাহাদের এই রকম পরামর্শ হইয়াছিল বটে—কঙ্কণ রাখালকে সঙ্গে লইয়া দল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, বিনয় কাঠরার উপরে নত হইয়া অপেক্ষা করিবে। তাহা না হইলে এতদূর হইতে চিনিতে পারিবে কি করিয়া! বিনয় ভাবিতেছিল—তাহার ভাবনা কঙ্কণের মত অসংলগ্ন না হইলেও তাহাতে আজ বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল না। বর্ত্তমানের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলিত চিন্তা কয়জনে করিতে পারে। ওই যে জলমগ্ন চরচিলমারী নূতন দিগন্ত ও পুরাতন স্মৃতির তলে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, ওইখানে তাহার জীবনে একটা গ্রন্থি পড়িয়া গিয়াছে। ওই যে কিশোরী বালিকাটি দল হইতে একটু পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার সঙ্গে কেমন করিয়া অকস্মাৎ তাহার জীবনের সূত্র গ্রথিত হইয়া গেল। জীবনের গতি যদি

সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এমন আকস্মিক কাণ্ড ঘটে কেন! তবে বুঝি আকস্মিকতাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটক! তাহার ভাবনার সঙ্গে পদ্মার অবিরাম কলধ্বনি মিশিতেছিল, চরচিলমারী অন্তর্হিতপ্রায়। বিনয় দেখিতেছিল, আলোড়িত ধূসর স্রোতে জাহাজখানার ছায়া নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবে পড়িতেছে, জলের স্রোতে নাচিতেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, ভাঙিয়া যাইতেছে। জল কোথায়ও বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিতেছে কোথায়ও কাহার হস্তবিন্যাসে যেন শয্যার মত বিস্তারিত হইতেছে, আবার কোথায়ওবা নূতন জলধারার সংশ্রবে কল কল করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

সহসা জাহাজের চাকার মন্থিত জলের শীতল শীকর বিনয়ের চমক ভাঙাইয়া দিল। জাহাজ মোড় ফিরিয়া খাড়া পাড়ি দিয়া পদ্মা পার হইতে লাগিল। ওপার কাছে আসিয়া পড়িল, এপার মিলাইয়া গেল। উঁচু পাড় ঘেঁসিয়া জাহাজ চলিতেছে, পাড়ের গাছ-পালার কালো ছায়া জলে পড়িয়া সুগভীর নদীকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। ঢেউয়ের আন্দোলনে সদ্যভগ্ন শিকড়-বাহির-হওয়া কূল হইতে ঝুর ঝুর করিয়া মাটি খসিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত কুটীরের মাটির দেয়াল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গৃহস্বামী পদ্মার ভয়ে পলাইবার সময় চাল, জানলা, দরজা যাহা সম্ভব খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনয় ফিরিয়া দেখিল চরচিলমারী আর দেখা যায় না, সেখানটা কেবল একটা বাষ্প-কুহেলিকার মতন। তাহার চিন্তাস্রোত এবার একূল হইতে ওকূলে আছাড় খাইতে লাগিল। প্রথম সেই চরচিলমারীতে হাঁস কিনিতে যাওয়া, তার পরে মৎস্যশীকার! তার পরে কত হাসি, কত খেলা। হাসিতে হাসিতে আমরা যে বীজ বপন করি, একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ফসল কাটিতে হয়!

আকাশে মেঘ নিবিড় হইয়া আসিল; পদ্মায় সেই ছায়া করাল হইয়া উঠিল, চারিদিক নিস্তব্ধ স্তম্ভিত, কেবল স্রোতের একটানা ছল ছল, আর মাঝে মাঝে জাহাজের পাশ ফিরিবার ঘর্ঘর।

অন্ধকারে চোখ চলে না; দূরে অতিদূরে গ্রামের দু'একটা প্রদীপ, মাঝে মাঝে ধূমকল হইতে নির্গত দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অন্ধকারে একচক্ষু জাহাজ তীব্র বিদ্যুত-আলোক নিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল; সেই আলোকরশ্মিতে একটানা জলতল বিরাট অজগরের মসৃণ চর্ম্মের মত চক্ চক্ করিয়া উঠে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া বিনয় কামরায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; একবার সেই দিকে তাকাইল—যেখানে কিছুক্ষণ আগে চরচিলমারী ছিল। হঠাৎ আকাশের উচ্চতম স্থান হইতে বিদ্যুতের একটা অগ্নিময় শূল সবেগে নামিয়া পড়িয়া দিগন্তের সেই অনির্দ্দিষ্ট স্থানটায় আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। বিনয় নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার সেই রহস্যময়ী পদ্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মেঘে ম্লান, শরতের স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা! কূলে শস্য, জলে নৌকা, স্থলে লোকালয় এই পদ্মা! বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকূল; বৈশাখের মেঘপতাকার গূঢ় সঙ্কেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ; উভয় তীরের ঝাউঝাড়গ্রাসী, ঘনায়মানা, কলগর্জ্জিতা; স্নেহশীলা জননীর ন্যায় কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নতনয়না; কখনো বা নৃত্যশীলা নটিনীর ন্যায় দ্রুত চরণ-চাঞ্চল্যে কলহাস্যময়ী; কখনো বা শবর-দুহিতা শ্যামাশর্ব্বরীর মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ধনুনিবদ্ধপাণি, যুগ্মতীরতূণীরা; শ্রান্তঅঞ্চলা শরৎশেষের ক্ষীণ শশিকলাটির প্রায় কখনো দিক্‌শয্যাপ্রান্তলগ্না! বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন বাংলার সমুদায় প্রান্তর-তলশায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদার, এই পদ্মা; জগতের

সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে দীর্ঘ, সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে একটানা একখানি আদিঅন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা! বাংলার প্রাণ-প্রতীক এই বিরাট নাগিনী!

কলিকাতা

১

বিনয় আজ দিন পনেরো হইল কলিকাতায় আসিয়া হ্যারিসন রোডের একটি বোর্ডিংএ আশ্রয় লইয়াছে। মফঃস্বলের ছেলে প্রথমে কলিকাতায় আসিলে যেমন হয় তেমনই হইয়াছে। কলিকাতা তাহার নিকটে একটা বৃহৎ জনতা, একটা বাজারমাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এটা যে বাংলাদেশের হেড-আফিসমাত্র নয়, এতগুলা লোকের বাস-স্থান, আশ্রয়, একথা তাহার মনেই হয় না। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে জীবনটা ছিল, তাহার যেন খেই হারাইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অভাগার মত বন্ধুবান্ধবহীন এই বিরাট জনতার মধ্যে সে অতীতের প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিয়মিত কলেজে যায়, বিকালে বেড়াইতে যায়, কিন্তু সবই যেন কেমন তন্দ্রাবিষ্টের মত। সম্মুখেই পথের লোক-চলাচল, যেন কতদূর দিয়া!

কলেজ হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসে। পথের জনতা, ট্রাম, বাস্, মোটর। বেলা পড়িতে থাকে, রাস্তার উপারের বড় বাড়ীটার ছায়া দীর্ঘতর হইতে থাকে। উড়ে কুলিরা 'হোসে' করিয়া জলধারায় পথ ধুইয়া যায়, তপ্ত পথ হইতে বাষ্পের ভাপ উঠে, তারপরে মৃদু একটি সিক্ত গন্ধ! আরো বেলা পড়ে, শিয়ালদহের দিকে যাত্রীর দল ছুটিতে থাকে। বিনয় বারান্দা ছাড়িয়া ওঠে না। হয়তো এক পাক ঘুরিয়া আসিল, আবার সেই বারান্দায়! সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, শিয়ালদহের যাত্রী, কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া চলিতেছে, ট্যাক্সিগুলা উড়িয়া চলে। শিয়ালদহের যাত্রীদের কেন যেন অত্যন্ত আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেদের কাছে শিয়ালদহ ষ্টেশনটি কতই যেন আদরের বস্তু। বিনয় হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখে, ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। তবে তো ওই যাত্রীরা রাজসাহীর ট্রেনের জন্যই চলিয়াছে। তাহার ইচ্ছা করে, ওদের সঙ্গে চলিয়া যায়; অন্তত একবার উহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আসে। কোথায় যাবেন? রাজসাহী। আমারো বাড়ী সেখানে। চরচিলমারী চেনেন? কিন্তু সে বসিয়াই থাকে।

এক একদিন রাত্রে বাদল-বাতাসে খড়্খড়ির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায়। ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি; জানলায়, দরজায় ভিজে হাওয়ার আছড়ানি।

সেই অর্দ্ধ ঘুমে জাগরণে, তাহার মনে হয়, সে রাজসাহীর বাড়ীতেই আছে। অবিরাম বৃষ্টিতে এতক্ষণে পদ্মা জাগিয়া উঠিয়াছে। জলে নৌকা নাই, তীরে লোকজন নাই, কেবল এপার হইতে ক্ষ্যাপা হাওয়া ওপারের বৃষ্টির ছাটে ভর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কালো পদ্মা, কালো রাত্রি। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়,

প্রেতের হাসির মত পদ্মার স্রোতের দীপ্তি, আর অতি দূরে ওই ছায়া-অস্পষ্টতাটি চর-চিলমারী! কিন্তু ভাল করিয়া তাহার ঘুম ভাঙিতেই বোঝে, এ তাহার কলিকাতার মেস্। বৃষ্টি পড়িতেই থাকে, বিনয় পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

এই তো তাহার কলিকাতার জীবন। এখানে যে সহস্র সহস্র জীবনের ধারা মিলিয়াছে, তাহা পদ্মার চেয়ে কত বড়, কত গভীর। কিন্তু সে স্রোতে আজিও বিনয়ের জীবনধারা মিলিত হয় নাই। সে দূরে, তীরে দাঁড়াইয়া আছে, দর্শক মাত্র। মহা-ধীবর আকস্মিকতা, ঘটনাচক্রের জাল ফেলিয়া অবহেলাচ্ছলে কত লোককে একসঙ্গে টানিয়া তুলিতেছে। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, অপরিচিত, নানা জীবন মিলিয়া কেমন তাল পাকাইয়া যাইতেছে। সেই মহা-ধীবর এতগুলি জীবন তুলিয়া ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, এবং তারপর হইতে তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভিরুচি অনুসারে কত কি সুখদুঃখের খেলা পাতিয়া বসিতেছে।

আবার হঠাৎ কখন অতর্কিতে সেই জাল আসিয়া ঘাড়ে পড়ে, সমস্ত ভাঙিয়া যায়। আবার কাহার সঙ্গে কাহাকে মিলাইয়া দেয়, কোথায় টানিয়া লইয়া যায়, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না।

এই ধীবর একদিন বিনয়কে চর-চিলমারীতে টানিয়া তুলিয়াছিল; সেই আবার আজ তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এখানকার ঘটনাচক্রের জালে এখনো সে পড়ে নাই! এই মহাজালিকের হাতে কাহারো নিষ্কৃতি নাই, তবে মাঝে মাঝে বিশ্রাম ঘটে।

হঠাৎ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের সহিত বিনয়ের পরিচয় ঘটিয়া গেল। অধ্যাপক রায় ইতিহাসের ধারার অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে

কৃতা করিতেছিলেন। বিনয় কেমন উসুখুসু করিতেছিল।
ধ্যাপক রায় বলিলেন, চৌধুরী তোমার কি কিছু বলবার আছে?
বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা অবাক্!
বিনয় বলিল, ইতিহাসের ধারার অবিরতি কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।
—কেন বল তো?
—শুধু ইতিহাস কেন, ক্রমবিকাশবাদ, মানবজীবন, পদার্থবিজ্ঞান
ানটা সম্বন্ধেই একথা পুরাপুরি খাটে না।
—আরো একটু স্পষ্ট করে বল!
বিনয় বলিতে লাগিল। অধ্যাপকের উৎসাহে তাহার দ্বিধা
টয়া গেল।
—পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারে এই সত্যটাকে নূতন
ব দেখা গিয়েছে। ক্ষুদ্রতম বস্তু-কণিকা পরস্পরকে আবর্তিত
া, এই ধারণাই এতদিন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ হয়েছে, এই
ার্তনটা সম্পূর্ণভাবে অবিরাম নয়। মাঝে মাঝে বস্তুকণিকাগুলি
ারণে একটা করে উল্লম্ফন দিয়ে পূর্ব্বতন ধারাকে খানিকটা পরিমাণে
াকার করে নেয়।
ক্লাসের ছেলেরা নিস্তব্ধ।
রায় বলিলেন, বেশ, এবার এই বিজ্ঞানের সত্যটাকে ইতিহাসের
র প্রয়োগ কর।
—ইতিহাসের ধারাতেও মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে, যা, পূর্ব্বের
অসমন্বয় ঘটিয়ে দেয়।
—কি রকম?
—কোনো বড়লোক বা বড় ঘটনা, দুইই—এ কাজ করতে পারে।
নেপোলিয়ান। তাঁর কুড়ি বছরের কর্ম্মজীবন অতীত ও

ভবিষ্যতের মাঝে এমন প্রভেদ এনে দিয়েছিল, যাকে ঘটনাস্রোতের অবিরতি কখনই বলা যায় না। কিম্বা গত মহাযুদ্ধটা—চার বৎসরে মানব-জীবনের সমস্ত পৌর্ব্বাপর্ব্য একেবারে ছিন্ন করে দিয়েছে। এই অনির্দ্দেশ্যতা, এর সম্ভাবনা তো সর্ব্বদাই রয়েছে।

অধ্যাপক খুসি হইয়া বিনয়ের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, তাহার কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত।

ক্লাসের পরে বিনয়কে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কি রকম পড়াশুনা করিয়াছে, তাহা জানিয়া লইলেন এবং বাড়ি ফিরিবার সময় বিনয়কে তাঁহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

বিনয় আজ কলেজে আসিবার সময় এত কাণ্ড যে ঘটিবে, স্বপ্নেও ভাবে নাই!

অধ্যাপক রায়, অর্থাৎ অবিনাশবাবুর বৈকালিক চায়ের টেবিলে নিয়মিত অতিথিরা আসিয়া তখনো উপস্থিত হয় নাই। অবিনাশ বাবু, তাঁহার কন্যা পারুল ও বিনয়, এই তিন জনেই গল্প চলিতেছিল

অবিনাশবাবু বলিলেন—মা পারুল, বিনয়কে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে দাও। পারুল ঢালিতে লাগিল। এই অবসরে বিনয় অবিনাশবাবুও তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

অবিনাশবাবু দীর্ঘাকৃতি, কপালটা গড়াইয়া চুলের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মাথার চারিদিকের চুল পাকিয়া উঠিয়াছে,

মধ্যভাগ সম্পূর্ণ কাঁচা। রোম-বহুল ভারি দুইটি ভ্রূ। প্রশস্ত কপালের সহিত তাল রাখিতে পারে এমন মাংসল চিবুক; উন্নত নাসিকা, চিবুক ও কপালের মাঝে মানদণ্ডের মত। অবিনাশবাবু বোধকরি একটু তোৎলা, সব সময় বোঝা যায় না, কেবল যে শব্দটার উপরে তাঁহার জোর দিবার প্রয়োজন, সেখানে আসিয়া জিহ্বার জড়তা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তুচ্ছ কথাটাও অকাট্য একটা যুক্তির মত শোনায়।

পিতাকে লক্ষ্য করা যেমন সহজ, কন্যা তেমন নহে। চা-প্রস্তুত-রতা পারুলের দৃষ্টি মাঝে মাঝে বিনয়ের চক্ষুকে বাধাগ্রস্ত করিতে লাগিল। মেয়েটির বয়স ষোল হইতে কুড়ির মধ্যে এবং কৃপণের টাকার থলির মধ্যে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রাটির মত তাহার অধরোষ্ঠে চাপা একটি মৃদুহাস্য। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল এবং সতর্ক! বিনয় পাঁচ ছয় বার অপ্রস্তুত হইয়া বুঝিয়াছিল, সে-দৃষ্টি এড়াইয়া চলা তাহার সাধ্য নয়।

পারুল চায়ের পেয়ালা অগ্রসর করিয়া দিল। বিনয় তাহা টানিয়া লইতে ঢিলা পাঞ্জাবীর আস্তিনে বাধিয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া পেয়ালা ভাঙিয়া গেল। অবিনাশবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বিনয় লাল হইল, পারুল উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া উঠিল।

—ছিঃ মা পারুল! হাস্‌তে নেই। আর এক পেয়ালা শীগগির করে' দাও।

পারুল অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় চা করিতে লাগিল, বিনয় লক্ষ্য করিল, এবার তাহার অধরের স্বর্ণমুদ্রাটি অন্তর্হিত হইয়াছে, চোখ দুইটির উজ্জ্বলতা ম্লান।

এমন সময়ে রায়-গৃহিণী সর্ব্বেশ্বরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাথায় খাটো, প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা শরীরে দেখা দিয়াছে। মুখে সর্ব্বদা হাসি ও পান। একটি বিপুল পানের বাটা সঙ্গে বিরাজ করে। অবিনাশবাবু বিনয়ের পরিচয় দিলেন।

সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—তা বেশ, বেশ, তোমরা তাহ'লে জমিদার! ক'বিঘে জমি তোমাদের আছে?

এই 'বেশ, বেশ', কথাটি সর্ব্বেশ্বরীর মুদ্রা-দোষের মধ্যে, সংবাদ ভালই হউক, মন্দই হউক, বেশ, বেশ, বলা চাই। অনেক সময় এমন বিপদ ঘটে, কাহারো মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অভ্যাসমত বলিয়া উঠেন, বেশ, বেশ! লোকে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

—আমরাও জমিদার বটে, কার্ত্তিকপুরের নাম শোনা আছে? এই মুর্শিদাবাদ জেলায়। আমাদেরও অনেক জমি আছে। পৈতৃক পঁয়ত্রিশ বিঘে, আর ওঁর কেনা সতেরো বিঘে, এই হ'ল গিয়ে বাহান্ন, তাই হ'ল না গা!

বিনয় সম্মতি জানাইল।

অপরিচিত লোক আসিলেই গৃহিণীর এই বিস্তৃত জমিদারির পরিচয় দান করার হাস্যকর অভিনয় অবিনাশবাবুর সহিয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম তিনি আপত্তি করিতেন; তাহাতে সর্ব্বেশ্বরীর আরো রোখ চাপিয়া যাইত। তিনি বলিতেন, আহা লুকোচ্ছ কেন, এতখানি জমি একসঙ্গে কার আছে বল! বিনয় করা ভাল, তাই বলে কি সত্যি কথা বল্‌তে হবে না! তা বেশ, বেশ!

কিন্তু মাতার এই অভ্যাসটি পারুলের এখনো সহ্য হয় নাই। সে লাল হইয়া উঠিতে উঠিতে ভাবিতেছিল, এইবার বিনয়ের হাসিবার পালা।

সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, পান খাওয়া হয়?

বিনয় তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য সম্মতি জানাইল।

—বেশ, বেশ, এই তো চাই। হাজার হোক্, একটা জমিদার তো বটে। বিনয়কে পান দিলেন।

—আমাদের এখানে ও কারবার নাই। উনি খাবেন না, আবার ওঁর দেখাদেখি, মেয়েও মেমসাহেব হ'য়ে উঠেছে। মেয়েমানুষ পান খায় না, আর—

পারুল অত্যন্ত কাতর ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে গৃহে দুইজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে উঠিয়া পড়িলেন।

—ওই যে, ওরা আবার আস্‌ছে। তোমরা বোস, তা বেশ, বেশ!

অপ্রসন্ন হইবার কারণ, আগন্তুক দুইজন, পানও খায় না, জমিদারীর সংবাদেও উৎসুক নয়। অপ্রসন্ন সর্ব্বেশ্বরী সুবৃহৎ পানের বাটা হাতে হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন আসিয়া একেবারে একখানা আরাম-চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিল,—চৌধুরী, চৌধুরী, তোর পা দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো! ইস্ কি 'শুট', মাইরি! অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রূপেন, কি ব্যাপার!

—ন্যাশানাল ডিফীট্, স্যর, একেবারে জাতীয় পরাজয়। চৌধুরী কি খেলেছিল, স্যর, কেবল বেটা 'ব্যাক'—

হঠাৎ পারুলকে চোখে পড়ায় বিশেষণটা অনুক্ত রহিয়া গেল। একেবারে বীররসের নিখাদ হইতে বিপরীত রসের খাদে রূপেনের গলা নামিয়া আসিল। মৃদু হাসিয়া, মাথাটা একটু দোলাইয়া বলিল— এই যে আপনি।

অন্যজনের পোষাক-পরিচ্ছদে একটু বিশেষত্ব ছিল। হাফপ্যাণ্ট ও হাত-কাটা শার্ট, দুটারই রং লাল। মাথায় একরাশ চুল, তেল না পড়ায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া আছে। ছবিতে কোন কোন রুষদেশীয় রাজনৈতিক নেতার যেমন দেখা যায়, অনেকটা তেমনি। সে আসিয়া একখানা চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া পিঠ-দানের দিকটা সম্মুখে দিয়া দুই দিকে দুই পা রাখিয়া পিঠ-দানের উপরে হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া বসিল!

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমেশ, খবর কি!

পরমেশ আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—ক্লান্ত, ক্লান্ত! পরমেশ সর্ব্বদাই ক্লান্ত। সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে সর্ব্বদাই। কাজেই কেহ আর তাহার ক্লান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে না। অবিনাশ বাবু পারুলকে বলিলেন, মা, চা; পুনরায় তিনি হাতের পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

চা পান করিতে করিতে রূপেন ও পরমেশের সহিত বিনয়ের আলাপ হইল। এসব স্থলে যেমন হয় তেমনি হইল—অর্থাৎ আলাপটা, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ইকনমিক কনফারেন্সে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সাহিত্যের সমতল-ভূমিতে নামিয়া আসিল। ইহার পরেই আধুনিক সাহিত্যের জলাজমি, এবং চরম পরিণাম রাজনীতির মহাসমুদ্র।

তিনজনে তখন আধুনিক সাহিত্যের জলা-জমিতে অর্দ্ধ-মগ্ন ভাবে বিচরণ করিতেছিল।

রূপেন বলিল—বাংলাসাহিত্য শরৎবাবুতে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। পরমেশ উত্তেজিত হইয়া আছে; সে বলিল—বল কি! শরৎবাবু তো মহিলা এবং আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটদের লেখক। তাঁর পরের যাঁরা লেখক তাঁরাই দেশকে কতকটা বুঝেছেন। দরদ, দরদ চাই, বুঝলে রূপেন? সব লাল হো যায়গা।

রূপেন—তুমি অযথা রাশিয়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছ ভাই। তরুণ সাহিত্যিক-দের মস্ত দোষ, জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, দেশের সঙ্গে তাদের যোগ নেই।

অতঃপর তিনজনে মিলিয়া তরুণ সাহিত্যিকদের দোষবিচারে নিযুক্ত হইল।

এমন সময়ে সকলের অলক্ষ্যে একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। বয়স তাহার বছর ত্রিশ, দাড়ি গোঁপ কামানো, পাঞ্জাবীর ঝুলটা আধু-নিক কালের পক্ষে কিছু বেশী, পাঞ্জাবীর দুই পকেট নানা দ্রব্যে ভারী হইয়া দুইদিকে আরো খানিকটা নীচু করিয়া দিয়াছে। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি সন্তর্পণে এক কোণে ছাতাটা ঠেস দিয়া রাখিয়া সকলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন বিনয়দের মধ্যে আলোচনায় প্রায় স্থির হইয়াছে, তরুণ সাহিত্যিকদের জীবনের সহিত যোগের অভাব। নবাগত ভদ্রলোকটি একটি চাপা হাসি হাসিয়া বলিল,—লিভার মশাই, লিভার খারাপ।

রূপেন ও পরমেশ চমকিয়া উঠিল—আরে রমানাথ যে!

রমানাথ সতর্কভাবে একখানা চেয়ারের ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া চাপিয়া বসিল—

—কি আলাপ হ'চ্ছিল?

—সাহিত্যিকদের দোষ।

—আর কোন দোষ নেই মশায়, লিভার খারাপ। বাংলাদেশের পৌনে ষোল আনা লোকের লিভারের দোষ, সাহিত্যিকদের মধ্যে ষোল আনা। লিভার ভালো না হলে আমাদের উদ্ধার নেই। আমাদের বড় সাহেবের—সাহেবের নাম শুনিয়া পরমেশ রাগে চীৎকার

করিয়া উঠিল। রমানাথ আর একটা চাপা হাসি হাসিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা প্লেট তুলিয়া পরমেশের সম্মুখে সেটা স্থাপন করিয়া বলিল—শাট্ আপ (shut up), সঙ্গে আর একবার চাপা হাসি। রমানাথের চাপা হাসিটি ভারতীয় সভ্যতার একটি আদি ও অকৃত্রিম 'অবদান'।' যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমকে দমাইয়া দিবার পক্ষে এমন জিনিষ আর নাই।

পরমেশ দমিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

—রবিবাবু যে বড় কবি তার কারণ কি ?

—কল্পনা-শক্তি !

—তোমার মাথা ! লিভার ! ও রকম লিভার সেক্সপীয়রের পরে আর কারো হয়নি।

এই সব আলোচনায় পারুল বড় যোগ দিত না, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে বেকার দেখিয়া তাহার আদরের সাদা বিড়াল-ছানাটি কাছে আসিয়া তুড়ুক করিয়া পারুলের কোলে উঠিয়া একবার ওলট পালট খাইয়া শুইয়া পড়িল।

এমন সময়ে পারুলের বন্ধু বেবি গৃহে প্রবেশ করিলেন। কোন কালে তিনি বেবি ছিলেন সন্দেহ নাই, আজ তিনি যুবতী, আমরা কিন্তু নাম ও বয়স উভয়ের মর্য্যাদা রাখিয়া তাঁহাকে কিশোরী বলিব। দীর্ঘ ছিপ্‌ছিপে পাতলা গড়ন, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের যষ্টিখানার মত সরল শাড়িখানা স্কন্ধ হইতে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের কাছে নামিয়া পেখমের মত দুলিতেছে। পায়ে গোড়ালি-উঁচু জুতা ; ভয় হয় কখন বা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যান।

বেবিকে দেখিয়াই, বিড়ালটা পারুলের নিকট হইতে টপ করিয়া নামিয়া পড়িল। একবার আপাদমস্তক ধনুকের মত বক্র ভাবে সঞ্চালন

করিয়া ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। বেবি তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন।

—ওঃ ডিয়ারি, ডিয়ারি! ডিয়ারি-ডিয়ারি! বিড়ালটি প্রায় ধৃত হইয়াছিল, নিরুপায় দেখিয়া সে এক দুঃসাধ্য চাল দিল। বেবির উদ্যত আক্রমণ নিষ্ফল করিয়া সে তাহার জুতার গোড়ালির ফাঁক দিয়া টুক করিয়া গলিয়া পলায়ন করিল। সকলে হাসিয়া উঠিল। বেবি লাল হইয়া উঠিয়া বিড়ালটাকে অনুসরণ করিয়া অন্য ঘরে প্রস্থান করিলেন—তখনও শোনা যাইতেছিল—ওঃ, নটি, ডিয়ারি, ডিয়ারি!

পারুল বন্ধুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিনয় অবিনাশবাবুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইল। অবিনাশবাবু তাহাকে প্রত্যহ আসিতে বলিলেন।

রূপেন গা এলাইয়া দিয়া হতাশার স্বরে বলিল—ন্যাশান্যাল ডিফীট্। আঃ ন্যাশান্যাল ডিফীট্।

পরমেশ চেয়ারের পিঠদানের উপর অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত!

রমানাথ সেই আদি ও অকৃত্রিম চাপা হাসি দিয়া বলিল—লিভারের দোষ মশাই, লিভারের দোষ।

৩

একদিন বিকালবেলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি বড় বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনয় কপালের ঘাম মুছিতেছিল—মাসিকপত্রের

অফিস ; ভিতরে রাশি রাশি কাগজ, দলে দলে লোক, চৌকি চেয়ার আলমারী, একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ! বিশাল অফিস অধিকার করিয়া দুইটি বিরাট মূর্ত্তি ; যেমন ওজনভারি পত্রিকা, তেমনি নিরেট সম্পাদকযুগল।

বিনয় আজ সাহসে ভর করিয়া একটি কবিতা ও একটি নাটক আনিয়াছে, একেবারে সশরীরে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের হাতে দিবে। কাল রাত্রে কাজটা যত সহজ মনে করিয়াছিল, আজ কার্য্যস্থলে আসিয়া তত সহজ মনে হইল না। অফিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল। ভিতরের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। একজন কম্পোজিটর আসিয়া বলিল—হুজুর, দু'য়ের ফর্ম্মার শেষ পাতায় তিন ইঞ্চি ম্যাটার চাই।

—তিন ইঞ্চি? ওরে দ্যাখতোরে, একটা তিন ইঞ্চি কবিতা-টবিতা পাস্ কিনা?

কবিতার এই অভিনব পরিমাপ শুনিয়া বিনয়ের কল্পনা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

একজন সহকারী ফাইল ঘাঁটিয়া বলিল—একটা খুব ভাল কবিতা আছে।

—কি রকম?

—খুব ওরিজিন্যাল।

—ক' ইঞ্চি?

নিকটেই গজকাঠি ছিল, তাহা দিয়া মাপিয়া সহকারী বলিল, আজ্ঞে ইঞ্চি পাঁচেক।

—এক কাজ কর, ওর ইঞ্চি দুই ছেঁটে দে।

সহকারী কোন্ দিক হইতে দু'ইঞ্চি ছাঁটিবে, ভাবিতে লাগিল।

—আজ্ঞে কোন্ দিক থেকে—

—আরম্ভ, শেষ দুদিক থেকে এক ইঞ্চি করে ছেঁটে দে; তাহ'লে অবিচার হবে না।

এই সুবিচার স্বচক্ষে দেখিয়া বিনয়-আনীত কবিতাটি আলাদা করিয়া পকেটে রাখিয়া দিল। কেবল নাটকটি লইয়া এখন সে ভাগ্য-পরীক্ষা করিবে।

একবার কাসিয়া লইয়া গলা পরিষ্কার করিল; একবার ইতস্তত তাকাইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া দম সঞ্চয় করিল, তারপরে কম্পিত পদে সে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পরে সম্পাদকযুগ্মের নিকটে গিয়া একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দুই বিশালবপু, যেন মিশরের যুগ্ম পিরামিড, তবে প্রভেদ এই পিরামিডের ভিতরে ধনরত্ন আছে বলিয়া লোকের অনুমান, ইঁহাদের সম্বন্ধে সে-সন্দেহ পরম বন্ধুতেও করে না।

যুগলমূর্ত্তি বিনয়ের দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করিয়া একতানে নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিল—হুঁ—

এই সুগভীর হুঁ শব্দটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা একেবারে মূর্ত্তি-দুটির নাভিমূল হইতে উঠিল।

—একটা নাটক···

পুনরায় সমস্বরে, সমতালে সুগম্ভীর সেই, হুঁ—

—পত্রিকার জন্য। বিনয়ের ঘাম ছুটিতে লাগিল।

—হুঁ—

বিনয়ের সাহস ভাঙিয়া পড়িল, একলাফে সে অফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িয়া, দ্রুত চলিতে লাগিল। তখনো তাহার কানে বাজিতেছিল সেই সুগভীর সুনিঃশ্বসিত হুঁ শব্দের হুহুঙ্কার।

বিনয় চলিতে চলিতে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, পরিচিত কেহ তাহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ফেলিয়াছে কিনা! যাক্ কেহ দেখে নাই। একেবারে সে হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া থামিল।

বিনয় অনেক দিন হইতে লেখে, নিয়মিত পত্রিকায় পাঠায়, কেহ ছাপে না। দেশে পত্রিকার অভাব, তাহা তো নয়! এস্প্লানেডে ট্রামের যাত্রীদের জন্য যে টালির আশ্রয়টা আছে, বৃষ্টির দিনে সেখানে আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া সে বিপন্ন হইয়াছে। মেঝের সবটুকু জায়গা জুড়িয়া পত্রিকার ষ্টল। বামনরূপী তরুণ-সাহিত্য মাসিকপত্রের তৃতীয় চরণ বাহির করিয়া নিরাশ্রয়ের এই আশ্রয়টুকু নিতান্ত অবলীলাক্রমে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের ষ্টলগুলিতে সে পত্রিকা ঘাঁটিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত মোটা মর্য্যাদাবান্ অভিজাত-পত্রিকাগুলি আর দেখিল না, তাহারা বিনয়ের লেখা ছাপিবে না। নগরোপকণ্ঠের ক্ষীণকায় কাগজগুলির প্রতিই তাহার ভরসা। একখানা, দু'খানা, তিনখানা—নাই—নাই—নাই। হঠাৎ একখানাতে একি! এ যে তাহার নাম! কিন্তু দু'জনের এক নাম থাকা বিচিত্র নয়! না, সে হইতেই পারে না, এ যে তাহারই কবিতা! একবার দু'বার পড়িল, তৃপ্তি আর হয় না। দু'আনা মূল্যের কাগজ ব্যস্ততায় সে একটা সিকি দিয়া কিনিয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তা পার হইয়া পুরাতন পুঁথির দোকানগুলির কাছে দাঁড়াইয়া কবিতাটি আবার পড়িল! পথে বার বার এক লেখা পড়িতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল, পুরাতন পুঁথি দেখিবার ভাণ করিয়া, মাঝে মাঝে পাতা উল্টাইয়া পড়িয়া লয়। তাহার প্রথম লেখা ছাপার অক্ষরে। আনন্দে তাহার চোখে

জল আসিবার উপক্রম হইল। শেষে বুঝিল, একটু নির্জ্জন স্থান না পাইলে এই জনতার মধ্যে সে কি এক কাণ্ড করিয়া বসিবে! কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কলেজ ষ্ট্রীট ধরিয়া সে প্রায় ছুটিয়া চলিল। বোধ হয় মুখে তাহার উৎসাহের অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাতে কাগজ, মুখে আনন্দ, গতি ত্বরিত দেখিয়া দু'জন পথচারী ক্লান্ত যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—লোকটা বোধ হয় চাকরি পেয়েছে!

কথাটা বিনয়ের কানে গেল; বুঝিতে পারিল, তাহার অবস্থাটা কেমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কলেজ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া দেখিল ভিতরে ভিড়; হঠাৎ মনে পড়িল, সিনেট-হাউসটা নির্জ্জন, এখনো খোলা আছে। বিনয় সিনেট-হাউসে ঢুকিয়া একটা বিজলি-বাতির তলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে অসঙ্কোচে কাগজখানা খুলিয়া নিজের লেখা পড়িতে লাগিল।

তাহার প্রথম লেখা, ছাপার অক্ষরে। কবিতাটি বারবার পড়িল। তলে তাহার নামটি। সেটিকে কতবার কত রকমে পড়িল, একবার প্রথম হইতে, একবার শেষ হইতে, একবার মাঝ হইতে। শ্রীবিনয়কুমার চৌধুরী; চৌধুরী শ্রীবিনয় কুমার, কুমার বিনয় চৌধুরী। চোখের ক্ষুধা আর মেটে না। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময় যদি ছাপার চলন থাকিত, তবে বলিতে পারিতাম, পদকর্ত্তা নিজের মুদ্রিত নামটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

ক্রমে বিনয়ের কর্ণ হইতে অন্য শব্দ বিলুপ্ত হইয়া গেল, গাড়ী ঘোড়া মোটরের কোনো শব্দ নাই, এমন কি সেই সম্পাদকীয় হুঁ

শব্দটিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার কবিতার ধ্বনিরূপটি—তাহার চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল, সমস্ত ঝাপসা হইয়া আসিল; দ্রোণের অস্ত্র-পরীক্ষায় অর্জ্জুনের দৃষ্টি হইতে লক্ষ্যবিদ্ধ পক্ষীটির চক্ষুব্যতীত আর সব যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার দৃষ্টিতে তাহার নামের অক্ষর ক'টি ছাড়া আর সব কোথায় মিলাইয়া গেল। পত্রিকাখানি বারংবার সে স্পর্শ করিল, নূতন কাগজের গন্ধটিও যেন তাহার কত প্রিয়! শব্দস্পর্শরূপগন্ধ চতুরিন্দ্রিয়-দ্বারা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন অমরতার স্বাদ পাইল। এই ভাবে কতক্ষণ কাটিল সে বুঝিতে পারে নাই। যখন তন্দ্রা ভাঙিল, বিনয় দেখিল বৃহৎ কক্ষ নির্জ্জন, অন্ধকার, কেহ তাহাকে এ অবস্থায় দেখে নাই ভাবিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। হঠাৎ সে উপরে তাকাইল, এ কি! একজনের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারে নাই। যখন সে মাথা নীচু করিয়া লেখা পড়িতেছিল, তাহার মাথার উপর হইতে বঙ্কিম-চন্দ্র কৌতুকপূর্ণ নেত্রে রহস্যময় চাপা হাসিতে তাহার এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। স্থানকালপাত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশে ব্যাপারটা হঠাৎ যেন সত্যের মত ঠেকিয়াছিল। প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। ঘটনাক্রমে বিনয় বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্রের নিম্নে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

তাহার এই লেখক-জীবনের দুর্ব্বলতা বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক দেখিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে বিনয়ের কিছু সঙ্কোচ নাই। বরং তাহার প্রথম রচনার উপরে যে বঙ্কিমের আনত-দৃষ্টির আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহার কেমন যেন আশ্বাসপূর্ণ আনন্দ হইল। বিনয় বঙ্কিমের উদ্দেশে একটা প্রণাম নিবেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কি উদ্দেশ্যে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন জানি না! পণ্ডিতেরা বলেন মানুষ নাকি স্রষ্টার সৃজনীশক্তির চরম! হয় তো তাই। কিন্তু তাহা হইলে অপরিমেয় এই সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্থান এমন উপেক্ষনীয় অকিঞ্চিৎকর কেন? কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ-তারার মধ্যে কেবল ক্ষুদ্রতম এই পৃথিবীটিতে মানুষ কেন? তাহারও আবার তিনভাগ জলময় মরু; বাকি একচতুর্থাংশের মরু, মেরু নদী গিরি বন ছাড়িয়া দিয়া, যেটুকু থাকে, তাহাতে মানুষের বাস! এসব ভাবিলে মানুষকে অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু সে যে বিধাতার একটা আদরের বস্তু তা মনে করি কেমন করিয়া! হয় তো ইহা একটা বিধাতার ভুল! এই সুবৃহৎ বিশ্বগ্রন্থের কোনো পাদটীকায় কিম্বা কোনো শেষের দিকের পাতাখানায় হয় তো এই ভ্রম সংশোধনের উল্লেখ আছে! কিম্বা, অপরূপ রোমাঞ্চকর এই বিশ্বের মহানাট্যে মানুষের ভাগ্যে বিদূষকের ভূমিকা! তুষারার্দ্র গিরিশৃঙ্গ যখন নির্ব্বাক্‌ভাবে মহাসমুদ্রের অব্যক্ত কলধ্বনি শুনিতেছে, এই বিদূষকটি তখন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া, নিজের বৈসাদৃশ্যে একটুখানি হাসাইয়া যায়। ধ্যানস্তব্ধ ধরণী যেখানে অনন্ত-নভোশায়ী নক্ষত্রের পরিভাষা পাঠ করিতেছে, এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটি সেখানে আসিয়া কালের অনিত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। বিধাতা নিজের কৃতিত্বে হাসেন! কিন্তু ইহা নিশ্চয়, সে এই মহানাট্যের নায়ক নহে, বিদূষক মাত্র। স্বতোবিরুদ্ধতা-ই তাহার জীবনরসের প্রধান উপজীব্য!

বিশ্বভাবের এই অনুবর্ত্তন ক্ষুদ্রতর আকারে প্রত্যেক সংসারে চলিতেছে! অধ্যাপক রায়ের পরিবার ইহার একটা অভ্রান্ত উদাহরণ। রায়-পরিবারে চারটি প্রাণী! অবিনাশবাবু, গৃহিণী সর্ব্বেশ্বরী, কন্যা পারুল, আর পুত্র নিতাই। চারিটি প্রাণ, দুইটি দল; ভাগে সমান পড়িয়াছে। পুত্র ও মাতা, কন্যা ও পিতা! উভয় দলের কলহ-কোলাহলে ও অব্যক্ত গঞ্জনায় বাড়ীখানিকে সর্ব্বদা কুরু-পাণ্ডবের শিবিরের মত ব্যস্তসমস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তবু তো ইহাদের টাকার অভাব নাই; সে-দুঃখ থাকিলে ব্যাপারটা জটিলতর হইয়া উঠিত, এবং কুরু-পাণ্ডবের উপমাতে চলিত না।

পিতার ইচ্ছা মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শিখাইবেন; মাতা গর্জ্জন করিয়া বলেন, কেন, মেয়ে কি হাইকোর্টের জজ হইবে! যুক্তি অভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। মাতার ইচ্ছা ছেলেটি একটু গান বাজনা শিখিয়া সামাজিক হইয়া উঠুক। পিতা অব্যক্ত রোষে তর্জ্জন করিয়া ওঠেন—তুমিই ছেলেটাকে বইয়ে দিলে! পিতা যখন সর্ব্বেশ্বরীর ভয়ে গোপনে মেয়েটিকে লইয়া ইতিহাসের পাঠ দেন, সর্ব্বেশ্বরী তখন স্বামীর ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া নিতাই-এর জন্য থিয়েটারের পোষাক তৈয়ারী করেন। কোনো কোনো দিন সর্ব্বেশ্বরী হঠাৎ স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন—তুমিই মেয়েটাকে মদ্দা করে তুললে! অবিনাশবাবু স্ত্রীর হাতে অর্দ্ধসমাপ্ত রাজার পোষাকটা (গৃহিণী তাড়াতাড়িতে সেটা সঙ্গেই আনিয়াছেন) দেখাইয়া বলেন —ও—ও—ওটা কি! জিহ্বার জড়তার জন্য সামান্য প্রশ্নটা মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের মত শোনায়! আহত গৃহিণী গর্জ্জন করেন—ওগো, তুমিই তো মেয়েকে নাই দিয়ে কি সব সমিতিতে পাঠাও! সেখানে সব ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে মদ্দা! না বাপু, আমাকে কার্ত্তিকপুরে পাঠিয়ে দাও!

অবিনাশবাবু উত্তর দেন—আর তোমার ছেলে যে পাড়ার থিয়েটারের দলে 'মোশন মাষ্টর' হয়ে উঠল! সেখানে কি হয় একবার খোঁজ নিয়ো তো! নাঃ, আগে পেন্‌শন-টা নি। কলহ আরো জমিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পারুল মায়ের হাতের কাছে পানের বাটা-টি খুলিয়া ধরে; গৃহিণী গোটা দুই পান মুখে ফেলিতে ফেলিতে বলেন—তা বেশ, বেশ, একটু পড়াশুনা করা ভাল। একটা পান খা, মা! নিতাই যেদিন উপস্থিত থাকে, সে পিতার হাতের কাছে নস্যির কৌটা-টা সরাইয়া দেয়! অবিনাশ-বাবু এক টিপ নস্যি লইয়া বলেন, ওহে শুধু থিয়েটার করলেই হয় না। ওর আর্ট-টা ষ্টাডি করা দরকার। এই নাও তিনটে টাকা, অমুক বইখানা কিনে পড়োগে। নিতাই টাকা লইয়া গিয়া ভালো দেখিয়া এক জোড়া তিন নম্বরি গোঁফ কিনিয়া লয়, আর পারুল তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়া পানটি ফেলিয়া দেয়। এই রকম করিয়া রায়-পরিবার বিদূষকের অভিনয় করে! আর বিধাতা বোধ করি ছাদের কড়িকাঠের কাছে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে অবিনাশবাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া দেখেন, সর্ব্বেশ্বরী কোথায় নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য গিয়াছেন; পারুলের শরীর অসুস্থ, সে বাড়ীতেই আছে। সন্ধ্যার সময়টা অবিনাশবাবু পারুলকে ইতিহাসের পাঠ দেন, এবং তাহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই বিবাদ বাধে। আজ সর্ব্বেশ্বরী অনুপস্থিত, অবিনাশবাবু নিরঙ্কুশ। পারুলের শরীর অসুস্থ বলিয়া অবিনাশবাবু নিজের পাঠ-কক্ষে আর তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন না, সেখানেই পড়াইতে বসিলেন। সর্ব্বেশ্বরীর আসিতে বিলম্ব আছে, তাঁহার আসিবার আগে উঠিয়া পড়িলেই হইবে।

অবিনাশবাবু অনেক দিন পরে নিশ্চিন্ত হইয়া উত্তর-ইউরোপের শ্লেস্‌বিগ-হলষ্টাইন (Chleswig-Holstein) সমস্যাটা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সমস্যাটা ইউরোপীয় অন্তর্বিবাদের একটি জটিলতম ব্যাপার, সেই জন্যই হউক বা অকস্মাৎ অতর্কিতে মাতার আগমনের আশঙ্কা করিয়াই হউক, পারুল যেন কেমন বারংবার অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল। অবিনাশ-বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কি মা, বুঝতে পারছিস্ না?—পারুল সংক্ষেপে বলিল—না।

—তা বটে! এটা হাজার বছর ধরে' ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের মাথা ঘুলিয়ে এসেছে!

—হুঁ।

—আচ্ছা আর একবার বুঝিয়ে বলি।—অবিনাশবাবু অগাধ পাণ্ডিত্য-সহকারে ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব সরল করিয়া বলিলেন—এবার বুঝতে পেরেছিস্? বল তো দেখি, প্রুশিয়া আর ডেনমার্কের মধ্যে যখন এই নিয়ে বিবাদ চলছিল, তখন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া কেন প্রুশিয়ার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন?

পারুল নীরব হইয়া রহিল।

বল, বল; ভয় কিসের? না পারলে আমি বকবো না।

পারুল নীরব।

বল, ভয় কিসের?

পারুল মৃদুস্বরে বলিল—মা আসতে পারে।

অবিনাশবাবুও ভিতরে ভিতরে আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, একবার ঘড়ি দেখিয়া লইয়া বলিলেন, না, না, তার বিলম্ব আছে। পুনরায় তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

—ওমা, তাই বল, এই জন্যে বুঝি নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় নি! ার তোমারই বা এ কি রকম ব্যাভার?

পিতা-পুত্রী তাকাইয়া দেখেন সর্ব্বেশ্বরী পানের বাটা-হস্তে প্রবেশ রিয়াছেন!

পারুল এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল; অবিনাশবাবুর ইউরোপীয় স্থা জটিলতর হইয়া উঠিল।

—মেয়েটা আজ সারাদিন মাথা ধরে পড়ে আছে, আর তার পরে—

পারুল ক্ষীণ স্বরে বলিল—না, মা, আমার মাথা তো ধরে নি।

তবে বুঝি এই মাথা-মুণ্ডু পড়বার জন্যই নিমন্ত্রণে যাওয়া হয় নি? থা ধরে নি—একশো বার ধরেছে!

অবিনাশবাবু এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন—আহা ধরলই বা, টা এমন কিছু জটিল সমস্যা নয়!

—আমার মুণ্ডু! মেয়েকে কোথায়ও একটু মিশতে দেবে না, বিয়ে বে কি করে গো! নাঃ বাপু, তোমরা এখানে থাকো, আমাকে ও কাত্তিকপুরে পাঠিয়ে!

মেয়েকে আর মিশ্‌তে দিয়ে কাজ নেই! ছেলেটি যেমনি বাউণ্ডুলে য়ে উঠেছে! এত রাত হয়েছে, কোথায় সেটা!

এইবার সর্ব্বেশ্বরীর জটিল সমস্যা! তিনি জানিতেন, নিতাই আজ াড়ায় থিয়েটার করিতে গিয়াছে! হঠাৎ যদি সে এখন আসিয়া পস্থিত হয়! এই তো সেদিন 'জনা' নাটকে প্রবীরের ভূমিকায় ভিনয় করিয়া, সেই সাজেই "মাতঃ মাতঃ দেহ পদধূলি" বলিতে লতে নিতাই বাড়িতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে তখন অবিনাশবাবু পস্থিত ছিলেন না!

সর্ব্বেশ্বরীর মনে এই আশঙ্কা হইলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—আমার নিতাই যে দশ জনের প্রশংসা পায়, সেটাতে তোমার চোখ টাটায়! তা বেশ, বেশ, আমাকে দা৹ বাপু কার্ত্তিকপুরে পাঠিয়ে!

—দশ জনের প্রশংসা! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে একটা আস্ত বাঁদর হ'য়ে উঠল! এত রাত, তবু আসে না কেন?

এমন সময়ে হাতের ছড়িখানিকে অর্দ্ধোত্থিত কুঠারের মত ধরিয়া সুপ্রচুর শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত নিতাই ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—"পিতঃ, পিতঃ দেহ আজ্ঞা, স্বহস্তে বধিব আজি জননীরে মোর।" পাড়ায় আজ সে পরশুরামের ভূমিকা করিয়াছিল—ইহা তাহারই বেশ। তাহার হাতের ছড়ি অর্দ্ধোত্থিত যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, সম্মুখে অবিনাশবাবুকে দেখিয়া সে একেবারে চিত্রাপিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, পিছন ফিরিয়া যে পলাইবে, এমন ক্ষমতাও তাহার হইল না

অবিনাশবাবুও কম বিস্মিত হইলেন না, কেবল বিস্ময়ের কিছু ছিল না সর্ব্বেশ্বরীর। এই তো সেদিন নিতাই প্রবীরের ভূমিকায় মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া অতর্কিত মাতৃভক্তিতে সর্ব্বেশ্বরীকে খুসী করিয়া দিয়াছিল। পুত্রের কৃতিত্বে খুসি হইয়া মাতা অনুযোগ করিয়াছিলেন, মাতৃভক্তির অনুরূপ পিতৃভক্তি তাহার নাই। নিতাই পরশুরামের অভিনয়ান্তে আজ ঠিক করিয়াছিল, পরশুরামের ভূমিকায় মাকে দেখাইবে পিতৃভক্তিও তাহার কম নহে! কিন্তু সে ভক্তি যে স্বয়ং পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এমন তো কল্পনা করে নাই।

নিতাই কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল! এমন অসম্ভব বীররস, হঠাৎ এমন করুণরসে পরিণত আর কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অবিনাশবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—চা-চা-চাষা!

—খোল, দাড়ি, খোল গোঁফ। পিতৃভক্ত পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতাকে পর্য্যন্ত বধ করিতে পারে, নিজের দাড়ি গোঁফ ছেদন আর এমন কি কঠিন!

কিন্তু হায়, দাড়ি-গোঁফ যে 'স্পিরিট-গাম্' দিয়া শক্ত করিয়া আঁটা! নিতাই দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, সে টানে তাহার চোখের জল বাহির হইয়া আসে কিন্তু দাড়ি-গোঁফ নিশ্চল!

—খোল দাড়ি! শীগ্‌গির! তাড়াতাড়ি!

নিতাই আবার সজোরে টান মারে! সর্ব্বেশ্বরী দেখিলেন পুত্রের চোখ ছল ছল করিতেছে। কিন্তু এই বেদনা যে দৈহিক, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, এত মূল্যের দাড়ি-গোঁফ নষ্ট হইতেছে বলিয়াই নিতাই-এর চোখ ছলছল করিতেছে।

সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—একটু ধীরে ধীরে বাবা!

—খোল, শীগগির—

—একটু, ধীরে ধীরে বাবা! ওগো, তুমি একটু থামো না!

—খোল, শীগ্‌গির,

—একটু ধীরে বাবা। দাড়ি-গোঁফের খানিকটা করিয়া তাহার হাতে ছিঁড়িয়া আসিল! হায় রে জীবনের ব্যঙ্গ! এগুলি তাহার বড় সাধের, ততোধিক মূল্যের দাড়িগোঁফ! ইহাদের মাহাত্ম্যেই সে পাড়ার থিয়েটারে পরশুরামের ভূমিকা পাইয়াছিল। আজ তাহা স্বহস্তে টানিয়া ছিঁড়িতে হইতেছে! তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন, কেঁদো না, বাবা, আমি আবার কিনে দেবো! তাহার বিশ্বাস পয়সা নষ্ট হইল বলিয়াই নিতাই-এর দুঃখ। সর্ব্বেশ্বরী লোক, দাড়ি-ছেদনের দুঃখ কি বুঝিবে! নিতাই অন্য ঘরে পলায়ন

করিল। পারুল সময় বুঝিয়া মায়ের কাছে পানের বাটাটি খুলিয়া ধরিল। সর্ব্বেশ্বরী গোটাদুই পান মুখে ফেলিয়া দিয়া পারুলকে একটি দিলেন।—খা, মা, মাথাধরা ছাড়বে, এখন। সর্ব্বেশ্বরী বাহির হইয়া গেলেন, পারুল বাথরুমের দিকে ছুটিল। আজ অবিনাশবাবুর কাছে নস্যির কৌটা খুলিয়া ধরিবার কেহ ছিল না, তিনি গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৫

কলিকাতায় শরতের যেমন সগৌরবে আবির্ভাব, এমন আর কোনো ঋতুর নয়। বসন্তের বিকাশ—ধরাতলে—পৃথিবী এখানে ইঁট-পাথরে সমাচ্ছন্ন। বর্ষা দুই-তরফা, আকাশে ও পৃথিবীতে তার উত্তর প্রত্যুত্তর। কলিকাতায় সে শুধু অর্দ্ধেক। কিন্তু শরৎ কেবল দ্যুলোকের, তাই তার কোনো ঐশ্বর্য্য এখানে গোপন থাকে না।

বিনয় তাহার বারান্দায় বসিয়া দেখে দেবলোকের মধুচক্র সুধার ভারে ভাঙিয়া গিয়া আকাশের কানায় কানায় হিরণ্ময় ধারাতে পূর্ণ করিয়া দিল। আবার কখনো বা বর্ষার বারুদবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে দিগন্তের বিলীয়মান অট্টালিকাগুলির উপরে কোমল ছায়াপাত করিয়াছে, এবং সেই কালো মেঘের পটভূমিতে পায়রার ঝাঁক শাদা শাদা ডানায় ছোট ছোট তরঙ্গ তুলিয়া একদল অদৃশ্য দেবশিশুর নির্ম্মল শুভ্র হাসির মায়া বিস্তার করিতেছে। আবার কখনো বা গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাজপথে ক্লান্ত শকটের অশ্বক্ষুরধ্বনি।

অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলিয়া স্বপ্নপুরীর রাজপুত্রকে কোন রহস্যলোকে লইয়া চলিয়াছে। এমনিভাবে বিনয়ের দিন কাটে।

প্রথম যখন সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তারপরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একটি সূতাকে কেন্দ্র করিয়া মিছরি যেমন দানা বাঁধিয়া উঠে, বহু-আকাঙ্ক্ষিত মানবরসের একটি পরিচয়কে অবলম্বন করিয়া কলিকাতার বিপুল বিপর্য্যয় তেমনি ধীরে ধীরে সুসঙ্গত হইয়া বিনয়ের জীবনে দেখা দিতেছিল। চরচিলমারী হইতে বিদায় লইয়া জীবনের যে-খেই সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ক্রমে পুনরায় সেটি তাহার হস্তগত হইতেছিল। কিন্তু নদীর একপার যেমন কাছে আসে, আর একপার তেমনি দূরে চলিয়া যায়। চরচিলমারী ইতিমধ্যেই তাহার জীবনের সীমান্তে একটি মসীরেখামাত্রে অবসন্ন। অধিক বয়সে এমনটি হয় না—জীবনের ছাঁচ শক্ত হইয়া গেলে পরিবর্ত্তনের অবসর অল্প। কিন্তু যৌবনের ভাঙাগড়ার সময়ে দূর নিকট হইতেছে, নিকট দূরে গিয়া পড়িতেছে! যৌবনজলতরঙ্গে প্রিয়বিচ্ছেদ গভীর দাগ কাটিয়া যায়—কিন্তু তবু সে জলের দাগ বই নয়। বার্দ্ধক্যের হিমে তুষারীভূত জীবনে যে কটি দাগ পড়ে সহজে তাহা দূর হয় না।

প্রথম প্রথম সে কঙ্কণের পত্র নিয়মিত পাইত, নিয়মিত উত্তর দিত। পত্র এখনো নিয়মিত পায়, কিন্তু উত্তরের কোঠায় বড় বড় ফাঁক পড়িয়া যাইতেছে। কোনো কোনো মুহূর্ত্তে কঙ্কণের স্মৃতি তীব্র রশ্মিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু অধিকাংশ অবসর আচ্ছন্ন করিয়া আর একজনের আভাস; কঙ্কণ তাহার চিত্তগগনের এককোণে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র; বাকি সমস্ত আকাশটা ভরিয়া ভাবী আর এক নক্ষত্রলোকের বিস্তৃত নীহারিকাপুঞ্জ।

সে দিন সে কঙ্কণের চিঠি পাইয়াছিল! বর্ষার শেষে চরচিলমারীতে

জোর ভাঙন লাগিয়াছে, লোকে বলিতেছে, এমন ভাবে চলিলে আগামী বছরে চরের চিহ্নও থাকিবে না। পূজা তো আসিল, বিনয় কবে আসিবে! তাহার আসা বিশেষ আবশ্যক! বাদলের কুলগাছে কুল ধরিয়াছে, গাঁদা এখনো ফোটে নাই। বিনয় উত্তর লিখিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে রূপেন ঘরে প্রবেশ করিল।

—নাঃ, শালারাই সাবুলো দেশটাকে; বলিয়াই সে নিকটের আরাম চৌকিটাতে শুইয়া পড়িল।

—দাও তো একটা চুরুট!

রূপেনের প্রবেশ ও প্রস্থান নিখুঁত নাট্যোচিত! বিনয় চুরুটের পাত্র সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন তো ফুটবল শেষ হয়েছে, তবে আবার কি।

—তুমি তো ফুটবল দেখ্‌ছ, এদিকে যে বাঙালীর দফা শেষ!

—হঠাৎ এমন কি হ'ল।

—আর হল! প্রায় শেষ যে! ঐই বলিয়া সে উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। দীর্ঘ চুলগুলি এক একবার তাহার মুখের উপরে আসিয়া পড়ে, সে হাত দিয়া সরাইয়া দেয়।

—বুঝলে বিনয়, পথের এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্যান্ত যাও, একটা বাঙালীর পান সিগারেটের দোকান পাবে না! আমরা আছি কোথায় হে?

পায়চারি করিতে করিতে দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবির কাছে নিস্তব্ধ ভাবে খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন নিজের মনেই বলিল, নাঃ—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

—তারপরে, বুঝলে কিনা হে, গিয়েছিলুম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের

কাছে। তিনি তো দেখেই মারলেন দুই ঘুষি! তারপর বললেন, খা! চেয়ে দেখি বুনসেন বার্ণারে রাঁধা কই মাছের ঝোল! নুনটা কিছু কম হয়েছিল। যাই হোক, আমার কথা শুনে বল্‌লেন, করবি দেশের কাজ? যা উড়িষ্যার বনে, বাসকপাতা চালান দে, বেঙ্গল কেমিক্যালকে দিয়ে কেনাবো। শুন্‌লে হে! আমি চাই পান-বিড়ির দোকান, উনি বলেন বাসকপাতা চালান দে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইল, ভাবটা যেন আত্মশক্তি ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নাই।

—না! হতাম যদি ডিক্টেটার! প্ল্যান আমার প্রস্তুত।—কথার শেষ অংশটায় কণ্ঠস্বর এমনি প্রত্যয়ে পূর্ণ, যে বিনয় তাহা অবিশ্বাস করিতে পারিল না!

এমন সময় ঝড়ের মত পরমেশ ঘরে ঢুকিল। তাহার কপাল বহিয়া ঝরঝর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, মুখ-চোখ রৌদ্রে লাল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল,—বাস্ বাস্ হয়ে গিয়েছে, হিমালয় পর্ব্বত আর থাকবে না! মস্কো টু দিল্লী, দিল্লী টু মস্কো!

রূপেন অকালে বাধা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল,—দেখো পরমেশ, কাজের সময় গোল করো না!

—ওঃ, তোমার আবার কাজ! সেই পান-বিড়ির দোকান তো!

ইহাদের কার্য্য-তালিকা পরস্পরের নিকট অত্যন্ত পরিচিত! কেবল রমানাথের ভাবখানা সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব!

অফিসের দুইটা-তিনটায় টিফিনের ফাঁকে সে একবার করিয়া দেখা দিয়া যায়। আজো সে নিয়মিত সময়ে প্রবেশ করিল! বাহির হইতেই কথোপকথনের কিছু আভাস পাইয়াছিল—কাজেই ভূমিকার প্রয়োজন তাহার ছিল না।

সে অত্যন্ত সন্তর্পণে পকেট হইতে একটুখানি সুপুরি, লবঙ্গ বাহির করিয়া মুখে পূরিয়া বলিল—ওসব এখন রাখো। কোথায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় বল্‌তে পারো? দাম আমি বেশী দিতে রাজি আছি কিন্তু জিনিষটি খাঁটি চাই।

রূপেন-পরমেশের পরহিতৈষিতা রমানাথের আগমনেই যথেষ্ট শীতল হইয়া গিয়াছিল, তার উপরে একেবারে নির্জ্জলা দুধ! উভয়ে মন-মরা হইয়া বসিয়া রহিল। রমানাথ নিজের জয় লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধগুপ্ত একটি হাসি নিক্ষেপ করিল। রমানাথের সেই হাসি!

—বিনয়, তোমার ও চিঠিখানা কার হে! মেয়েলি ছাঁদের লেখা! ওঃ এ বুঝি সেই চরচিলমারী! খুব চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যাহোক!

এতক্ষণে রূপেন পুনরায় একটা বক্তব্যের সুযোগ পাইল।—মাইরি বিনয়, তোমার কাহিনীটা যেন রূপকথার রাজ্যের; মনে মনে আমিও যেন তাকে দেখছি!

রমানাথ বলিল—সেটা মনেই যেন থাকে! পরমেশের মন তখন দিল্লী-টু-রাশিয়া; কাজেই নিকটের কথাবার্ত্তা বুঝিতে একটু সময় লাগিবার কথা! এইবার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—বেবি, বেবি—

—বেবি নয় হে, বল বাবা! বাবা! তার বাবাকে না ধরলে কিচ্ছু হবে না!

রূপেন—ধরলেও কিছু হবে কি না জানি নে!

বিনয় বলিল—পরমেশবাবু, আপনি তো একজন কম্যুনিষ্ট, আর বেবির বাপও কম্যুনিষ্ট, একবার চেষ্টা করুন না!

পরমেশ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। রমানাথ বলিল, এত শীগ্‌গির নয় হে, বিশেষ এরকম বেশে গেলে তো বুঝতেই পারছ?

পরমেশ ততক্ষণ দরজার চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে; সহসা সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতে চৌকাঠ ধরিয়া বাঁ হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—পৃথিবীর এত ঐশ্বর্য্য নেই যে সকলেই রাজার হালে থাকতে পারে! একজন ধনী হলেই আর একজনকে দরিদ্র হ'তে হবে; সবাই মোটা খেয়ে পরে থাকতে পারে, একটুকুমাত্র সম্ভব!—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তার অন্তর্দ্ধান। রমানাথ বলিয়া উঠিল—বাঃ বেশ বলেছে, ছাপার ভুল ছাড়া অন্য কোন ভুল নেই!

রূপেন পুনরায় চরের কাহিনী আরম্ভ করিল। রূপেনকে প্রেমের ব্যাখ্যায় উত্তেজিত হইতে দেখিয়া রমানাথ বলিল—ওহে আমার একটা টিনের টব আছে, সেটা গিয়েছে ফুটো হ'য়ে, কি করে' সারাই বল তো!

—দুৎ, তোমার টব! কেবল এসেছিল একটা ইন্স্পিরেশন, এমন সময়ে টব্। চল্লাম হে বিনয়!—রূপেন উঠিয়া আরশির সম্মুখে গিয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল!

এমন জমকালো সভাটাকে এমন অনায়াসে ভাঙিয়া দিয়া গর্ব্বের হাসিতে রমানাথের মুখ ভরিয়া গেল! বিনয়ের ঘরে প্রায়ই এমন কাণ্ড হয়, কাজেই এসব তাহার এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছিল।

—আজ সন্ধ্যা বেলা যাচ্ছ' তো অবিনাশবাবুর বাড়ি! সেখানে দেখা হবে আবার, কি বল!—রমানাথ প্রস্থান করিল।

বিনয় বিকালে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। পথটা ট্রাম বাসে বন্ধ থাকায় একপাশে সে খানিকটা দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ নিকটে গোলমালে সে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করিল। আবর্জ্জনা ফেলিবার একটা 'ডাষ্টবিন'এর কাছে দুইটা ভিখারীতে গোল বাধিয়াছে। দুটা লোকেরই পরিচ্ছদ অতি জীর্ণ! ময়লা ছেঁড়া কোর্ত্তা, আস্তিন দু'টা বহুধা ছিঁড়িয়া বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহানার মত বহু খণ্ড

হইয়া গিয়াছে। মাথায় জটা; গলায় এক গোছা কাঠের মালা, পিঠে কাপড়-চোপড়ের ঝুলি; হাতে একটা করিয়া টিনের পাত্র! লোক দুটার মধ্যে কলহের উপক্রম। বিনয় কৌতূহলী হইয়া কাছে গেল। একজন বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন তো বাবু, বেটার কি আস্পর্দ্ধা! এই কুণ্ডা আমার বাঁধা! ও শালা, এখানে আসে কেন!

ব্যাপারখানা প্রথমে বিনয় বুঝিতে পারে নাই, শেষে যাহা বুঝিল তাহা এই! প্রত্যেক ভিখারীর একটা করিয়া 'ডাষ্টবিন' নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব তাহার। অন্যে তাহার ভাগ পায় না। ইহা ব্যবসায়ের সততা! আজ তাহার জমিদারীতে অন্য একজন আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণের কারণ, দুপুর বেলা প্রেসিডেন্সি কলেজের বার্ষিক উদ্বোধন সভা হইয়া গিয়াছে। শহরের গণ্যমান্য সমাজের চূড়ায় অধিষ্ঠিত মহোদয়গণ প্রীতিভোজনান্তে যেসব খাদ্য পাত্রে ফেলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পাত্রটায় নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, এই ব্যক্তির জমিদারী পার্শ্ববর্ত্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু বিনয় ইহার কি মীমাংসা করিবে! কুণ্ডার মালিক মীমাংসার ভার নিজের হাতেই লইল। সে তাহার যষ্টিখানি উঠাইয়া আততায়ীকে তাড়িয়া গেল—তবে রে শালা—তোর—

নৈতিক শক্তি অত্যন্ত বলবান, কিন্তু তাহার সহিত লাঠি থাকিলে উহা একেবারে অব্যর্থ। আততায়ী পলায়ন করিল। বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লোকটা গর্ব্বের হাসি হাসিল।—দেখলে বাবু, পরের জিনিষে শালার লোভ!

এই বলিয়া সে ভাঙা সরা হইতে খাদ্যদ্রব্যের ভুক্তাংশ বাছিয়া একত্র করিতে লাগিল। শিঙাড়া, মালপো, লুচি, কেক, সন্দেশ, প্রভৃতির ভগ্নাংশে পূর্ণ এক স্তূপ হইল।

—হাজার হোক বাবু, বড় লোকের ব্যাপার, অনেক ফেলেছে; বড় লোকের বড় মন। ক্ষিদেও কম, ব্যায়রাম তো লেগেই আছে! তাতেই তো আমরা বাঁচি। ওই শালাকে দিলে কি ফেল্‌ত কিছু! সরাখানাসুদ্ধ গিল্‌তো!

এমন সময় একটি শীর্ণ কুকুর আসিল। বিনয় লোকটির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কুকুরটিকে তাড়াইতে গেল। লোকটি বাধা দিয়া বলিল—

—না, না, ওটাও আমার শরীক। ওটাও এই কুণ্ডার মালিক।

খাদ্যের স্তূপ হইতে এক দিকে কুকুরটি খাইতে লাগিল, অন্য-দিকে লোকটি!

—আবার মজা কি বাবু, জানো, মানুষের চেয়ে কুকুর ভালো! দেখলে সত্যি কিনা? এই বলিয়া সে এক মুঠা খাদ্য দূরে নিক্ষেপ করিল, কুকুরটা ছুটিয়া গিয়া তাহা খাইতেছে, এই অবসরে লোকটি ভালো ভালো সন্দেশ ও কেকের টুকরা মুখে ফেলিয়া দিল!

—দেখলে বাবু, কেমন ফাঁকি দিয়ে ভাল জিনিষগুলো খেলাম! মানুষ হ'লে পারতাম!

কুকুরটা বোধ হয় চালাকি বুঝিতে পারিল; লোকটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া শুভ্র উজ্জ্বল দাঁত বাহির করিয়া খাদ্যস্তূপের দিকে ধাইয়া আসিল। লোকটিও ততোধিক হিংস্রদন্ত বাহির করিয়া তাহাকে মুখভঙ্গি করিল।—শালাও শিখে উঠছে!

বিনয় আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল। জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া তাহার কর্ণে কেবল প্রবেশ করিতে লাগিল সান্ধ্য-সংবাদপত্র বিক্রেতাদের তারস্বর—

—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রীতি-সম্মেলন—এক পয়সা।

—বাংলা দেশে শিক্ষার যুগান্তর—

—বাঙালী জাতির উদ্বোধন—এক পয়সা।

সমাজ, সাহিত্য-শিক্ষায় নবযুগ—

—পদদলিত, বুভুক্ষু জাতির সমস্যা সমাধান—

—কৃষ্টি, বিজ্ঞান, আর্থিক-নবযুগ—এক পয়সা।

হকার বালকদের তীব্রকণ্ঠের এক পয়সা! এক পয়সা! বিনয়ের কেন যেন হঠাৎ মনে হইল এক এক পয়সা মূল্য কিসের, ওই কাগজখানার, না এই সব তালিকাবদ্ধ উন্নতির!

৬

বিনয় তিনচার মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। পূজার আগে যখন সে দেশে যাইবে বলিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত, তখন জয়পুর হইতে মহীন্দ্রের এক তার। তাহার বিশেষ অসুখ, বিনয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। আকস্মিকতার আর এক আহ্বান! বিনয় জয়পুরে যাত্রা করিল। মহীন্দ্রের অসুখ সারিতে অনেক দিন গেল, তারপর কিছুদিন সে উত্তরভারতের নানাস্থান দেখিয়া বেড়াইল। এমনি ভাবে তিনচার মাস অতিক্রম করিয়া বড়দিনের পর সে কলিকাতায় ফিরিল।

এই কয়মাসে সে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। যে-অলক্ষ্য জ্যোতিষ্কের টানে তাহার ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, তাহা চিরপরিচিত পৌর্ণমাসীর চন্দ্র নহে। অতি-অসীম চিত্ত-গগনের

কোন্ কোণে সে আজ অদৃশ্য, কিন্তু হৃৎ-সাগরের এই দুরন্ত জোয়ার এ তো মিথ্যা নহে। একদিন যে গৃহ-দেবতা এই জোয়ারের অধিষ্ঠাত্রী ছিল, তাহার স্থান আজ যে অপরে দখল করিয়াছে, সহসা ইহা বিশ্বাস হয় না। ইহাই জীবনের অষ্টমাশ্চর্য্য! একজনের প্রতি ভালবাসা কেমন করিয়া অতি-অগোচরে অতি-সন্তর্পণে মিলাইয়া গিয়া আর একজন প্রিয়তমের কিরূপে উদয় হয়, এ পরিবর্ত্তন সহসা বোঝা যায় না, কারণ ভালবাসা অবিচলিত থাকে, কেবল নিঃশব্দে ভালবাসার পাত্রের বদল হইতে থাকে। প্রেমে ছেদ পড়িলে মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, কিন্তু এই অতি ধীর পরিবর্ত্তনে বিচ্ছেদ তো কোথায়ও নাই। তারপরে একদিন চোখে পড়ে, পুরাতন পাদপীঠে নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা! ভূতপূর্ব্ব প্রণয়ীর প্রতি অবশ্যই একটা টান থাকে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের টান। আগুন নিভিয়া গেলে, পড়িয়া থাকে তার ভস্ম। প্রেম সেই আগুন, কর্ত্তব্য সেই ভস্মাবশেষ।

বিনয় যে কঙ্কণকে ভুলিয়াছে, একথা সত্য নহে, কিন্তু আজ তার প্রতি যে টান তাহা কর্ত্তব্যের। সে টানে আগ্রহ আছে, কিন্তু মোহ নাই। মোহহীন প্রেম যদি কোথায়ও থাকে থাকুক, স্বর্গে এবং তন্ত্রে; বিধাতা, তুমি মানুষকে এমন অপূর্ব্ব স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিও না।

বিনয় সেদিন দুপুর বেলা অবিনাশবাবুর বাড়িতে গেল। রমানাথ দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া পারুলকে আগ্রহভরে ডাকিয়া লইয়া তাহার করকোষ্ঠি বিচারে বসিয়া গেল। বিনয় ঘরে ঢুকিয়া দেখিল দুইজনে নিভৃতে পরস্পর হাত ধরিয়া কি করিতেছে! তাহার মুখ গম্ভীর হইল, রমানাথ এমন সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহে। সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আর কিছু নয় বিনয়বাবু, এর হাতখানা দেখ্‌ছিলুম।

—বেশ তো।

—এ বিষয়ে আপনার আগ্রহের অভাব তো আগে দেখিনি।

—হাঁ।

পারুল বলিল, বিনয়বাবু. বসুন।

—আচ্ছা, থাক্।

—দেখুন, দেখুন, বিনেয়বাবু, এঁর ভিনাসের স্থানটা লক্ষ্য করবেন্; আপনাকে তো একটু শিখিয়েছিলাম।

—হাঁ দেখ্‌ছি!

—আর মজা দেখেছেন, এই হার্ট-লাইনের কাটাকুটি। অনেকগুলো, তাই না!

—হ'তে পারে!

—ও! বিনয়বাবুর মন বুঝি খারাপ! আপনার সেই চরের, সেই কি চর যেন, সেখানকার সেই তিনি—

—আ! চুপ করুন!

—তা বটে, এত লোকের সম্মুখে, তা বটে। অনেক দিন পরে ফিরলেন, এতদিন বুঝি সেই চরেই বিচরণ করছিলেন!

—না।

—আচ্ছা থাক্, ওসব পরে শুনবো।—রমানাথ পারুলের হাতখানা এত জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল যে তাহা রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল। বিনয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা তাহ'লে উঠি!

রমানাথ একটি চাপা হাসি গোপন করিয়া বলিল—বেশতো। একটু নিরিবিলি না হ'লে আবার হাত দেখা চলে না। কিন্তু পারুলের ধৈর্য্য আর রহিল না, সে বলিল—বসুন বিনয়বাবু, চা খেয়ে যাবেন।

এই বলিয়া সে উঠিয়া প্রস্থান করিল। এইবার রমানাথের অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিবার সুযোগ।

—বিনয়বাবু—ওঁর হাত দেখাতে আপনি কিছু মনে করেছেন ?

—জানি না।

—কিন্তু উনি কিছু মনে করেন নি।

—অনেকক্ষণ ধরে' হাত দেখছিলেন বুঝি ?

—কি আশ্চর্য্য, ঠিক ধরেছেন, কিন্তু কি করে বুঝলেন ?

—হাত যে লাল হয়ে উঠেছিল !

—ও ! তা-ও চোখ এড়ায়নি ? আচ্ছা চোখ করেছিলেন বটে !

—তা'তে আর লাভ হ'ল কি !

—কিছু মনে করবেন না বিনয়বাবু, মেয়েদের হাত দেখতে কিছু বেশি সময় লাগে।

ধীরে ধীরে বিনয়ের স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া আসিতেছিল ; সে বলিল—সেই লোভেই বুঝি হাত দেখা শিখেছেন ?

—শিখতে আর পারলুম কই !

—দেখবেন, রমানাথবাবু, ভাল করে' শিখে ফেলবেন না। ভাল না জানলেই সময় বেশি লাগা স্বাভাবিক।

—তাহ'লে আপনার তো আরো বেশি সময় লাগবার কথা, বিনয়বাবু।

—আমি অপরিচিত মহিলার—

—ওঃ অপরিচিতার হাত আপনি দেখেন না, কিন্তু সেই কঙ্কণের—

—চুপ করুন।

এমন সময়ে উভয়ের চায়ের টেবিলে ডাক পড়িল।

সন্ধ্যা-বেলা বিনয় বাড়ি ফিরিবে, এমন সময়ে পারুল তাহাকে বলিল,—বিনয়বাবু, একটু অপেক্ষা করে' যাবেন। এই বলিয়া সে বিনয়কে লইয়া গিয়া ছাদের উপর বসাইল, বলিল—একটু বসুন, আমি আসছি। বিনয় একা বসিয়া রহিল।

শীতের রাত্রি, আকাশে চাঁদ, গলিতে কোলাহল নাই, শুভ্র জ্যোৎস্না ঝাঁকিয়া আসিয়া ছাদের এক প্রান্তে পড়িয়াছে, আলিসার উপর সারি সারি টবে ফুলের গাছ। একা বিনয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পারুলের অনুপস্থিতির এই ফাঁকটা কল্পনার মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। পারুল কেন তাহাকে একাকী ডাকিয়া আনিল!

এমন সময়ে পারুল ফিরিয়া আসিল।

—আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম।

—তাতে কি হয়েছে!

—আজ দুপুরবেলা রমানাথবাবু আপনাকে বড় বিরক্ত করেছেন।

—না, না, এমন কিছু নয়। হঠাৎ রমানাথের প্রতি অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতায় বিনয়ের মন ভরিয়া উঠিল। সে আজ বিরক্ত করিয়াছিল বলিয়াই তো এমন সুযোগ মিলিল।

পারুলকে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইতে দেখিয়া বিনয় আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। দুইজনে নীরব। পারুল কি ভাবিতেছিল জানি না—বিনয় পারুলকে লক্ষ্য করিতেছিল।

সে স্নান করিয়া কাঁঠালী রঙের গরদের একখানি শাড়ি পরিয়াছে, লাল তার পাড়। ব্লাউজের গলার কাছের ফাঁক দিয়া সোনার হারটি মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। হাত-কাটা জামার ভিতর হইতে অলৌকিকস্পর্শ কল্পনা-সর্ব্বস্ব সুগোল নিটোল স্নিগ্ধ দু'খানা বাহু নামিয়া পড়িয়া মণিবন্ধে সূক্ষ্ম খানকয়েক চুড়িতে অলঙ্কৃত

হইয়া পাঁচটি কোমল আঙুলে ও দু'খানা তপ্ত রক্ত-করপদ্মে শেষ হইয়া গিয়াছে। কানে দুইটি দুল, মনের সংবাদ সর্ব্বাগ্রে যাহাদের কাছে পৌঁছিতেই নানা তালে তাহারা দুলিয়া উঠে। শ্বেতচন্দন চোখে পড়ে না এমন বর্ণ যে ললাটের, তাহার মাঝখানে একটি ছোট সিঁদুরের টিপ। স্নিগ্ধ দীর্ঘ কেশপাশ আলগোছে জড়ানো, তাহাতে একটি ঘোর রক্তবর্ণ গোলাপ ফুলের কুঁড়ি। আর সে কি কণ্ঠ, বিদ্যুতের বঙ্কিমতা, মৃণালের সরসতা, রজনীগন্ধার শুভ্র স্বচ্ছ অ-করস্পৃশ্যতায় মিশ্রিত।

তাহার ক্ষুদ্র পা দু'খানি দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু বিনয়ের মনে হইল, পা দু'টি বেড়িয়া নিশ্চয়ই আলতার একটি করিয়া বেষ্টন আছে; এমন পায়ে আলতা না থাকিয়া পারে না!

—আপনি তো পশ্চিমে গিয়েছিলেন, চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখেছেন?

—সে সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু সে জন্য আর দুঃখ নেই।

—কেন?

—আজ যা দেখ্‌লাম, চাঁদের আলোয় তাজ তার চেয়ে আর কত সুন্দর হবে!

পারুল কোনো বাধা দিল না, কিন্তু বিনয় নিশ্চয় বুঝিল, এই কথায় পারুল দুঃখিত কিম্বা লজ্জিত হয় নাই।

আবার দুইজনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ মনের কথা বাক্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল না। জীবনে মাঝে মাঝে এমন দৈব মুহূর্ত্ত আসে যখন ভাষার সাহায্য ছাড়াও মানুষ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পারুল-বিনয়ের আজ সেই রকম একটি চরম লগ্ন।

পারুল একটু সোজাভাবে দাঁড়াইয়া হাত দু'টি ললিতভাবে বাঁকাইয়া

খোঁপার গোলাপ-কুঁড়িটি খুলিয়া লইল। বিনয়ের মনে হইল যুগল বাহুর সেই আন্দোলনটি একগাছা অদৃশ্য পুষ্পমালার মত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে দেবলোকের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

বিনয় ভাবিয়াছিল ফুলটি পারুল তাহাকে দিবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না।

পারুল বলিল—চলুন নীচে যাওয়া যাক, রাত অনেক হয়েছে। অকস্মাৎ স্বপ্ন-ভঙ্গের মত বিনয়ের খচ্ করিয়া একটা ব্যথা লাগিল। সে সাহস করিয়া ফুলের কুঁড়িটি চাহিতে পারিল না।

বিনয় যখন বাড়ি ফিরিতে উদ্যত, দরজায় যখন অনেক লোক, পারুল তখন সকলের চোখ এড়াইয়া অত্যন্ত কৌশলে বহুবাঞ্ছিত সেই কুঁড়িটি বিনয়ের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। উপরি-পাওনার মধ্যে সকলের চোখ-এড়ানো সেই রহস্যময় সলজ্জ গোপনীয়তাটি!

বিনয়ের সে রাত্রে ঘুম হইল না। একটি তপ্ত আবেশে রাত কাটিয়া গেল—ভোরের আলো দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। সে কলেজে গেল না, স্নানাহার কেমন যেন স্বপ্নের মধ্যে করিয়া ফেলিল। নিস্তব্ধ দুপুরে বারান্দায় বসিয়া শীতের রৌদ্রে আকাশ ভরিয়া আকাশ-কুসুম ফুটাইয়া কাটাইয়া দিল। এমন কি সন্ধ্যাবেলা অবিনাশবাবুর বাড়িতেও যাওয়া স্থগিত থাকিল। সত্য কথা বলিতে কি, সেখানে যাইতে তাহার সাহসের অভাব। যে-অলৌকিক রসাবেশ তাহার

মনে তাহার ধর্ম্মই যে ক্ষণভঙ্গুরতা, কি জানি আজ যদি কোন আঘাতে তাহা ভাঙিয়া পড়ে!

বন্ধু-বান্ধবকে সে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে বারংবার মনে মনে জপমালার মত আবর্ত্তন করিতে থাকে। প্রথম মোহ কাটিলে সে বুঝিতে পারিল, এই অভিজ্ঞতার মূলে একটা অপূর্ব্ব অধিকারের স্বাদ সে যে একটা পুরা মানুষ, তাহার যে কিছু আছে, তাহার দায়িত্ব কত বিরাট, তাহার চিন্তার কারণ কত অসামান্য! যাহা সে পাইয়াছে, কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করিবে, কি ভাবে তাহার সুখ সাধন করিবে, ইহাই ভাবিয়া তাহার দিন যায়, রাত্রি কাটে।

পারুল তাহার, জগতের আর সকলের হইতে বিশেষ ভাবে পৃথক ভাবে কেবল তাহারই।

পুরুষের সম্বন্ধে নারীর এই ভাবটা তাহার আদিম সংস্কারের সহিত জড়িত। আদিম মানুষ বুকের হাড় ভাঙিয়া নারীকে গড়িয়াছিল; নারী তাহার প্রাণের বস্তু। প্রাণের, কিন্তু, বস্তু! বিধাতা নিজের ভাবে মানুষ গড়িয়াছেন, মানুষ নিজের অভাবে নারীকে গড়িয়াছে। সে বিশেষভাবে পুরুষের। সেইজন্যই সে পুরুষের প্রিয়, কিন্তু পুরুষের সমান নয়। সত্য কথা বলিতে কি নারীতে বস্তুগত অধিকারের ভাব পৌরুষের একটা অঙ্গ। সেই অধিকারের অপূর্ব্ব স্বাদে বিনয় উন্মাদ। এই অদ্ভুত অধিকারের প্রেরণায় সে নিজের মূল্যবান বস্তুগুলি বারংবার যত্নের সহিত দেখিতে লাগিল। সোনার ঘড়িটি, কাশ্মীরি শালখানি, মরক্কো-বাঁধানো পুস্তকের শ্রেণী, দামী ফাউণ্টেন পেনটি। কিন্তু এইতো সব নয়, তাহার আরো কিছু আছে, আরো কিছু, সবচেয়ে মূল্যবান!

কিছুদিন এমন ভাবে যায়। হঠাৎ সে একদিন অবিনাশবাবুর বাড়ি গেল। দুপুর বেলা; ভয় ছিল পাছে পারুলের সঙ্গে দেখা হয়, পারুল বাড়ি নাই; অবিনাশবাবু কলেজে; সর্ব্বেশ্বরী একাকী বঙ্কিম-বাবুর গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলেন। বিনয়কে দেখিয়া তিনি আদর করিয়া বসাইলেন। বিনয় কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফেলিল; পারুলকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইল। সর্ব্বেশ্বরী চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে তাহার দিকে তাকাইলেন; বিনয়ের ভয় হইল, বোধ হয় কাজটা ভাল হয় নাই। সর্ব্বেশ্বরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—একটু বোস বাবা, দুটো পান এনে দি। সর্ব্বেশ্বরী উঠিয়া গেলেন—বিনয় বুঝিল প্রস্তাব মঞ্জুর। বিনয় পান খাইয়া বাড়ী ফিরিল; সর্ব্বেশ্বরী স্বামীর আগমন অপেক্ষায় কেবলি ঘর-বাহির করিয়া এক বাটা পান নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

সন্ধ্যাবেলা গৃহিণী স্বয়ং পারুলকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। একটি পান সাজিয়া পারুলকে দিতে গিয়া কি জানি কি ভাবিয়া সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—থাক কাজ নেই, তোর আবার পান খেলে সয় না। কিন্তু আজ সকলের অভ্যাসেরই ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। পারুল নিজেই একটা পান সাজিয়া খাইল। অবিনাশবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—নিতাইয়ের যখন থিয়েটারের সখ, ওকে দু'একটা ভাল জরির জামা কিনে দিয়ো। নিতাই আসিয়া পিতাকে ধরিল,—বাবা, আমাকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করে' দাও।

পারুলের কি হইল জানি না, কিন্তু সে সারা রাত্রি তোরঙ্গের

কাপড়-চোপড় গুছাইয়া কাটাইয়া দিল। একবার অনেক রাত্রে উঠিয়া গোলাপ গাছগুলিতে জল সেচন করিল, অবশেষে শেষ রাত্রে মম্‌সেন রচিত রোমের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, অমরামতীতুল্য রোম, বিশাল রঙ্গক্ষেত্র, বিরাট প্রেক্ষাগারে দর্শকের আসনশ্রেণী ধাপে ধাপে উত্থিত, মাঝে শ্বেত-পাথরের কারুশোভী সম্রাটের আসন, লরেল-কিরীট স্বয়ং সম্রাট, উদ্‌গ্রীব দর্শকবৃন্দ, সম্মুখে রথের প্রতিযোগিতা! সম্রাটের সঙ্কেত-সম্মতিতে সমগ্র রঙ্গক্ষেত্র সজীব হইয়া উঠিল। রথ ছুটিতেছে; স্বর্ণাভ চাকার আবর্ত্তনে সূর্য্যকিরণ মন্থিত করিয়া, উৎকর্ণ অশ্বের কেশর নিষ্কম্প করিয়া, রথীর আলম্বিত কশাঘাতে বিদ্যুত বর্ষণ করিয়া, শতাশ্বক্ষুরে প্রেক্ষাপ্রাকার শব্দিত করিয়া, রথ ছুটিতেছে। সমস্ত মিলিয়া বর্ণের, শব্দের, গতির একটা ঝঞ্ঝা। এক মুহূর্ত্ত পরে, বিক্ষত রঙ্গভূমি, বিচ্যুত রথচক্র, বিদীর্ণ রথাঙ্গ, বিস্তৃত রঙ্গক্ষেত্র আহতে-নিহতে, দ্বন্দ্বীপ্রতিদ্বন্দ্বীতে একাকার। জয়োল্লাস ও মৃত্যুবিলাপ পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সন্তুষ্ট জনতা, সন্তপ্ত সম্রাট।

সংবাদ শুনিয়া সকলেই খুসী হইল। বন্ধু-বান্ধবেরা ভোজের ভাগ অগ্রিম পাইল। বেবি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল; সে আসিয়া পারুলের ঘরে আরাম-চেয়ারখানার উপরে তনুদেহলতা এলায়িত করিয়া দিয়া সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠ ধনুকের মত বাঁকাইয়া বলিল—কন্‌গ্র্যাচু-লেশনস্‌ মিসেস্‌ চৌধুরী! পারুল বুঝিল এইবার তাহার অগ্নিপরীক্ষা সুরু। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি বিক্ষেপ করিয়া বেবি বলিতে লাগিল—'দাউ টু ব্রুটাস্‌, তবে আর কেন, থ্রী-এস্‌এর মেম্বারশিপ ছেড়ে দাও, এখন তো তুমি বাপ্‌মায়ের ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ্‌!'

থ্রী-এস্‌ ব্যাপারটা কি একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। সেল্‌ফ-

সিলেক্‌শন সোসাইটি নাম দিয়া কতিপয় আধুনিকতাগ্রস্ত মিস্ একটি সভা করিয়াছেন। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ইহার সভ্যেরা নিজেদের স্বামী-নির্ব্বাচনের ভার পিতামাতার উপর না রাখিয়া নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। এই সভাটাকে সংক্ষেপে বলা হয় থ্রী-এস্।

পারুল বলিল, কেন ভাই, পরমেশবাবুও তো তোকে—

আরাম-চেয়ারখানার হাতলির উপর একটি ক্ষুদ্র আঘাত করিয়া বেবি বলিল—ইনডীড্, আই মাষ্ট্ হ্যাব্ সম্বডি! কিন্তু সে যদি আমার ফাদারের কাছে প্রস্তাব করতে যায়, তবে তাকে,—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নিকটের ফুলের তোড়া হইতে গোলাপের একটা কুঁড়ি লইয়া সেটা টোকা মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—আই শ্যাল নক্ হিম আউট! যাক, আশা করি তুমি থ্রী-এস্এর মেম্বারশিপ ছেড়ে দিচ্ছ! বেবি উঠিয়া পড়িল, দরজা পর্য্যন্ত গিয়া একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ মিসেস্ চৌধুরী!

বেবি চলিয়া গেলে পারুল বিনয়ের প্রস্তাব-ব্যাপারটাকে যেন নূতন ভাবে দেখিতে পাইল। বিনয়কে সে ভালবাসে সত্য; বিবাহ করিতেও সম্মত। কিন্তু বিনয় কেন ও প্রস্তাব তাহাকে না করিয়া মায়ের কাছে করিল! তবে বুঝি বিনয় তাহাকে অপমান করিয়াছে; আর সত্যই তো সে তাহার সঙ্গিনীদের নিকট আজ অপমানিত হইল। বেবি যাহা বলিয়া গেল, তাহা মিথ্যাও নহে, তাহার একলার কথাও নহে।

ক্রমে বিনয়ের উপর তাহার রাগ, একটা বিতৃষ্ণার মত জমিয়া উঠিতে লাগিল। ভালবাসার বিপরীত দিকে না-ভালবাসা নহে—একটা তীব্র বিদ্বেষ। প্রেমের মন্ত্রে যেখানে সিংহদ্বার খুলিল না, শত্রুতার গোলাগুলিবর্ষণে দুর্গপ্রাকার সেখানে ভগ্ন হইবে। বন্ধুরূপে

হউক, শত্রুরূপে হউক, দুর্গে তাহাকে প্রবেশ করিতে না দিয়া উপায় নাই।

বিনয় আসিলে সে আর দেখা করে না, সরিয়া সরিয়া থাকে। মা ভাবেন লজ্জায়, বিনয় ভাবে রোমান্টিকতার অবকাশে কল্পনায় তুলি চালাইবার এই তো সুযোগ। পারুল ভাবে, বিনয়কে দেখিয়া লইব, আমি যে বাপ্‌মায়ের ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ নই, আমি যে স্বতন্ত্র সত্তা, একটি অখণ্ড নারী, বিনয়কে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। তাহার জন্মের সংস্কার বলে—এ তো ঠিক হইয়াছে, এই তো স্বাভাবিক। তাহার নবজাগ্রত আধুনিকতার বুদ্ধি ও শিক্ষা বলে—ভুল, ভুল, পারুল তুমি যে-সে নও, তুমি ইজাডোরা ডানক্যান্, প্যাবলোবা, ক্লিওপেট্রার সহোদরা! বিনয়কে ইহার প্রতিশোধ দেওয়া চাই।

৮

সদাশঙ্করবাবু একজন নামজাদা কম্যুনিষ্ট। শহরের লোক তাঁহাকে একডাকে চেনে। কলিকাতায় তিনখানি বাড়ি, দেশে প্রকাণ্ড জমিদারি, দুটি লোহার কারখানা, ব্যাঙ্কে নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ এবং একটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা, ফলতঃ একজন বনেদী কম্যুনিষ্টের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাঁহার কোনটারই অভাব ছিল না। দেশের ধন-সাম্যবাদীদের অর্থাৎ যাহাদের ধনে ভাগ ঘটিলে ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই, তাহাদের একমাত্র ভরসা তিনি। ইন্দ্রধনুর দুইপ্রান্ত যেমন দুটি বল্মীকাগ্রের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকে, সকলের বিশ্বাস, কম্যুনিজমের তোরণ তেমনি দুটি লোকের উপর ভর দিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার এক প্রান্তে মস্কোর লেনিন, অপর প্রান্তে, এই আমাদের ঘরের কাছের বালিগঞ্জের সদাশঙ্করবাবু।

বালিগঞ্জের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িতে তিনি থাকেন। বাড়ির হাতার মধ্যে এক দরজা দিয়া মোটরের প্রবেশ, অন্য দরজায় প্রস্থান ; সম্মুখেই মোটর ঘুরিবার জন্য কাঁকরখচিত অর্দ্ধবৃত্তাকার একটি পথের অর্দ্ধচন্দ্র। শ্বেত-পাথরের সোপান বাহিয়া বারান্দায় উঠিলে বিরাট মৃন্ময় নাক-চ্যাপটা একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি ; লোকে বলে মূর্ত্তিটির কাঁচা অবস্থায় সদাশঙ্করবাবুর ছোট ছেলে গুল্‌তি বানাইবার জন্য নাসিকাগ্রভাগ হরণ করাতে, নাকের এই দুর্দ্দশা। তিনি বলেন—উহা নেপালের রাজকারিগরের তৈরী, সেইজন্য নেপালী শিল্পের আদর্শে নাকটি কল্পিত। মূর্ত্তিটির সম্মুখে একটি টেবিলের উপরে কোয়েটা হইতে আনীত লতাপাতা-আঁকা পিতলের একটি প্রকাণ্ড পাত্র—শূন্য ! আজকালকার অধিকাংশ ধনীর বাড়ীর সম্মুখে এইরূপ একটি অর্দ্ধচন্দ্র (মোটরের পথ) ও শূন্য পাত্র দৃষ্ট হয়।

বারান্দা পার হইয়া প্রকাণ্ড হল। তাহার চার দেয়ালে চারখানি ছবি, গান্ধী, মুসোলিনি, লেনিন, হিট্‌লার। একেবারে আঁট-ঘাট বাঁধিয়া সদাশঙ্করবাবু বসিয়া আছেন, কোন দিক দিয়া ব্যূহ ভেদ করিবার উপায় রাখেন নাই।

সেদিন সকালে সদাশঙ্করবাবু ও আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। সদাশঙ্করবাবুকে দেখিতে সাধারণ বাঙালীর মত, কেবল তৈলস্পর্শহীন অসংবৃত দীর্ঘ কেশপাশে অরাজকতার একটা আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর জার্ম্মানীতে

কাটাইয়াছেন, কিন্তু সে দেশ হইতে কি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পায় নাই; তিনিও সযত্নে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। লোকে বলে জার্ম্মানী নয়, কয়েক বছর তিনি পেশোয়ারে কাটাইয়া আসিয়াছেন; তাহার প্রমাণ বাগানের ওই আখ্‌রোট ও এপ্রিকটের গাছ; সেখান হইতেই ও দুইটির চারা আনীত। দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল—জানিয়া রাখা ভাল অপর ব্যক্তির নাম কমরেড।

কমরেড—দেখুন আমার ট্রেনিং হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এতে আজগুবি কিছু নেই। এ'তে তিনটি অঙ্গকে শিক্ষিত করতে হবে। প্রথম হচ্ছে, চোখ আর মুখ; চোখে এমন একটি ভাব করতে হবে, যা মকরধ্বজের মত, অনুপানভেদে সব জায়গায় চলে। আপনার চোখের ভাব দেখলে—রায়তবাদী ভাববে, আপনি তার জন্যেই সারা-রাত কেঁদেছেন; সাম্যবাদী ভাববে, আপনার টাকাকড়ি কালই তাকে দিয়ে ঝুলি ঘাড়ে করবেন; তাঁত-বাদী ভাববে আপনি চাষা। বুঝলেন কিনা?

সদাশঙ্করবাবু—আর মুখের কাজ কি?

কমরেড—এমন ভাবে কথা বলবেন যাতে দরকার হ'লে তার অনেক অর্থ হয়, অর্থাৎ কিনা, কোনই অর্থ হয় না।

সদাশঙ্কর—বুঝলাম, কথাটা একটু ভেবে বলতে হবে—

কমরেড অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কিছু মাত্র না, কিছু মাত্র না, যা খুসি বলে ফেলবেন, বেগতিক দেখলে একজন উকীল লাগিয়ে দেবেন।

সদাশঙ্কর—আর কোন্ অঙ্গ?

কমরেড্—পায়ের শিক্ষা চাই। এমন ভাবে এগোবেন যাতে সময় মত পেছোনো যায়। নবাবের দরবারে আগে লোকে কুর্নিশ করে'

ঢুকত—দুই পা এগোতো এক পা পিছোতো! আপনি কিন্তু দুই পা এগোবেন, তিন পা পিছোবেন—

সদাশঙ্কর—তা হলে যে ক্রমে পিছিয়েই যাব!

কমরেড—যাবেনই তো! নইলে কি এগিয়ে মারা পড়বেন! আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠি, আমাকে একবার সাহেবপাড়ায় যেতে হবে।

—কেন বলুন তো?

—ট্রেনিং দিতে।

—আপনি তো শুধু দেশীয়দের ট্রেনিং দেন!

—কে বল্লে? দেশী বিদেশী যারা আমাকে ডাকে, তাদের কাছেই যাই। দেখছেন, এক সঙ্গে উপরি উপরি আমি তিনটে পোষাক পরে আছি।

এই বলিয়া এক একটা করিয়া পোষাক তুলিয়া তিন রকমের তিনটি পোষাক দেখাইল।—দেখলেন, উপরেরটা খদ্দর, দেশী নেতাদের জন্য; তার নীচে হাফ প্যাণ্ট, সাহেবদের জন্য; আর সব নীচে কুস্তির পোষাক—ওটা ছাত্রদের জন্য। আজকাল বক্তৃতার দিন গেছে কিনা, সভাতেও হাতের ব্যবহার চলে, তাদের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতে হয়!

সদাশঙ্কর—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ছাত্রদের আমার দলে না টানলে তো উপায় নাই।

কমরেড্—দেখুন পুরাণে বলে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা ভস্ম হয়ে গিয়ে হাতীর মাথা বসাতে হয়েছিল। সংবাদপত্রের কৃপায় ছাত্রদের সেই দশা হয়েছে। হাতীর মাথার সুবিধে ওটা আকারে বৃহৎ হওয়াতে ভিতরে যে কিছু নেই হঠাৎ এ সন্দেহ হয় না। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। এই বলিয়া লোকটি

উঠিয়া চার দেয়ালের চার দেবতাকে নমস্কার ঠুকিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য চতুর্দ্দেয়ালে এই চার চিত্রের আবির্ভাব এই শিক্ষাগুরুর পরামর্শে।

এমন সময় একদল ছাত্র গৃহে প্রবেশ করিল। এই জাতীয় যাচক-উপযাচক প্রায়ই তাঁহার গৃহে আসে, কাজেই সদাশঙ্করবাবু কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে?

—আজ্ঞে আমরা ছাত্র।

—কি চাও?

—আমরা পাড়ায় একটা অতিথিশালা করেছি, তার জন্য কিছু চাঁদা।

—এই ছবিখানা কার চেন? চিত্রখানার ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। সদাশঙ্করবাবুর মাথার কাছে শ্মশ্রুমান্ একটি বিদেশী পুরুষের ছবি আছে; এই একটি ছবি দ্বারা তিনি বহু কাজ চালাইয়া থাকেন। (এ ছবিখানা কমরেডের পরামর্শে নহে, তাঁহার নিজের আবিষ্কার।)

ছাত্রেরা বলিল—আজ্ঞে না।

—কম্যুনিজমের স্রষ্টা কে?

—জহরলাল নেহেরু।

—না, কার্ল মার্কস।

—কোন্ জেলায় তাঁর বাড়ি?

—জার্ম্মানীতে। তাঁর বই পড়ে দেখো তিনি ওসব করতে নিষেধ করেছেন।—আমি কম্যুনিষ্ট। ছাত্রদল বিদায় লইল।

এমন সময় দ্বিতীয় দল ছাত্র প্রবেশ করিল।

—কি চাও?

—আজ্ঞে কুস্তির আখড়া করেছি, কিছু চাঁদা।

—এই ছবিখানা কার চেন? (সেই ছবি)

—আজ্ঞে না।

—টলষ্টয়ের নাম শুনেছ? তিনি বলেছেন বাহুবলে কিছু হবে না—আমি তাঁর শিষ্য। নিরুপায় ছাত্ররা চলিয়া গেল।

তাহারা যাইতেই তৃতীয় দল ছাত্রের প্রবেশ।

—কি চাও?

—আজ্ঞে আমরা একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করেছি।

—বেশ।

—আপনি নিজের সব সম্পত্তি দেশের জন্য দেবেন বলেছেন—আমরা···

—কিন্তু দেশ কোথায়? তুমি কি দেশ, তুমি দেশ, তুমি দেশ?

—আমরা সবাই মিলে।

—তোমরা এই তিনজনে দেশ। দেশকে আনো এখনি দিচ্ছি। আর বিশেষ—আচ্ছা এই ছবিখানি কার চেন? (সেই ছবি)

—আজ্ঞে না।

—বার্ণাড শ'র নাম শুনেছ?

—আজ্ঞে তিনি বাংলার লাট ছিলেন।

—না তিনি রোনাল্ডশ। ইনি ইংলণ্ডের একজন ডাক্তার। 'দি ডক্টর্‌স্ ডাইলেমা' বলে একখানা ডাক্তারি বই লিখেছেন, তাতে প্রমাণ করেছেন, ঔষধে রোগ সারে না। এখন যেতে পার।

ছাত্রেরা গেলে সদাশঙ্করবাবু স্নানের জন্য উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পরমেশ সবেগে প্রবেশ করিয়াই মস্কোমার্কা একটা অভি-

বাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার লাল প্যাণ্ট, লাল কোট, লাল জুতা এবং লাল মোজা। মাথার চুল কটা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাও 'লাল হো যায় গা'। সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কিংবা ইতস্ততঃ না করিয়া বলিয়া গেল—আপনিও কম্যুনিষ্ট আমিও কম্যুনিষ্ট, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো।

সদাশঙ্করবাবুর মত লোকও অবাক্! ইতঃপূর্ব্বে যাহারা চাঁদা চাহিতে আসিয়াছিল তাহাদেরও কিছু দ্বিধা ছিল, কিন্তু ইনি সে সবের অনেক উর্দ্ধে।

সদাশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কখানা বাড়ি?

পরমেশ সগর্ব্বে উত্তর দিল—একখানাও নয়।

—নগদ টাকা?

—এক পয়সাও নয়। পরমেশ নিজের উত্তরে নিজেই গৌরব বোধ করিতেছিল। আদর্শকে সে প্রায় ধরধর করিয়া ফেলিয়াছে।

—জমি জমা?

—এক ছটাকও না।

—তবে তোমার কি আছে?

—কেউ না, কিছু না।

—তবে?

—কেবল আমি আছি, আপনি আছেন, আর আছেন ওই লেনিন। এই বলিয়া সে লেনিনের ছবিখানা দেখাইয়া খানিকটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেল।

Lenin thou shouldst be living at this hour
India hath need of thee! She is a fen
Of Private Property! Factory, Bank and Pen,

Corporation, the clique of office and bower
Have forfeited the pre-historic Indian dower
Of lawless happiness ! we are selfish men ;
Oh, raise us up, return to us again ;
And give us strikers, voting, daughters, power !

কবিতাতেও সদাশঙ্করবাবুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে হইল না। তিনি বলিলেন—এখন যেতে পার।

—কিন্তু মেয়ে ?

—আমার কাছেই থাকবে।

—বিয়ে।

—সেটা অন্যত্র দেখ।

পরমেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিস্ময় ভাঙিলে চীৎকার করিয়া উঠিল—Lenin, Lenin thou shouldst be living at this hour. সে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—জাহান্নমে যাক্ কম্যুনিজম্, আমি মডারেট হ'ব ! মাথায় তেল দেব, পোষাকের লাল রঙ ধুয়ে ফেলব, মনে রাখবেন এখনো পাকা রঙ করিনি ! গোল্লায় যাক্ রাশিয়া, বেঁচে থাক্ ইংলণ্ড। ডাউন, ডাউন উইথ কম্যুনিজম্ ; আপ, আপ, ইম্পীরিয়ালিজম !—সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল—England with all thy faults I love thee still ! আহা-হা, বেবি, বেবি !

৯

বিনয়ের পক্ষে পারুল ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যথাসম্ভব বিনয়কে এড়াইয়া চলে। বিনয় আসিলে সে দেখা করে না,

চায়ের টেবিল হইতে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। অবিনাশবাবু পুরুষ, তাঁহার এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কম, তিনি অত লক্ষ্য করিতেন না। সর্ব্বেশ্বরী স্ত্রীলোক, তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি অত্যধিক, তিনি ইহাকে কুমারী-সুলভ লজ্জা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হইল বিনয়ের। বিবাহের প্রস্তাবের আগে পারুল কারণে অকারণে বিনয়কে ডাকিয়া লইয়া গল্প করিত, এখন আর সে সুযোগ মিলে না। ব্যাপার দেখিয়া বিনয়ও ক্রমে গম্ভীর হইতে লাগিল—তাহার মুখের উপর যেন একটা অনুতাপের ছায়া পড়িল। পারুল ইহা লক্ষ্য করিল, এবং আশ্চর্য্য এই যে ইহাতে দুঃখিত হইবার পরিবর্ত্তে সে কেমন যেন একটা গর্ব্ব বোধ করিতে লাগিল।

পারুল সারাদিন একাকী বসিয়া ভাবে সে বিনয়কে জব্দ করিবে। এক একবার তাহার সন্দেহ হয়, তবে কি সত্যই সে বিনয়কে ভালবাসে না। এই চিন্তার ছায়াপাত মাত্রে তাহার অন্তরতম আদিম নারী বিদ্রোহ করিয়া ওঠে, বিনয়কে ছাড়া তার গতি নাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার অস্তিত্বের উপরিতলের আধুনিক শিক্ষার আবরণ কর্কশ কণ্ঠে বলিতে থাকে, মনে রাখিও পারুল, তুমি পিতামাতার অস্থাবর সম্পত্তি নও। তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তোমাকে দান করিতে পারেন না; তোমার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, অস্তিত্ব আছে, স্বাধীনতার অধিকার আছে।

পারুলের দিন এই দ্বন্দ্বে কাটে। কিন্তু হায়, ইচ্ছা থাকিলেও নারীর সুযোগ কত অল্প। সে নিশ্চিত জানে, বিনয় ইচ্ছা করিলেই তাহাকে যে-কোনো সুযোগে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া সগর্ব্বে চলিয়া যাইতে পারে; তাহার সুযোগের অবধি নাই। কিন্তু পারুল আজ কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়াও সামান্য এমন একটা ছুতা পাইল না, বিনয়কে যাহাতে একটু জব্দ করিতে পারে।

অবশেষে সে-সুযোগ বিনয়ের নিকট হইতেই আসিল। সেদিন পারুল বিনয়কে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু বিনয় ছাড়িল না। বিনয় বলিল—পারুল কাল সিনেমায় যাবে? একটা ভাল ফিল্ম আছে। পারুল ভাবিবার সময় পাইল না, বলিল—যাব।

—তবে তুমি তৈরী হ'য়ে থেক। আমি সাড়ে পাঁচটায় আস্‌ব। বাড়ীতে থেক যেন, আমার শরীর ভাল নয়, কিন্তু ফিল্মটা এখন না দেখলে আর দেখা হবে না, বুঝলে?

—আচ্ছা।

পারুল বিনয়কে আর বেশি অবসর না দিয়া ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের উপর এত বিদ্বেষের পরে সে যে কেমন করিয়া এই প্রস্তাবে বিনা দ্বিধায় সম্মত হইল, ইহা ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। সে বুঝিল না, এই সম্মতি তাহার স্বভাবনিহিত আদিম নারীর ইঙ্গিতে। কিন্তু তাহার পরাজয়ের এই সুযোগটাকে বিজয়স্তম্ভে পরিণত করিবার জন্য তাহার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল, ভালই হইয়াছে, একটা সুযোগ যখন মিলিয়াছে, ইহাকে এমন ভাবে ব্যবহার করা চাই, যাহাতে বিনয়ের উচিত শিক্ষা হইয়া যায়। বিনয় অনুতপ্ত হউক, বিবাহের প্রস্তাব নূতন করিয়া তাহার কাছে করুক, তারপরে দেখা যাইবে। সে ভাবিল, বিনয়ের মনে ঈর্ষ্যা জাগাইয়া দেখাইতে হইবে, পারুল পিতা-মাতার সম্পত্তি নহে, সে তাহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল; পরমেশকে তাহার সহিত যথাসম্ভব শীঘ্র দেখা করিতে অনুরোধ করিয়া একখানা চিঠি লিখিল।

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। এতদিন

পরে সে মনে একটু শান্তি পাইল; এমন কি, তখন আর বিনয়ের চিন্তাও তাহার নিকট অপ্রিয় মনে হইল না। পারুল দেরাজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হঠাৎ বিনয়ের একখানা ছবি বাহির করিয়া ফেলিল। এ ছবিখানা বিনয়ের উপহার। বিবাহের প্রস্তাবের পরে সে এ ছবি আর দেখে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কত অবসর সময় না এই ছবির সাহচর্য্য করিয়া কাটিয়াছে।

আজ সে আবার ছবিখানা তুলিয়া ধরিল। ছবিখানার প্রতি সে কেমন একটা হৃদ্যতার ভাব অনুভব করিল। কত দিন সে ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। ছবিখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে সে একটা চুম্বন করিল। কিন্তু বিনয়কে সে উচিত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবে না। ছবিখানাকে সে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল; কাল বিনয়ের সঙ্গে তাহার একবার বোঝাপড়া হইবে; তারপরে নূতন করিয়া নূতন ভিত্তিতে দুই জনের মিলন। একবার চকিতের মত মনে হইল, বিনয় যদি তাহাকে আর গ্রহণ না করে। পারুল ছবিখানা বাহির করিয়া দেখিল সেমুখে অবিশ্বাসের সন্দেহের কোনো কারণ নাই। ছবিটা বুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া সে বাহিরে আসিল। অনেকদিন পরে সে আজ হাসিয়া মায়ের সঙ্গে আলাপ করিল। সর্ব্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন, বিনয়ের সঙ্গে তাহার একটা প্রণয়-কলহ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। পারুল কারণে অকারণে উৎফুল্ল হইয়া ঘুরিতে লাগিল, এমন সময় খবর আসিল পরমেশ আসিয়াছে।

পরদিন বিনয় বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময় পারুলদের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। সে একেবারে সোজা পারুলের ঘরে গেল। ঘর খালি। পারুল বোধহয় সাজ-গোজ করিয়া লইতেছে এই ভাবিয়া সে বসিয়া রহিল। এমন সময়ে পুরাতন চাকর রামভকত বিনয়কে দেখিয়া বলিল—বাবু, আজ আপনাকে একটু বসতে হবে।

—কেন রে ?

—দিদিমণি বাইরে গেছেন।

—কোথায় ?

—বায়স্কোপ দেখতে।

বিনয় বুঝিল রামভকতের ভুল হইতেছে। সে বলিল—যাবার কথা আছে বটে, আমার সঙ্গে যাবে, তুমি তাঁকে গিয়ে বল।

রামভকত বুঝিল, বিনয় ভুল করিতেছে। সে বলিল, তিনি আধঘণ্টা হ'ল গেছেন, আমি নিজে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

—বলিস্ কিরে ? একা ?

—না, সঙ্গে পরমেশ বাবু আছেন। বিনয়ের পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, এই চাকরটার সম্মুখে যেন তাহার মুখের কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে।

—কোন্ সিনেমাতে ?

—পিকচার প্যালেস। আপনি উঠছেন কেন, বসুন।

—না, আর একদিন আসব। বিনয় উঠিয়া পড়িল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হইতে বেদনার একটা শূল যেন উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সে সিনেমার দিকে উড়িয়া চলিল।

সিনেমার 'শো' অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বিনয় একখান টিকিট করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ছবি দেখিবার লোভ তাহার ছিলনা, সে অন্ধকারে প্রাণপণবলে পারুল পরমেশকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কাছাকাছি কোথাও তাহারা নাই। নিশ্চয় উপরের বেশী মূল্যের আসনে বসিয়াছে। বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—সাম্‌নে দেখুন মশায়, উপরে নয়। এমন সময়ে চট্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল—ইণ্টারভ্যাল।

বিনয় চাহিয়া দেখিল, উপরে অধিক মূল্যের দুইটি আসনে পাশাপাশি পারুল ও পরমেশ। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, গা কাঁপিতেছিল, চারিদিকের শব্দ, দৃশ্য সব মরীচিকা বলিয়া মনে হইতেছিল। নিজের উপরে তাহার কেমন যেন করুণার ভাবের উদয় হইল। সে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। সে কি করিবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কোনো ফল নাই। বাহির হইয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু বাহির হইতেও পারিতেছিল না। কেমন যেন একটা ভীতিমিশ্রিত আনন্দের ভাব সে অনুভব করিতে লাগিল। এই দৃশ্যটা সে দেখিতেও পারিতেছিল না আবার ছাড়িয়াও উঠিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। অবশেষে একটা শুষ্ক হাসির রেখা তাহার মুখে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পারুল ও পরমেশ অত্যন্ত আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া আলাপ করিতেছে। পরমেশের হাতখানা

পারুলের চেয়ারের পিঠদানীর উপরে। পারুল পরমেশের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছে।

পারুল কেমন যেন উন্মনা হইয়া ছিল। পরমেশ মানুষের মনের এই সব সূক্ষ্ম অনুভূতির কোনো খবর রাখে না সে যে অনাত্মীয় যুবতীর সঙ্গে সিনেমায় আসিতে পারিয়াছে এই আনন্দেই মগ্ন। কতক্ষণে সে বাসায় ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবকে এই আশ্চর্য্য কাহিনী বলিয়া অবাক করিয়া দিবে তাহাই ভাবিতেছিল। পারুলের দৃষ্টি ছিল সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে। সে নিশ্চয় জানিত বিনয় তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া এখানে আসিবে। পাছে বিনয় তাহার সন্ধান না পায়, সেই জন্যই অনাবশ্যক হইলেও রামভকতকে সঙ্গে আনিয়াছিল। রামভকত খবরটা নিঃসন্দেহে বিনয়কে দিয়াছে।

পারুল নীচের দিকে তাকাইয়া সন্ধান করিতে করিতে বিনয়কে দেখিতে পাইল। বিনয় তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পারুল বুঝিল বিনয় তাহাদিগকে নিশ্চয় দেখিয়াছে। এতক্ষণে তাহার মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিল। পারুল দেখিল বিনয় একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, ছটফট করিতেছে। কেমন অহঙ্কারে পারুলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখ বিনয়, আমি পিতামাতার সম্পত্তি নই বিবাহের প্রস্তাব মাত্রেই তোমার সম্পত্তি হইয়া যাই নাই, স্বাধীন ব্যবহারের বলে আমি যেখানে খুসী যাহার সহিত খুসী আসিয়াছি।

বিনয়ের মত পারুলও তাহাকে না দেখিয়া পারিতেছিল না, বিনয়ের মুখে চোখে অসহায় ঈর্ষ্যার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পারুল একান্ত তৃপ্ত ভাবে তাহাই দেখিতে লাগিল। আবার আলো চট্ করিয়া নিভিয়া গেল। পারুল দেখিল অস্পষ্ট একটা মূর্ত্তি বাহির হইয়া

যাইতেছে। বিনয় চলিয়া যাইতেই পারুলের ছবি দেখিবার সখ চলিয়া গেল। পরমেশ একাগ্রচিত্তে ছবি দেখিতেছিল। একটা হাসির দৃশ্য ছিল। পরমেশ হাসিতে হসিতে পারুলকে বলিল—দেখুন, দেখুন কি মজা!

পারুল হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বুঝিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছে। জগৎ-বিখ্যাত বিদূষক চার্লি চ্যাপলিনের কৌতুক অভিনয়ে, যখন প্রেক্ষাগৃহ অজস্র হাস্যে প্রতিধ্বনিত, একাকী পারুলের দুই গাল বাহিয়া তখন অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে। বিপদের কোনো চিত্র থাকিলে তাহার হয়তো এমন দশা ঘটিত না কিন্তু কৌতুক-নাট্যে সকলের আনন্দের সহিত তাহার নিরানন্দ এমনি পৃথক ভাবে তাহার নিকট দেখা দিল, সে বুঝিতে পারিল, অত বড় ওই প্রেক্ষাগৃহে, সে নিতান্ত অসহায়, একাকী, একেবারে নিঃসঙ্গ। পাশের ওই পরমেশ বাবু তিনিও কতদূরে। তাঁহার হাসির সঙ্গে পারুলের নীরব অদৃশ্য অশ্রুর কোথায় যোগ!

১১

বিনয় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত পরিচিত পথ, সেই পথের জনতা, একেবারে মরুদৃশ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। মুমূর্ষুর কাছে সংসারের আয়োজনের মত তাহার নিকটে এত বড় কলিকাতা শহর একান্ত অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। সে কোনরকমে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এতক্ষণে নিরিবিলি একটু ভাবিবার অবসর তাহার জুটিল। এখন তাহার কর্ত্তব্য কি। পরিচিত পথে নিশ্চিন্ত ভাবে চলিতে চলিতে সে যেন অদৃষ্টপূর্ব্ব একটা সুগভীর খাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। পিছনে ফিরিয়া দেখে সেদিকের পথও রুদ্ধ করিয়া আর একটা গভীর শূন্যতা। কোন দিকে আর এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

চরচিলমারীর বিচ্ছেদ এমন দুঃসহ হইয়া দেখা দেয় নাই, কারণ তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে হইতে একদিন ছিন্ন হইয়াছিল। আর এ যেন পূর্ণ তানের মুখে গানের অকস্মাৎ সমাপ্তি।

সে আরাম-চেয়ার খানাতে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। অবশেষে পরমেশের সঙ্গে! কই সে আগে তো কিছু লক্ষ্য করে নাই। অবশ্য পারুল তাহাকে ইদানীং এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তাহার অর্থ কি এত ভীষণ!…পারুল ও পরমেশ অত্যন্ত বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে বসিয়াছিল। পরমেশের হাতখানা পারুলের চেয়ারের হাতলের উপর ছিল। আর তাহার শাড়ির আঁচলখানা সরিয়া আসিয়া…নীচের অংশটা রেলিঙের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল…ভাল করিয়া দেখা যায় নাই। তবে কি সর্ব্ব মিথ্যা! সেদিনের সেই জ্যোৎস্নায় অভিষেক, আর দ্বারপ্রান্তে জনতার চক্ষু-এড়ানো সেই সলজ্জ গোলাপ ফুলের কুঁড়িটি, সমস্তই!

সে নাটক নভেলে পড়িয়াছিল, মনের এইরূপ অবস্থায় ভীষণ ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসার ভাব জাগে। কিন্তু সে তেমন কিছু অনুভব করিতে পারিলনা! কেবল একটা গভীর নৈরাশ্য, নিদারুন একটা ক্লান্তি। তাহার নবীন হৃদয়ের স্নেহ প্রেম আশা আকাঙ্ক্ষা অকাতরে ঢালিয়া দিয়া যে সৌন্দর্য্যলোক সে সৃষ্টি করিতেছিল, অকস্মাৎ

তাহা ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গেল। এই অমর ক্ষতির অঙ্কটা একটা গভীর অন্ধকারের রূপে তাহার চারিদিকে চাপিয়া ধরিল!

এখন কি তাহার কর্ত্তব্য? কলিকাতা সহর, কলেজের পড়াশুনা, বন্ধুবান্ধব সব অমূলক; সমস্ত মিথ্যা! কিছুক্ষণের জন্য তাহার মন হইতে সমস্ত ক্ষোভ দুঃখ যেন চলিয়া গেল। একটা গভীর প্রশান্ত বিষাদে তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল, রাজসাহীতে তাহার পড়িবার ঘরের দেয়ালে সন্ধ্যাবেলা একটা টিকৃটিকি পোকা শিকার করিয়া খাইত। তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্য বিনয় কাঠির আগায় একটা পোকা বাঁধিয়া খেলাইত—টিকৃটিকিটা ছুটাছুটি করিয়া মরিত। আর মনে পড়িল, খুব বাল্যকালে সে একদিন একটা কুকুরকে আঘাত করিয়াছিল। কুকুরটা আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা, অতি তুচ্ছ, বিনয় তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই আহত আর্ত্ত কুকুরটার খঞ্জ গতি অতি প্রত্যক্ষভাবে মনে জাগিয়া উঠিল। তবে কি জীবনে এই অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই সত্য। এই নগণ্য স্মৃতিগুলি বাড়ীর পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত উৎসবের দিনের সমারোহে একান্তে অপেক্ষা করে, কেহ তাহাদের সন্ধান করে না কিন্তু দুঃখের দুর্দ্দিনে দীপ-নির্ব্বাপিত শোকান্ধকারের প্রদোষে তাহারা একে একে আসিয়া হাজির হয়—উৎসবের বন্ধুরা যখন অন্য উৎসবের অনুসন্ধানে অন্যত্র ব্যস্ত। হয় তো তাই, কিন্তু তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে।

হঠাৎ ঘড়িটার একঘেয়ে ধাতব রবে তাহার ঘোর ভাঙিয়া গেল। বিনয় দেখিল, কেবল মাত্র নয়টা বাজিয়াছে। কেবল নয়টা, তবে তো রাজসাহীর গাড়ী এখনও ছাড়ে নাই। বাড়ী যাইতে হইবে।

এতক্ষণ এই কথাটা তাহার কেন যে মনে পড়ে নাই, ইহা ভাবিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। যে-কর্ত্তব্যের জন্য সে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া মরিতেছিল, সে কর্ত্তব্য যেন বহুদিন হইতে স্থির হইয়াই ছিল।

বিনয় উঠিয়া পড়িল। সামান্য জিনিষপত্র আর টাকার থলিটি লইল। ঘরটি ছাড়িল না, তাহার দখলেই রহিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে বিনয় যখন একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া বসিল, তখনো গাড়ি ছাড়িতে মিনিট দশেক সময় আছে। সে একটি ভারি স্বস্তির ভাব অনুভব করিতেছিল। সে যেন একটিমাত্র আঘাতে অতীতটাকে বিদীর্ণ করিয়া নূতন এক লোকে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে সুখ হয় তো নাই কিন্তু আগের মত জগদ্দল দুঃখের পাষাণও সে রাজ্যে সম্ভব নয়।

বিনয়ের কেন যেন মনে হইল পারুল ও কলিকাতা একটা আর ঐকটার প্রতীক। দু'টা কেমন করিয়া বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মত সহরে পারুলের মত মেয়েরই সম্ভাবনা। আবার পারুলের মত মেয়ে কলিকাতাতেই সম্ভব। বিনয় আজ দু'টাকেই ছাড়িয়া চলিল।

গাড়ী গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়াছে। আলোকে অন্ধকারে, শব্দে নৃত্যে, কম্পনে সঙ্গীতে, গর্জ্জনে ধ্বনিতে, গাড়ী অবিশ্রাম ছুটিয়াছে। সাঁকোর ঝম্ ঝম্ আওয়াজ; লৌহ রেলের মুখর মৃদঙ্গের গভীর মন্দাক্রান্তার তানে এবং তালে; কখনো বা দ্বিগুণিত গতির শার্দ্দূলবিক্রীড়িতছন্দে, আসন্ন ষ্টেশনের আভাস বহিয়া আবার কখনো অনুষ্টুভের ছোট ছোট ধাপে। গাড়ীর গতিটা ক্রমে বিনয়ের শরীরের ও মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল। বিপর্য্যয় একটা গতির নেশায় তাহাকে পাইয়া

বসিল। তাহার ইচ্ছা হইল এই লৌহ-তুরঙ্গকে যথেচ্ছ কশাঘাত করিয়া লাগাম-ছেঁড়া গতিতে ছুটাইয়া দেয়। নদী গিরি পুরী দরী কানন কান্তার অতিক্রম করিয়া যেদিকে খুসী, যেখানে খুসী। কোথায় তাহা সে জানে না ; কেন, তাহা সে জানে না ! কেবল আরো দূরে, আরো আরো ; আরো জোরে আরো আরো। বিনয় আজ নিজের কাছ হইতে নিজে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

চরচিলমারী পুনর্ব্বার

১

তারণদাস আঙিনার এক কোণে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া চিঠি গুছাইয়া রাখিতেছিল। চিঠি রাখিবার জন্ত সে একটি পায়রাখুপি কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিয়া লইয়াছিল। তাহারই বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন নামের এবং ঠিকানার পত্রের বিন্যাস।

এই এক বছরে তাহার শরীর অনেকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি আরো বসিয়া গিয়া নীচের অংশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। গালের ও কপালের বলি-চিহ্ন স্পষ্টতর। তাহার সযত্নরক্ষিত পত্রগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। একই চিঠি বহু বছর ধরিয়া ব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায়; অক্ষরগুলি আর বোধগম্য হয় না। এই গ্রামে নূতন চিঠি সে কোথায় পাইবে। কদাচিৎ এক আধখানা ভাগ্যক্রমে জুটিয়া যায়।

কঙ্কণ নদীতে জল আনিতে গিয়াছিল। পদ্মায় চর পড়িয়া জলধারা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। জল লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিতেছিল। তাহার সত্বর হইবার কারণ ছিল। সে বাদলকে সহরের ডাকঘরে পাঠাইয়াছে। আজ বিনয়ের চিঠি আসিবার কথা। প্রথমে সে বিনয়ের চিঠি নিয়মিত পাইত, ক্রমে সেই নিয়মে ছেদ পড়িতে লাগিল। এখন কদাচিৎ পায়। কিন্তু তাহাতেও বাধা অনেক। চিঠিখানা যদি প্রথমে তাহার হাতে না পড়িয়া তারণদাসের হাতে পড়ে তবেই বিপদ। সে চিঠি তাহার ডাকবাক্সের পত্রগুচ্ছের অন্তর্গত

হইয়া মালিকের হাতে আর পড়িতে চায় না। এমন আগে একবার হইয়াছে। একখানা চিঠি আদায় করিতে কঙ্কণের বহু কৌশল ও তিন চার দিন সময় লাগিয়াছে। তখন তাহা সহ্য হইত, কারণ বিনয়ের চিঠি সে সময় দুর্লভ ছিল না। কিন্তু আজকাল দুর্লভ মুহূর্তে বিনয়ের চিঠি পাছে তারণের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় কঙ্কণ ঘাট হইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত ফিরিতেছিল।

শীতের সকাল। মাঠে মাঠে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘাসের শিশির তখনো শুকায় নাই। সারা রাত্রি শিশির পড়িয়া কচি ছোলা ও মশুরের ক্ষেত সাদা হইয়া গিয়াছে। পাতার ডগায় শিশিরের কণা ঝলমল করিতেছে। কঙ্কণের ত্রস্ত পায়ের সঞ্চরণে সেই জলধারা গলিয়া তাহার কোমল পা'দুটি ভিজিয়া উঠিতেছিল। আলের পথ ছাড়িয়া শস্যক্ষেত্র ভাঙিয়া সে সোজা চলিয়াছিল, তাহার পায়ের আঘাতে বুনো মটরের ছোট ছোট নীল ফুলগুলির পাত্র হইতে শিশিরকণা গড়াইয়া পড়ে, দু'চারটা ফুল পায়ে চাপা পড়ে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সে এই ফুলগুলি বাঁচাইয়া পা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। এই ফুলগুলি তাহার বড় প্রিয়, কারণ বিনয় এ ফুল ভালবাসিত। ক্ষেত ছাড়িয়া সে কুল, বাবলা গাছের তলা দিয়া চলিল। গাছের পাতা হইতে সঞ্চিত শিশির ফোঁটা ফোঁটা তাহার চুলে, গালে, কপালে পড়িতে লাগিল। দু'চার ফোঁটা কাঁধের উপরে পড়িয়া গড়াইয়া বুকের ভিতরে চলিয়া গেল। এমনি করিয়া সে আঙিনার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে-আশঙ্কা সে করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। উঠানের অন্য প্রান্তে বাদল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কঙ্কণ ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—চিঠি কই? বাদল নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় আঙুল দিয়া ডাকমুন্সীকে দেখাইয়া দিল।

কঙ্কণ জলের কলসী নামাইয়া রাখিয়া নীরবে তারণদাসের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিতে পাইল, কুন্দফুলের মত শুভ্র একখানি খামে ভ্রমরের মত কালো কালিতে বিনয়ের হস্তাক্ষরে তাহার নাম। তারণদাস বহুদিন পরে একখানা নূতন চিঠি পাইয়াছে, বহু যত্নে চিঠিখানাকে সে একটি খোপের মধ্যে রাখিয়া দিয়া অন্য চিঠি বাছিতে ব্যস্ত। কঙ্কণের মনের অবস্থা কেবল অনুমান করাই চলে—বিনয়ের পত্র বদ্ধ খামের দুর্ভেদ্য রহস্য লইয়া ওই সম্মুখেই—কিন্তু তবু কতদূরে!

কঙ্কণ ঘর হইতে বাটি ভরিয়া খানিকটা গরম দুধ আনিয়া বলিল—দুধটুকু খাও।

তারণদাস মুখ ফিরাইয়া বলিল—বড় ব্যস্ত মা, সরকারি কাজ।

—তা হোক, এটুকু খেয়ে নাও।

—আচ্ছা, দে। বলিয়া সে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিল। এই অনবধানতার অবসরে কঙ্কণ চট্ করিয়া চিঠিখানা সরাইবার অভিসন্ধিতে ছিল, কিন্তু ডাকমুন্সীর ক্ষিপ্র দৃষ্টিকে সে এড়াইতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল—সে হয় না মা। সরকারী কাজে আত্মবন্ধু নাই। কঙ্কণের প্রথম চেষ্টা বিফল হইল।

কিছুক্ষণ পরে, তারণদাস বালককে লইয়া পাড়ায় চিঠি বিলি করিতে চলিল—কঙ্কণের আবার আশা হইল। কিন্তু হায়, সরকারি কাজের নির্ম্মম কর্ত্তব্য তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিল। তারণদাস তাহার পায়রাখুপি চিঠির বাক্সে তালা-চাবি লাগাইতে লাগাইতে কঙ্কণের দিকে তাকাইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর ন্যায় বলিল—'অলওয়েজ আণ্ডার লক্ এণ্ড কী।' চিঠির বাক্সে তালা দিয়া, চাবিটি সঙ্গে লইয়া তারণদাস পাড়ায় বাহির হইয়া গেল। বাক্সের এক ফাঁক দিয়া বিনয়ের চিঠিখানা দেখা যাইতেছিল, কঙ্কণ কাঠি দিয়া চিঠিখানা

নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। খামখানা বেশ মোটা—ভিতরে বড় চিঠি আছে। বিনয়ের নিজের হাতে লেখা চিঠি—কতদিনের পরে। কিন্তু হায়, সরকারি কাজে নাকি আত্মবন্ধু নাই—'অলওয়েজ আণ্ডার লক এণ্ড কী।' কঙ্কণ সেই বন্ধ চিঠির বাক্সের নিকটে মুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিল।

কঙ্কণের গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে প্রচুর অবসর ও শীতের মধ্যাহ্ন। ডাকমুন্সী ঘুমাইতেছে, বাড়িতে একাকী তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পদ্মার তীর বহিয়া সে চলিতে লাগিল। পীতাভ বালুচরের একপ্রান্তে নীলাভ নদীর নিস্তরঙ্গ জলখণ্ড—তাহাতে একটিও রেখা নাই, কোন বেগ নাই—যতদূর দেখা যায়, একখানিও নৌকা নাই। পরপারের উচ্চ তটের স্বচ্ছ নীল, বনরাজির ঝাপসা নীল, আর আকাশের নির্ম্মল নীল। কেবল দুইটা শঙ্খচিল নদীর জলে বুকে শাদা ছায়া ফেলিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া মরিতেছে। কঙ্কণ সেই জলাশয়টার ধারে গিয়া বসিল, সেখানে বিনয় মাছ ধরিত। শিরিষ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একপাশে আখের ক্ষেত—শুষ্ক পাতার অন্তরালে অজস্র বাবুই-পাখীর অস্তিত্বের চঞ্চলতার আভাস, আর একদিকে ফুলন্ত শরিষার ভুঁই।

শীতের মধ্যাহ্নের ফুল। মাঠের একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত এই ক্ষীণ সবুজ আভা মিশ্রিত পীত পুষ্পের দাবানল। মৃদু উত্তর বায়ুতে সরিষা ফুলের মধুমদির তীব্র গন্ধ কঙ্কণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। শীতের মধ্যাহ্নে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, কোন কোলাহলের লেশ মাত্র নাই। সমগ্র প্রকৃতি যেন নিজকে নিঃশেষে কেবলমাত্র রঙের বিচিত্রতার দ্বারা আত্মপ্রকাশ

করিতে চেষ্টা করিতেছে। ঘাসের ঝলসিত সবুজ, মশুর ও ছোলার ম্লান সবুজ; আখের পাতার স্বচ্ছ সবুজ; বুনো মটরের একটুখানি লালের ছোপ-দেওয়া বেগুনী নীল, ঘাসের ফুলের গাঢ় নীল, পদ্মার পান্নার নীল, বনরাজির বাষ্পময় নীল, আকাশের পরিণত নীল; বালুচরের স্বর্ণাভ পীত, সর্ষে ক্ষেতের সবুজাভ পীত আর সমস্ত প্রকৃতিকে একখানি সোনার তবকে মুড়িয়া দিয়া দিগন্তব্যাপী শীতের রৌদ্রের দীপ্তোজ্জ্বল পীত। এত বিচিত্র বর্ণের বিকাশ সামান্য মানুষের জন্য নহে, একমাত্র সহস্রচক্ষু দেবরাজের ইহা যোগ্য বিলাস-সামগ্রী।

কঙ্কণ অনেকক্ষণ তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় বসিয়াছিল। যখন তাহার চমক ভাঙিল, তখন শীতের অপরাহ্ন, বাতাস শীতল হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নের সেই নিঃশব্দ বর্ণজগতে নানা শব্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। পদ্মা স্রোতের মৃদু রব, দুই একখানা নৌকার দাঁড়ের শব্দ, পাখীদের নীড়ে ফিরিবার ডানার ধ্বনি, দূরে গোধূলির ঘণ্টার করুণ কিঙ্কিণি।

কঙ্কণকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। কিন্তু ফিরিয়া কি করিবে। বিনয় নাই। বিনয়ের চিঠি বিরল, আজ একখানা আসিয়াছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। বিনয় তিন মাসের উপর চলিয়া গিয়াছে। কঙ্কণের শরীর ইতিমধ্যে অনেক খারাপ হইয়াছে, শরীর কৃশ হইয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, প্রায়ই জ্বর হইয়া সে ভুগিয়া থাকে। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে; আহারে তাহার রুচি চলিয়া গিয়াছে। গৃহে কাজ অল্প, কোন রকমে সারিয়া ফেলে। গভীর আলস্য এবং বিনয়ের চিন্তা তাহার বিপুল অবসরের সঙ্গী। তাহার মনের কথা, নানা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সে কাহাকে

বলিবে! এই সময়ে যদি তাহার মা থাকিত, শৈশবে সে যাহাকে হারাইয়াছে। মায়ের কথা মনে করিতে তাহার চোখের কোণে জল আসিল। কিন্তু কাঁদিলে তাহার চলিবে না, চোখ মুছিয়া সে উঠিয়া পড়িল,—বাড়ির দিকে চলিল। আজ রাত্রে তাহার পিতা ঘুমাইলে চিঠিখানা উদ্ধার করিতে হইবে—ইহাই সে সংকল্প করিল।

২

কঙ্কণের চোখে ঘুম ছিল না। সে বারে বারে উঠিয়া তারণের ঘরের দুয়ারে কান পাতিয়া অনুভব করিতেছিল সে ঘুমাইয়াছে কিনা। বুড়া মানুষের ঘুম আসিতে বিলম্ব হয়। কঙ্কণ একাকী শুইয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছিল। তাহার মনের চিন্তা আপাতত ওই রহস্যময় চিঠিখানাকে কেন্দ্র করিয়া জাল বিস্তার করিতেছিল। স্তিমিত প্রদীপের আলোকে ঘরের জিনিষপত্রগুলা নানারূপ অপ্রাকৃত আকার গ্রহণ করিয়াছিল। দেয়ালের মাটি খসা বিচিত্র দাগ; টিকটিকির পোকা ধরিবার অদ্ভুত ভঙ্গি!

রাত্রি অনেক হইল। কঙ্কণ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শীতের জ্যোৎস্না, দ্বাদশীর চাঁদ। ঘরের খড়ের চাল শিশিরপাতে সাদা; ঘাসে ঘাসে সদ্যপাত নীহারকণার উজ্জ্বলতা। পাশের নারিকেল গাছটার দীর্ঘ মসৃণ পাতায় পাতায় আলো গড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে উলুখড়ের সাদা ভুঁই-জ্যোৎস্নার আলোকপাতে একটা অলৌকিক পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে।

মাঠের মধ্যে বেশী দূর দেখা যায় না—সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা কুয়াশার অস্পষ্টতা।

একবার রাজহাঁসদুটি পাখা ঝটপট করিয়া ডাকিয়া উঠিল; দূরের আম গাছে একটা হঠাৎ-জাগা পাখীর ডাক। কঙ্কণ উঠানের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই শীতের রাত্রির মায়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের কথা ভুলাইয়া দিল।

তাহার চমক ভাঙিলে তারণের দুয়ারে কান পাতিল। তাহার নিশ্বাস বেশ তালে তালে পড়িতেছে। সে দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অস্পষ্ট দীপালোকে নিদ্রিত তারণের চেহারাটা কেমন যেন বিভীষিকাময় বলিয়া তাহার মনে হইল—সে ভয় পাইয়া চমকিয়া গেল। অবশেষে বুঝিল, ভয়ের কোন কারণ নাই—বৃদ্ধের মাথার ছায়া এই অর্দ্ধ আলোকে, অর্দ্ধ অন্ধকারে কিম্ভূত একটা রূপ ধরিয়াছে মাত্র।

পিতার ডাকবাক্সের চাবি কোথায় থাকিত তাহা সে জানিত। চাবি সংগ্রহ করিয়া সে বাক্স খুলিতে গেল। হঠাৎ তারণ যেন কি বিড়বিড় করিয়া বলিল। কঙ্কণ ফিরিয়া দেখে, বৃদ্ধ ঘুমাইতেছে। তালাতে চাবি ঘুরাইল, খুট করিয়া একটু শব্দ; কঙ্কণের মনে হইল ওই শব্দটাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নিদ্রা ভাঙিয়া যাইবে। আবার তারণদাস কি বকিতে লাগিল। কঙ্কণ কান পাতিয়া শুনিল—বৃদ্ধ বকিতেছে "দূর লক্ষীছাড়ি, পালা, পালা, দূর হ।" তবে কি বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে! কই, না, তাহার ঘুম তো অটুট। কঙ্কণ তাড়াতাড়ি বিনয়ের চিঠিখানি বাছিয়া লইয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া বিনয়ের চিঠিখানা সে খুলিয়া বসিল। কিন্তু হায়,

জীবনের অন্যান্য অধিকাংশ ঘটনার মতই কার্য্যকালে চিঠিখানা তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়া দিল। নৈরাশ্য একটা নেতিবাচক ভাব; চিঠিখানা পড়িয়া কোথায় যেন গভীর আঘাত বাজিতে লাগিল। ইহাতে অনেক কথাই আছে, কিন্তু বিনয়ের হৃদয়ের সেই জীবন্ত স্পর্শ, চরচিলমারীতে অনেকবার সে যাহা পাইয়াছে, সেই স্পর্শ কোথায়! এ যেন শুধু কথা। কথার সমষ্টি! হায় কঙ্কণ, তুমি যদি জানিতে এত বড় এই পৃথিবীতে কয়জন লোক হৃদয়ের স্পর্শকে কলমের মুখে ফুটাইতে পারে! বিনয় পশ্চিম হইতে এ চিঠিখানা লিখিয়াছে, কবে চরচিলমারীতে ফিরিবে কিছু ঠিক নাই।

কঙ্কণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষ কেন আর একজনকে ছাড়িয়া দূরে যায়? কিসের আকর্ষণ তাহার? লেখাপড়া? তাহাতে কি সুখশান্তি বাড়ে? টাকাকড়ি? টাকাকড়ি-ওয়ালা কত লোকের এত দুঃখ কেন? বিনয় কেন দূরে গেল? এই চরচিলমারীতে, পদ্মার ধারে, নানা ঋতুর নানা শস্যক্ষেতের পাশে জীবনটা কি কাটাইয়া দেওয়া যায় না? এখানকার নীল নদীর ধারে, সবুজ ক্ষেতের পারে, স্বচ্ছ আকাশের ছায়ায়? এখানকার আকাশপ্লাবী রৌদ্রে এবং দিগন্তপ্লাবী বর্ষায়? বিনয় কেন তাহা পারে না? কঙ্কণ তো সারা জীবন এখানে কাটাইয়া দিবে। ওই অস্পষ্ট দিগন্তের পরপারে এমন কি আছে, যাহা এমন করিয়া মানুষের অতি তুচ্ছ, কিন্তু অসাধারণ সুখশান্তিকে উন্মন করিয়া টান দেয়?

তাহার পিতার কথা মনে পড়িল। বৃদ্ধ কেমন ভুলের স্বর্গে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। কোন দিগন্তের আকর্ষণ তাহার নাই। কিন্তু পিতার কথা ভাবিতেই তাহার মনে পড়িল, স্বপ্নে-বলা ওই কয়টি কথা। এই সরল বৃদ্ধের নিদ্রাকে কাহার দুরন্ত স্মৃতি তিক্ত করিয়া

তুলিয়াছে? জাগরণে যে কখনো কাহাকেও কটূক্তি করে নাই, স্বপ্নের মধ্যে সে কাহাকে বারম্বার দূর করিয়া দিতেছে! কঙ্কণ যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার বিস্ময় বাড়িয়া চলিল। এই মাত্র সে তাহার পিতাকে মানব-জীবনের সরলতার প্রতীক ভাবিতেছিল, কিন্তু সেই আপাতসরলতার তলে কোথায় একটা অতৃপ্তির আভাস রহিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগে বরফ জমিয়া কঠিন হইয়া চলাচলের পথ পড়িয়াছে, কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে অতি নিম্নে অতলস্পর্শ কলধ্বনি শোনা যাইবে। কঙ্কণের মনে হইল, জীবনের রহস্যের না আছে কোন নিয়ম, না আছে কোন অন্ত। আপাতত যাহা সহজ এবং স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে রহস্যের পরিমাপে তাহা তেমন সামান্য না হইতেও পারে! একদিকে বিনয়ের জীবনের প্রকাশ্য রহস্য, অন্যদিকে তারণদাসের জীবনের ছদ্মরহস্য এই দুই ধারা মিলিয়া তাহার চিন্তাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিল। সে চিঠিখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিদ্রাবিহীন রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিল।

৩

বনোয়ারীলাল চরচিলমারীর বার্ষিক আগন্তুক। লোকটা পাটের দালাল। পাট বুনিবার আগে একবার আসিয়া কৃষকদের দাদন দিয়া যায়, আবার তাহা কাটিবার সময় আসিয়া বুঝিয়া লয়। বনোয়ারী-লালকে সকলে চেনে, তাহারো কাহাকেও অবিদিত নাই। লোকটার বয়স চল্লিশের উপরে, যৌবনের আগুন এখন নিভিয়া গিয়াছে,

কিন্তু উত্তাপ যায় নাই। যৌবনটা যে গত হইয়াছে, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে মন সরে না, উত্তাপকে অগ্নি মনে করিয়া যুবক সাজিয়া বেড়াইবার একটা অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার বয়স সেটা।

চীনা-তসরের কোট গায়ে, ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতার হাতলে গামছা মুড়িয়া সে প্রতি বৎসর এই সময়টা চরে আসিয়া দেখা দেয়। লোকটা হাসিলে দুই গালে ফাটাফুটির মত অনেকগুলি রেখা পড়ে। চোখদুটি অকারণে সর্ব্বদাই মিটমিট করিতেছে, যেন অদৃশ্য দালালের সহিত ব্যবসায়ের ইসারা ইঙ্গিত চলিতেছে।

এবার সে যথাসময়ে চরে আসিয়াছে, পাট কাটা হইল, সে পাট চালান হইয়া গেল, কিন্তু বনোয়ারীলাল গেল না। সে সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লজেঞ্চুস্ ও জলছবি বিতরণ করে। চরের ছোটবড় সকলের মুখে এক কথা, বনোয়ারীলাল, বনো দাদা।

বনোয়ারীলাল কঙ্কণকে দেখিয়াছে। প্রতি বছরই তাহাকে দেখে, কিন্তু এবারের দর্শনে একটু বিশেষত্ব আছে। অন্যবার কঙ্কণকে বালিকা বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু এবার হঠাৎ তাহাকে যুবতী বলিয়া বুঝিতে পারিল। মেয়েদের এই পরিবর্ত্তন আকস্মিক, অত্যন্ত অকস্মাৎ ইহা চোখে পড়ে। যে-সরোবরকে বরাবর শূন্য-প্রায় দেখিয়াছি, বর্ষাকালের একটি মাত্র বর্ষণে তাহার এমনই পরিবর্ত্তন ঘটে, ভোরবেলা তাহার পূর্ণতা আকস্মিক রূপে দেখা দেয়। মেয়েদের বয়স সম্বন্ধেও অনেকটা এই কথা বলা চলে। যাহাকে একদিন বালিকা বলিয়া মনে হইয়াছে, হঠাৎ কোথা হইতে কি ভাবে কি পরিবর্ত্তন ঘটে, একদিন সুপ্রভাতের শুভলগ্নে তাহাকে আর চেনা যায় না—সে সম্পূর্ণ যুবতী। কঙ্কণের সেই পূর্ণ রূপটি বনোয়ারীলালের

চোখে পড়িয়াছে, তাই এবার পাটের পালা শেষ হইলেও পাটোয়ারের পালা শেষ হইল না।

বনোয়ারীলাল তারণদাসকে চিনিত, সে পরিচয় কেবল মৌখিক নয়; তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতাও বনোয়ারীলালের অবিদিত ছিল না। একদিন সে তারণদাসের উঠানে আসিয়া দেখা দিল। তারণ তখন ডাকঘরে সরকারী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। বনোয়ারীলাল বলিল—এই যে মুন্সি দাদা, প্রাতঃপ্রণাম। তারপর, চিঠিপত্র কিছু আছে?

তারণদাস অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বসিতে দিল। এই পর্য্যন্ত সে গৃহস্বামীর ভদ্রতা করিল, কিন্তু এবার সরকারী কাজের পালা, তাহাতে ভদ্রতার অবকাশ কোথায়? সে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল—চিঠিপত্র তো নেই ভাই। চিঠি থাকা কি মুখের কথা!

—তা'তো নিশ্চয়। কিন্তু আসবার যে কথা আছে। বড্ড জরুরি। বনোয়ারীলাল বেশ জানে যে, এটা ডাকঘর নয়, কাজেই এখানে চিঠি-পত্রের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও সে বেশ জানে, লোকটা কঙ্কণের পিতা এবং তাহাকে খুসি করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা।

—আচ্ছা, চিঠি পত্র এলে পাঠিয়ে দিয়ো। তারপরে গোবিন্দপুরের খবর কি?

বৃদ্ধ উৎসাহিত হইয়া গোবিন্দপুরের ডাকঘরের সেই শতজনের শতবারবিশ্রুত গল্প আরম্ভ করিল।

—সোনামতি নদীর ধারে গোবিন্দপুর গ্রাম, গ্রামের মাঝে সব্-পোষ্টাফিসের প্রকাণ্ড দালান। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন পুরাতন ঘৃতের মত এ গল্প পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম দ্রুত আর্থিক উন্নতি করিতেছে। গত বৎসরের আটচালা ইতিমধ্যে অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে।)

রোদে পিঠ দিয়া, চক্ষু বুঁজিয়া তারণ গোবিন্দপুরের ক্রম-বিবর্দ্ধমান ডাকঘরের কথা বলিয়া যায়, আর বনোয়ারী অন্যমনস্কভাবে হুঁ দিয়া তাহা শুনিতে থাকে, কিন্তু তাহার চক্ষুর ব্যস্ততা অন্যদিকে। সে গৃহকর্ম্মরতা, আঙিনায় ইতস্তত সঞ্চরমানা কঙ্কণকে যেন দুই চোখ দিয়া গিলিতে থাকে।

এই রকম কিছু দিন ধরিয়া চলিতে থাকিল। কঙ্কণ প্রথমটা ইহা লক্ষ্য করে নাই, শেষে যখন সে বনোয়ারীর ভাবগতিক বুঝিতে পারিল, তখন হইতে সে আর পারৎপক্ষে তাহার সম্মুখে বাহির হইত না। কঙ্কণের এই ভাবান্তরে বনোয়ারীর ভোর বেলা তারণের ডাকঘরে আসা নিতান্ত অকারণ হইয়া উঠিল। তখন কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে কঙ্কণদের বাড়ীর চারিপাশে তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। কঙ্কণ ঘাট হইতে জল আনিতেছে, বনোয়ারী যেন হঠাৎ সেই পথে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে কখনো শিস্ দিতে দিতে, কখনো একটি গান গাহিতে গাহিতে কঙ্কণের বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ভয়ে কঙ্কণের মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বিনয়কে আসিতে চিঠির পর চিঠি লিখিল, কিন্তু একখানা চিঠির‌ও উত্তর আসিল না।

একদিন বনোয়ারীলাল তারণকে বলিল—হাঁ দাদা, তোমার মেয়ের ত বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হয়।

তারণদাস একেবারে চমকিয়া উঠিল। অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের মাঝামাঝি তাহার ভাবটা। যেন জগতে আর কাহারো মেয়ের কখনো কোনোদিন বয়স হয় নাই—যেন এই আকস্মিক বিপদটা তাহার ঘরেই প্রথম দেখা দিল। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে অবাক

হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন সে একটা অভাবিত দৈববাণী শুনিতে পাইল। তারপরে কোন কথা না বলিয়া সোজা রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যেখানে কঙ্কণ কাজে ব্যস্ত ছিল। কঙ্কণ পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, কাজেই পিতাকে লক্ষ্য করিল না। সে এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ভাবে মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া আবার তেমনি নিঃশব্দে দ্রুত ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া সে একেবারে বনোয়ারীর দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—দাদা, মেয়ের একটা বিয়ের জোগাড় করে দাও। বনোয়ারী অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেই জন্যই তো আমি আছি।

আমি সরকারী কাজে সময় পাইনে—তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।

—তুমি কিছু ভেবো না দাদা—।

—কিন্তু আর দেরী নয়, আজই চাই।

বনোয়ারীর মত লোকও শুদ্ধ তাহার এই হাস্যকর ব্যস্ততায় অবাক্ হইয়া গেল। বর কি অত সহজে, 'চাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে' কখনো পাওয়া যায়। কিন্তু অকর্ম্মণ্য লোকের স্বভাবই এইরূপ। প্রকৃতিগত আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা সে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে রাখিতে চায়। বনোয়ারীলাল কোন রকমে তাহার হাত এড়াইয়া, বর খুঁজিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া আসিল। এবার তাহার মনে হইল, অভীষ্টসিদ্ধির পথে সে বারো আনা অগ্রসর হইয়াছে। বর তো তাহার জানিত, এখন তাহার আবরণ মোচন করিলেই হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার কঙ্কণের সঙ্গে বোঝাপড়া আবশ্যক।

কঙ্কণের অবস্থা ক্রমে দুঃসহ হইয়া উঠিল। একদিকে তাহার পিতার অস্বাভাবিক ব্যস্ততা, অন্যদিকে ঐ লোকটার লুব্ধ কৌতূহল, তারণদাসের এখন প্রধান কাজ, দুই বেলা চিঠি বিলি করিবার অবকাশে এবং সুযোগে পাড়ায় ঘরে ঘরে সংবাদ দিয়া বেড়ানো যে তাহার কন্যার বয়স হইয়াছে। সেদিন সকাল বেলা বাদল গোয়াল হইতে গোরু বাহির করিতেছিল, পিছন হইতে তারণদাস হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওরে বাদল শুনেছিস্, তোর দিদিমণির বয়স হয়েছে। বাদল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে একটা গোরু পলাইয়া গিয়া সারাদিন তাহাকে মাঠে মাঠে দৌড় করাইল। আর বনোয়ারী-লালের দৌরাত্ম্যের সীমা নাই। লোকটা এখন তারণদাসের অনুমতি পাইয়া একেবারে দুরতিক্রম্য হইয়াছে। মাঠে ঘাটে যেখানে কঙ্কণকে পায়, ধরিয়া বসে। কখনো তাহার প্রতি কৃপা, কখনো অনুকম্পা, কখনো তাহার পিতার প্রতি সহৃদয়তার ভাব প্রকাশ করে। প্রথমে সে বলিত, কঙ্কণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। একদিন প্রস্তাব করিয়া বলিল—সে নিজেই কঙ্কণকে বিবাহ করিবে। কঙ্কণ কোন উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। লোকটা মোটেই দমিল না, হেলিয়া দুলিয়া গান করিতে করিতে চলিয়া গেল—'খুলিবে দুয়ার সজনী, আসিবে বাসর-রজনী—"।

আমরা, যাহারা শহরের শিক্ষার আবহাওয়ায় মানুষ তাহাদের

পক্ষে গ্রামের মানুষ চরম রহস্যের আকর। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে পারি, দয়া প্রকাশ করিতে পারি, এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে পূজার অবকাশে পশ্চিমে বেড়াইতে না গিয়া গ্রামে গিয়া এক মাস বাস করিয়া গ্রামের উন্নতি সাধনও করিতে পারি। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বুঝিতে পারি না। হৃদয়ের গভীরতা, জীবনের অস্তিত্বের রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের যে কতখানি সে বোধ আমাদের নাই। আমাদের বিশ্বাস জীবন-রহস্যের রসাতলে প্রবেশ আমাদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু যাহারা মাটির কোলে মানুষ, মাটির সহিত সারা জীবন একাত্ম হইয়া আছে, যে-মাটিতে আদিম প্রাণের উদ্গম, যে-মাটি সকল প্রাণের আধার, তাহাদের নিকটে মাটির রহস্য, জীবনের রহস্য যাহার নামান্তর, অতি সহজে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধরা দেয়। হয়তো উচ্চতম শিক্ষাপ্রণালীতেও সে রহস্য বোঝা যায়, কিন্তু আমরা অধিকাংশই অর্দ্ধশিক্ষার দ্বারা নষ্ট।

এই সরল গ্রাম্য বালিকাটির প্রতি আমাদের অনুকম্পা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার ভাবনার গভীরতা হয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য, নয় বিশ্বাসের বাহিরে। জীবনের প্রতিকূলতা—পিতার, বিনয়ের এবং বনোয়ারীলালের, কঙ্কণের বিক্ষিপ্ত হৃদয়বৃত্তিকে বাহির হইতে ফিরিয়া আত্মস্থ করিয়া দিল। সে মনে করিত, লোকে কিসের আকর্ষণে এমন সুন্দর এই চরচিলমারীর দিগন্তর অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া যায়। পৃথিবীর দিগন্তর অবশ্য সে পার হইল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে-দিগ্বলয় আছে, একটার পরে একটা যাহা অনন্তের কুণ্ডলিত নাগপাশে আমাদের দৃষ্টিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে, কঙ্কণ একে একে সেই দিগ্‌রেখা উত্তীর্ণ হইতে লাগিল!

তাহার অসহায় অবস্থা, মানসিক, শারীরিক, বিশেষ তাহার দেহে ক্রমঃস্ফুটমান মাতৃত্বের আভাস—বাহির হইতে ভিতরে তাকাইতে বাধ্য করিল। অসামাজিক এই মাতৃত্বের সূচনায় গ্রামের বা শহরের মেয়ে কি করিত জানি না। কিন্তু কঙ্কণকে ঠিক গ্রামের মেয়ে বলা চলে না—সহরের তো নয়ই। সে চিরদিন সমাজের বাহিরে পালিত, কোন পূর্ব্বসংস্কার তাহার মনে চাপিয়া নাই। জীবনে আমরা দুইদফা সংস্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত। একদফা আমরা রক্তের মধ্যে বহিয়া জন্মগ্রহণ করি, আর একদফা পাই জন্মিবার পরে সমাজের হাত হইতে। দ্বিতীয়টার কোন ভার কঙ্কণের মনে ছিল না। অবশ্য রক্তের মধ্যে একটা সংস্কার তাহার ছিল, কিন্তু তাহা রক্তধারার মতই সহজ এবং সচল। সমাজের সংস্কার দেহের পরিচ্ছদের মত, রক্তের সংস্কার স্নায়ু-উপশিরার লতায়িত জালের মত; জীবনধারণের পক্ষে হয়তো সেটুকু আমাদের আবশ্যক। সংস্কারবিহীন লোক বাঁচিতে পারে না—জীবনের ভিত্তির জন্য খানিকটা পূর্ব্বসংস্কারের প্রয়োজন, যেমন একেবারে সমতল মাটিতে ঘর বাঁধা চলে না, তাহার জন্য একটু স্বতন্ত্র উচ্চ ভিত্তির দরকার। বাহিরের সংস্কার জন্মান্তরে রক্তের সংস্কার হইয়া উঠিতেছে, আর রক্তের সংস্কার বহু জন্মের রক্তধারায় ধৌত হইতে হইতে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া আমাদের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের শূন্যতা যেমন লক্ষ বৎসরের পলিমৃত্তিকার স্তরে উন্নত হইয়া শ্যামল মহাদেশের সৃষ্টির কারণ, আদিম বর্ব্বর মানুষের শূন্য মন তেমনি বহু লক্ষ জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কারের স্তরে আধুনিক মানবকে সৃষ্টি করিয়াছে।

অসামাজিক এই মাতৃত্বের সূচনায় কঙ্কণ লজ্জিত হইল না, ভীত একটু হইল বটে। অপর কেহ হইলে বিনয়ের এই ছলনায় ক্রুদ্ধ

হইত, কিন্তু বিনয়ের প্রতি রাগের ভাব কিছুতেই তাহার মনে আসিল না। বরং কেন যেন, এই আভাস পাইবার পর হইতে বিনয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। বিনয় যে তাহাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়াছে, তাহার যে এখানে আসিবার কোন ইচ্ছাই নাই, ইহা বুঝিয়াও কঙ্কণ বিনয়ের প্রতি প্রতিকূল হইতে পারিল না।

কিন্তু তাহার সব চেয়ে বিস্ময়ের কারণ ওই বনোয়ারীলাল লোকটার আচরণ। তাহার দেহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা তারণদাসের চোখে না পড়িতে পারে, কারণ সে সংসার সম্বন্ধে এক রকম স্বেচ্ছান্ধ। কিন্তু এই লোকটা! সে তো নিশ্চয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। চোখ-মুখের অশ্লীল ইসারায় অনেকবার সে এই তথ্যটা কঙ্কণের সম্মুখেই প্রকাশ করিয়াছে। এমন কি একদিন ইসারা ছাড়িয়া কথায় পর্য্যন্ত আভাস দিয়াছিল। তবে ওই লোকটা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চায়! কঙ্কণের যদি সাংসারিক বুদ্ধি থাকিত, তবে বুঝিত, বনোয়ারীলাল বিবাহের জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়…।

কঙ্কণ এখন আর বাড়ি ছাড়িয়া বড় বাহির হয় না। বনোয়ারীর ভয় তো আছেই, তা ছাড়া চরের অন্যান্য অধিবাসীরা তাহার পিতার মত অন্ধ নয়। ইতিমধ্যেই চারিদিকে কানাকানি হইতেছে, তাহার আভাস সে পায়, বিশেষ বনোয়ারী যখন জানিয়াছে, তখন সকলেই জানিবে। সে সারাদিন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া থাকে; বসিয়া বসিয়া দেখে উঠানের একদিকে জ্বলন্ত গাঁদা ফুলের গুচ্ছ যেন উত্তপ্ত সোনার রৌদ্রের পীতোজ্জ্বল বুদ্বুদের শ্রেণী। ঘনকৃষ্ণ কুলপাতার অবকাশে কচি সবুজ কাঁচা কুলের স্তবক। আর সবচেয়ে প্রিয় ওই মাচার উপর হইতে ঝুলিয়া-পড়া সীমফুলের বেগুনী-লাল গুচ্ছগুলি, এগুলি বিনয়ের বড় প্রিয় ছিল। বিলাতে শরৎকালে শীতের আভাস পড়িবার পূর্ব্বে

কোকিল যখন তপ্ত আকাশের আহ্বানে সুদূর দক্ষিণে চলিয়া যায়, তখন বনে বনে সীম ফুল ফুটিয়া ওঠে। কঙ্কণ বসিয়া বসিয়া ভাবে—কতদূরে সেই দেশ, শীতের পূর্ব্বে বনবনান্তর যেখানে পত্র-পুষ্পের অন্তিম শিখায় এক মাসের জন্য প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে! আর সেই তালীশ্যাম সমুদ্রের সৈকত, শেহলা-ধরা পাথরের উপরে তরঙ্গদল যেখানে দিবারাত্রি মাথা কুটিতেছে! এক দিকে সমুদ্রের নীলাম্বরের প্রান্তে ফেনপুঞ্জের শাদা জরির পাড়, অন্যদিকে নধর শাদ্বলের বিচিত্রবর্ণ নামহারা ফুল, মাঝখানের পীতবর্ণ বালুর চরে কতদিন চারি পায়ের দাগ ফেলিয়া রবিন্সন ক্রুসোর সন্ধানে তাহারা ঘুরিয়াছে। বিনয়ের কাছে-শোনা এই সব কাহিনীর মধ্যে সে নিজের ও বিনয়ের সমাবেশে কত না অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ কল্পনালোক হইতে তাহার দৃষ্টি চরচিলমারীতে ফিরিয়া আসে। সে দেখিতে পায়, শস্যকাটা শূন্য মাঠে কৃষাণেরা আগুন দিয়া পোয়াল জ্বালাইয়া দিতেছে। মাঠের মধ্যে শত শত চিতাকুণ্ডের মত; হেমন্তের সহমরণে যেন শস্যলক্ষ্মী পুড়িয়া ছাই হইতেছেন। শেষগাড়ি ধান কৃষকের আঙিনার দিকে চলিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় পল্লীর বাঁশবনের মাথায় মাথায় কুণ্ডলিত ধূম; ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া গিয়া গ্রামের উপরে একটা শয্যা বিছাইয়া দেয়। আর মনে পড়ে, সেই একবছর আগের বিনয়ের পৌষপার্ব্বণের পিঠা খাওয়ার কথা! সেই জলাশয়ে মাছধরা অভিনয়, তার পরে আরো কত কি! রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিতেছিল, জানকী বহুমূল্য আভরণ নিক্ষেপ করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পরিচয়ের রত্নসেতু বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের জীবনও সেই রকম! মহাকাল যখন চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে উর্দ্ধশ্বাসে অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে,

তখন সে প্রিয়তম স্মৃতিগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। তারপরে অনতিলব্ধ অবসরের মুহূর্ত্তে সেই রত্নসেতুমাত্র অবলম্বনে সে জীবনের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিতে চেষ্টা করে।

কঙ্কণ বাড়ীর বাহির হইত না বটে, কিন্তু বাহির তাহাকে ছাড়িল না। বনোয়ারীর দৌরাত্ম্য ক্রমে ভদ্রতা ও শ্লীলতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল। সেদিন রাত্রে কঙ্কণ শুইয়াছিল, ঘুম আসিতে তাহার রাত্রি অনেক হইত। হঠাৎ সে দুয়ারে গোটা কয়েক আওয়াজ পাইল। সে সমস্তই বুঝিল। শয্যা ছাড়িয়া উঠিল; প্রদীপটি হাতে লইল; ধীরপদে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া বনোয়ারীলাল। কঙ্কণকে দেখিয়া সে আবার হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কঙ্কণের নিষ্পলক চোখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার হাসি অর্দ্ধব্যক্ত ভাবে মিলাইয়া গেল। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে দীপ-মাত্রোদ্ভাসিত সেই একাকিনী অসহায়া বালিকার মুখচোখে কি ছিল, যাহাতে ওই পাষণ্ডটাকে বিন্দুবৎ সঙ্কুচিত করিয়া দিল। সে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্রুত পলায়ন করিল। কঙ্কণ কিন্তু নড়িল না। যেখানে বনোয়ারী ছিল, সেই দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। চোখে তাহার পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, নাসিকায় নিশ্বাস পড়িতেছে না—বাঁমহাতে সেই তৈলাধার দীপ। কতক্ষণ সে এইরূপ ছিল জানি না, যখন তাহার প্রথম নিশ্বাস পড়িল, সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, অমনি তাহার হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া নিভিয়া গেল; সে মূর্চ্ছিত হইয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

ব্রহ্মদৈত্য চলিয়া যাইবার সময় একটা কিছু ক্ষতি করিয়া যায়। বনোয়ারীলাল চর ছাড়িয়া যাইবার সময় এমন একটা কাণ্ড করিয়া গেল, যাহাতে কঙ্কণদের সংসারটা ভাঙিয়া গেল, তারণদাসের মৃত্যুর কারণ ঘটিল।

নদীর স্রোতের অবিচ্ছিন্ন একটানা গতি দেখিয়া কালের ধারা তথা ইতিহাসের গতির একটানা-অবিরতির ভাবটা আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের ধারা মসৃণ-গতিতে একটানা ভাবে একটা হইতে আর একটা ঘটনায় ক্রমবিকশিত হইয়া চলিয়াছে, এবিষয়ে যেন আর কোনো সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু বোধহয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ধারণা পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। ডারবিনীয় যে-ক্রমবিকাশবাদ এই ধারণার মূলে, সেই তত্ত্বের মধ্যেই সন্দেহের বীজ নিহিত ছিল। বীজটা স্বভাবতই ক্ষুদ্র, চোখে পড়ে নাই, কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞানের নবতম গবেষণা এই অঙ্কুরের মূলে আশার বারি সেচন করিতেছে।

ইতিহাসের গতি অবিরাম, তাহাতে তত সন্দেহ নাই, যত ইহার গতির একটানা মসৃণত্ব বিষয়ে। ইতিহাসের ধারা সমানভাবে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ কোথা হইতে কি কারণে তাহাতে একটা অভূতপূর্ব্ব উপাদান আসিয়া পড়ে, যাহাতে পূর্ব্বের সমান গতি হঠাৎ বাড়িয়া গিয়া মসৃণতা ভাঙিয়া দেয়। যে-নদীর স্রোত এপর্য্যন্ত ঘণ্টায় পাঁচ ক্রোশ

বেগে চলিতেছিল, তাহাতে নূতন উপাদান আসিয়া পড়াতে, তাহার গতি ঘণ্টায় দশ ক্রোশের বেগ লাভ করিল। তর্ক উঠিতে পারে, ইহাতে অবিরতি ভঙ্গ হইল কিরূপে? সেটা তর্কের বিষয় বটে! কিন্তু পূর্ব্বের সমান গতি ও একটানা ভাবের ভঙ্গ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাহা যদি না থাকে, পৌর্ব্বাপর্য্যের মধ্যে যদি কালের তারতম্য ঘটে, তবে আর কালস্রোতের একটানা অবিরতিকে ইতিহাসের স্বপক্ষে টানা যায় না। আর কালস্রোতের অদৃশ্য সূত্র ছাড়া ইতিহাসের ঘটনাবলীর আশ্রয় কি? কালস্রোতের অদৃশ্য সূত্রেই তো এই বিনি সুতার মালা গ্রথিত হইতেছে। যাহাকে আমরা আগে পরে, এক সময়ে, অতীত ভবিষ্যৎ বলিতেছি, তাহাতো এই কালস্রোতের মানদণ্ড অনুসারে। অতএব কালস্রোতের মধ্যে, এই দ্বিধা ঘটিলে, ইতিহাসের ঐক্য থাকে না।

গাধা-শ্রেণীর এক জাতীয় জানোয়ার বেশ তো ছিল। কি কারণে কে বলিতে পারে, তাহাদের একদল এমন একদেশে গেল, যেখানে কণ্ঠকে যথাসাধ্য লম্বিত না করিলে উচ্চশাখার খাদ্য পাওয়া যায় না। খাদ্যাভাবে তাহাদের বহু পুরুষ মরিল, আবার বহু পুরুষ পরে তাহারা জিরাফ, গাধা আর নয়। আবার, শৃঙ্গহীন পশুর শিং গজাইল কিরূপে। কি কারণে কে বলিতে পারে, ওরই মধ্যে একটার একটুখানি শিংএর আভাস ঘটিল। তাহারি একান্ত চর্চ্চায় আজ শিংএর কত বাহার এবং ব্যবহার। বানরের পূর্ব্বপুরুষের কোনো চিন্তা ছিল না, হঠাৎ একদলের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, যাহার ফলে আজ মানুষ। ইহাকে আমরা দ্বিধাশূন্য ভাবে freak of nature বলি। প্রকৃতির অকারণ লীলা। লীলাতো অকারণই বটে। প্রকৃতির একটানা একঘেয়ে ছন্দ ভাল লাগে না, সে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ একটা গোলমাল ঘটাইয়া দেয়।

তারপরে আবার নির্লিপ্ত ভালমানুষটির মত চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে থাকে। ঘটনাস্রোত সেই নূতন উপাদানের প্রভাবে নূতনতর দ্বিগুণতর বেগে ছুটিয়া চলে।

মানুষের ইতিহাসেও আকস্মিকতার এই লীলা আছে। মহাপুরুষ কেন যে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিভাবান্ পুরুষের জন্মের কারণ কি, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। কপিলবস্তুর রাজপুত্র কেন গৃহত্যাগ করিল আর মরুভূমির হ্রদের ধারে এত সংসার থাকিতে সূত্রধরের ঘরে কেন যীশুখৃষ্টের জন্ম ? কে বলিতে পারে রুসো বা নেপোলিয়ানের জন্মের কারণ কি ? তাহাদের জীবনের ঘটনাকে ইতিহাসে স্রোতের সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু মূল ব্যাপারটা, তাহাদের আবির্ভাবের তথ্যটা একান্তই অজ্ঞেয়। ইহারাও freak of nature, প্রকৃতির লীলা। ইহারা মানুষের ইতিহাসকে পুরাতন পথ হইতে নূতন পথে চালনা করিয়াছেন—ইহা ততটা সত্য নয়, যতটা সত্য মানুষের ইতিহাসের গতিকে ইঁহারা বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া, তাহার একটানা মসৃণতাকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রতি যুগে এই নূতন লীলার উপাদানে আন্দোলিত হইয়া পূর্ব্বতন গতির অবিরতিকে কতক পরিমাণে অস্বীকার করিতেছে।

ঐতিহাসিক জীবনের সত্য ক্ষুদ্রতর ভাবে ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়। মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের স্থানে শনিরূপে যে আকস্মিকতা বিরাজ করিতেছে সে একদিন অকারণে বিনয়কে আনিয়া কঙ্কণের জীবনস্রোতে ফেলিয়াছিল। আবার আর একদিন বনোয়ারীলালকে আনিয়া দিল। এই দুই নূতন উপাদানের ঘূর্ণাচক্রে কঙ্কণের স্বচ্ছ মসৃণ জীবনধারা বর্দ্ধিতগতি হইয়া নূতন পথে ধাবিত হইল। কোন

দিকে? হয় তো পদ্মার দিকে, হয় তো মৃত্যুর দিকে—হয় তো উভয় দিকেই যুগপৎ।

৬

বনোয়ারীলালের মত দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি সেদিনকার নৈশ অভিযানের পরে নিশ্চিত করিয়া বুঝিল কঙ্কণের আশা ছাড়িতে হইবে। কঙ্কণকে সে ছাড়িবে, কিন্তু একটা ক্ষতি করিয়া যাইবে। কয়েকদিন পরে সে তারণদাসের কাছে গেল। তাহাকে সে বলিল, কঙ্কণের জন্য বরের সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু বরটি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। তারণদাস সমস্ত অবস্থা কি বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। তখন বনোয়ারী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া কঙ্কণের আসন্ন মাতৃত্বের কথা শুনাইয়া দিল। তারণ লক্ষ্যহীন ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল—বয়স হয়েছে যে, বয়স হয়েছে। বনোয়ারী বিষ উদ্গীরণ করিয়া চলিয়া গেল।

তারণ বিকাল বেলা তাহার চিঠিপত্রের সমস্ত দপ্তর লইয়া পদ্মার ধারে নির্জ্জন একটা স্থানে চলিয়া গেল। সেখানে পদ্মার তীর নদীগর্ভ হইতে প্রায় বিশ হাত উঁচু; নীচে বালির চর, জল নাই।

সেই তীরে বনঝাউয়ের আড়ালে বসিয়া একে একে সমস্ত চিঠিপত্র, সযত্নসঞ্চিত তাহার ডাকবিভাগের খাতাপত্র, হিসাব নিকাশ আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিল। সবগুলি নিঃশেষে পুড়িয়া গেলে,

ছাইগুলি সংগ্রহ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। তারপরে ধীরে ধীরে আসিয়া পদ্মার সেই অত্যুচ্চ তীরে দাঁড়াইল। একবার ডাহিনে, একবার বামে, একবার সম্মুখের নীলাভ পদ্মার দিকে চাহিল। আবার ফিরিয়া গিয়া যেস্থানে ভস্মরাশি পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আসিল। সেই উচ্চ ভূমিখণ্ডে দাঁড়াইয়া আর একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, তারপরে সেই অত্যুচ্চ তট হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা চরের একদল জেলে মাছ মারিয়া ফিরিতেছিল। তাহারা সে জায়গা দিয়া যাইতে একটা লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। তাহার নিকটে গিয়া দেখিল তাহাদের ডাকমুন্সি আহত এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা ধরাধরি করিয়া তারণকে নৌকায় তুলিয়া শহরের হাসপাতালে লইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিল। তারণের ঘাড়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছে—মূর্চ্ছা ভাঙে নাই, বাঁচিবার আশা নাই বলিলেই হয়।

পরদিন সকালে তাহার একবার জ্ঞানের মত হইল। ডাক্তার তারণকে চিনিত, সে মাঝে মাঝে ঔষধ লইতে হাসপাতালে আসিত। ডাক্তারকে দেখিয়া তারণ ক্ষীণস্বরে বলিল—পারলাম না ডাক্তারবাবু, আবার ঠকে গেলাম। সঙ্গে একটা হাসি ও খানিকটা রক্ত! ডাক্তার কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—কি ডাকমুন্সী, তোমার ডাকঘরের খবর কি? তারণের মুখে একটা হাসির রেখা যেন ফুটিল, পরক্ষণেই তাহা আবার মিলাইয়া গেল। সে বলিল—খেলা, খেলা, ডাক্তার সাহেব, সব মিথ্যা! কিন্তু ডাক্তার বুঝিল প্রাণের আশা আর নাই।

সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কঙ্কণ আসিল। ডাক্তার

বলিল—মুন্সী তোমার মেয়ে এসেছে। তারণ একবার তাকাইল—আপন মনে বার দুই বলিল—মায়ের তো মেয়ে, মায়ের তো মেয়ে। তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কঙ্কণ পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তারণ আর চক্ষু খুলিল না। বিকালের দিকে তাহার মৃত্যু হইল।

৭

কঙ্কণ বাড়ি ফিরিয়া সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। দীর্ঘ রাত্রিতে একফোঁটা ঘুম আসিল না। চরে বসন্ত রোগের দারুণ মড়ক লাগিয়াছিল, হিন্দুপল্লী হইতে শ্মশানযাত্রার হরিধ্বনি তাহার বিনিদ্র ক্লান্তির সহিত মিশিয়া রাত্রিটা একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল।

ভোর বেলা ঘরের দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া সে নীরবে বসিয়া ছিল। বিনয় আজ তাহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারিত না, কিম্বা একান্ত নিবিড়ভাবে চিনিত, যে-পরিচয় সে আগে কখনও পায় নাই। যে-নদীতে সে জোয়ার দেখিয়া গিয়াছে, আজ দুর্দ্দিনের ভাটার টানে তাহার পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত নৌকাডুবির মরিচা-ধরা নোঙর, ভাঙা হাল, আবশ্যকের কত অনাবশ্যক সামগ্রীর খণ্ডাবশেষ আজ নদীগর্ভে দৃশ্যমান্। কঙ্কণের চেহারায় সেই নদীগর্ভের দৃশ্য। দুঃখে মানুষ বড় বাড়িয়া ওঠে। কিন্তু সে বৃদ্ধি বাহিরে নয়, অন্তরের দিকে। মরুভূমির গাছের বাহিরের প্রাচুর্য্য বেশি নয়, কিন্তু মাটির তলে শিকড়ের স্বাবলম্বী দীর্ঘতা অত্যধিক। কঙ্কণের পরিবর্ত্তন অনেকটা সেই রকমের।

শরীরের দিকে তাহার কৃশতা, কিন্তু চোখের দিকে চাহিলে মনে হয়, জীবন-সরোবরের অনেকখানি তলে সে তলাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অপেক্ষা সমুদ্র উদার, সমুদ্রের অপেক্ষা আকাশ, আর আকাশের অপেক্ষা যদি কিছু উদার, অগাধ অতলগম্য থাকে তবে তাহা মানুষের চোখ, কঙ্কণের চোখ। শ্মশানের দিকে একটি মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল, কঙ্কণ বসিয়া তাই দেখিতেছিল। সে হয় তো ভাবিতেছিল, মানুষ মৃত্যুর পরে ওই পর্য্যন্ত মানুষের সঙ্গে যাইতে পারে, তারপর সব অন্ধকার। জগতে যদি সত্যই কিছু দুষ্প্রবেশ্য থাকে তবে তাহা মানুষের মন। সুখের দিনে তাহার চিন্তার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করা যায়, কিন্তু দুঃখের দিনে তাহা একেবারে দুর্গম।

এমন সময়ে দেখিল বাদল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বাদলকে আনিয়া পাশে বসাইল। আজ দুইদিন তাহার সন্ধান লইতে পারে নাই বলিয়া কঙ্কণের কষ্ট হইল! তাহার মনে হইল এই ক্ষুদ্র বালকটি যতই আত্মীয়, যতই দূরবর্ত্তী হ'ক না কেন, আজ সেই একমাত্র তাহার সহায়। সে বাদলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে করিতে তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কারণ যাহা শুনিল, তাহাতে কঙ্কণের বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল।

বাদল পাড়ায় খেলিতে গিয়াছিল, প্রতিদিনই যায়। খেলার সঙ্গীদের নিকটে তাহার দিদিমণির ছেলে হইবে বলিয়া সে আনন্দ করিতেছিল। ছেলেরা ঠাট্টা করে। বাদল রাগিয়া ওঠে। তারপরে দুইপক্ষে মারামারি। বাদল একা, কাজেই সে বেশী মার খাইয়াছে।

ঘটনা শুনিয়া কঙ্কণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপারটা যে এতখানি রটিয়াছে, তাহা সে জানিত না। যেমন

আগ্রহে সে এইমাত্র বাদলকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। এই আকস্মিক ও অকারণ অনাদরের আড়ষ্টতার কারণ বাদল বুঝিতে পারিল না। সে বারংবার কঙ্কণকে কত প্রশ্ন করিল, কিন্তু সুবিধামত উত্তর পাইল না, কেবলমাত্র দুই একটা হাঁ বা না।

তখন সে দিদিমণির কোল ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না, কঙ্কণ তাহাকে আটকাইল না। বাদল জানিত দিদিমণির অটল গাম্ভীর্য্য কিসে নড়িবে, সে বলিল তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। এই অস্ত্রে সে বহুদিন বহুবার কঙ্কণের রাগ জল করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহাতে কোনো ফল হইল না। কঙ্কণ নীরবে রান্নাঘরের চাবিটি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। কিন্তু বাদল ত রান্নাঘরের চাবি চাহে না, ক্ষুধাও তাহার পায় নাই, সে প্রত্যূষে উঠিয়া এক পেট খাইয়া বাহির হইয়াছিল। চাবিটি লইয়া দুই হাতে সে নাড়িতে লাগিল, কিন্তু এক পাও নড়িল না, তেমনি স্থির ভাবে সেই স্থানে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কঙ্কণ যখন কিছুতেই উঠিল না, বাদল আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিল। সূর্য্য মাথার উপর উঠিল। ইতিমধ্যে সে কতবার কঙ্কণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই, সে যে এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত রহিয়াছে, এই কথাটা কঙ্কণকে না বুঝাইতে পারিয়া তাহার মন ছটফট করিতে লাগিল। এই নিস্ফল অভিমানের তাপে বালকের ক্ষুদ্র চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল।

এমন সময় পাড়ার একটা গোরু ছুটিয়া আসিয়া উঠানের গাঁদা গাছগুলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল ভাবিয়া সে চীৎকার করিয়া গোরু তাড়াইতে লাগিয়া গেল।

গোরুটা কিছুতেই নড়ে না, বাদলও ছাড়ে না। অবশেষে সে একটা লাঠি দিয়া গোরুটাকে দুটা ঘা বসাইয়া দিল। গোরুটা পলাইল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে শিংএর একটা আঘাতে বাদলের বাম বাহুতে রক্তপাত করিয়া দিল। বিষম আঘাতে সে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কঙ্কণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখে বাদলের হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে যন্ত্রনায় চীৎকার করিতেছে। সে বাদলকে উঠাইয়া লইয়া ঘরের দাওয়ায় শোওয়াইল, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। কিন্তু এই দারুণ বেদনা সত্ত্বেও বাদলের মুখে হাসি ফুটিল। তাহার হাসিতে কঙ্কণের সাহস হইল, ভাবিল, আঘাত এমন কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বাদল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু তবু সেই তৃপ্ত হাসির রেখাটি তেমনি তাহার মুখে লাগিয়া রহিল।

সে হাসির অর্থ কি! তাহার আঘাত লাগিয়াছে সত্য; কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাহার দিদিমণির অভিমান ভাঙিয়াছে তাহা ততোধিক সত্য! আঘাতের দরুণ ওই মূর্চ্ছাটি আর ভালবাসার সার্থকতায় ওই ক্ষীণ হাসির রেখাটি; মূর্চ্ছাতুর নৈশদিগন্তের অধরে যেন সকরুণ চন্দ্রকলাখানি।

৮

এতদিন কঙ্কণের যে পরম আশ্রয় ছিল তাহা আর নাই ওই শিশুর মত সরল দুর্ব্বল নিঃসহায় নিঃশঙ্ক লোকটি যে এব

বড় আশ্রয় তাহা সে বাঁচিয়া থাকিতে বুঝা যায় নাই। সে যে কোনরূপ শারীরিক সাহায্য করিতে অসমর্থ কঙ্কণ তাহা জানিত, তবু তাহার উপস্থিতই একটা অক্ষয়-কবচের মত ছিল।

শিশুর এমন একটি অপরাজেয় মহিমা আছে সহজে যাহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তাহাকে আঘাত করিতে গেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে অক্ষয়-কবচের মত অমোঘ হইয়া দেখা দেয়। সেই সহজ স্বচ্ছ মহিমা ছিল তারণদাসের। ইহাকে করুণা বলিতে হয় বল, কিন্তু সেইজন্যই আরো দ্বিগুণ ইহার মহিমা। এই মহিমায় শুধু শিশুকে নয়, আততায়ীকেসুদ্ধ অন্তত এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহৎ করিয়া তোলে।

পাড়ায় তারণের বাড়ীটি সবচেয়ে অরক্ষিত ছিল, কিন্তু কোনোদিন সেখানে চুরি হয় নাই, ছেলেরা কোনোদিন দৌরাত্ম্য করিয়া ফুল ফল তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে আসিত না এমন কি কৃষাণদের গোরু বাছুর পর্য্যন্ত সেদিকে বড় ঘেঁসিত না। শিশুরা তারণকে আপন ভাবিত, বৃদ্ধেরা সম্ভ্রম করিত, যুবকেরা তাহার কাছে ঘেঁসিত না।

কিন্তু এখন কঙ্কণের দুইটি বিপদ। একদিকে তারণদাসের অভাব, অন্যদিকে বনোয়ারীলালের উৎপাত। সত্য বটে, বনোয়ারী চলিয়া গিয়াছে কিন্তু ফিরিয়া আসা আশ্চর্য্য নয়, তা ছাড়া সংসারে বনোয়ারীলালের তো অভাবই নাই। সব চেয়ে ভয়ের কথা তো সেই।

কঙ্কণের উপরে পাড়ার যুবকদের বহুদিন হইতে নজর ছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না, তারণদাসের স্বাভাবিক মহিমাতেই হউক, বা কঙ্কণের অস্বাভাবিক দূরত্বেই হউক এতদিন সে নিরাপদ ছিল।

কিন্তু এবার পাটের দালাল বনোয়ারীলাল আসিয়া যুবকবৃন্দের সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, বিশেষ কঙ্কণের ক্রমপরিস্ফুটমান মাতৃত্বে সকলে তাহাকে আপন বাসনার অগ্নিতে ইন্ধন স্বরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন নির্ব্বোধ বাদল যে-কথা শুনিয়া আসিয়া কঙ্কণকে বলিয়াছিল, তাহা এই দুর্দ্দশার সূচনা মাত্র, শেষ যে কোথায় তাহা ভাবিতেও তাহার রক্ত জল হইয়া যাইত।

তারণের মৃত্যুর পরে কঙ্কণ ভয়ে ও লজ্জায় বাড়ী হইতে বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার বর্গাদার করিম সেখ আসিয়া ক্ষেতের ফসল বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়, আর কোথাও বাহিরে যাইবার দরকার হইলে বাদল যায়। কঙ্কণ সারাদিন ঘরের দাওয়ায় নিস্তব্ধ-ভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিল তাহা তো বন হইতে নয়, কুটির হইতেই। পাড়ার দুঃসাহসী দু' একজন যুবক কঙ্কণদের বাড়ীতে সময়ে অসময়ে দেখা দিতে লাগিল ইহাতে দোষের কিছু আছে, তাহারা বুঝিতে পারিত না; তাহাদের চোখে কঙ্কণ সামান্য একজন পতিতা মাত্র, বারনারী, যাহার প্রতি সকলেরই সমান অধিকার

আগে কঙ্কণ এই সব উৎপাতের প্রতিবাদ করিত। এখন কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কে বাড়ীর পাশ দিয়া গেল, উঠানের মধ্যে কে আসিয়া দাঁড়াইল, অদূরে কে অশ্লীল ইসারা বা গান করিল কোনোদিকে সে মন দিত না। কেবল যখন শ্মশানযাত্রার হরিধ্বনি শুনিত, সে একদৃষ্টে বসিয়া তাহা দেখিত ও মৃত্যুর জন্য কামনা করিত। কিন্তু মৃত্যু তো কাহারো হাত ধরা নয়, যে ইঙ্গিতমাত্রে আসিয়া হাজির হইবে।

সে ভাবিত, এত লোক বসন্তে মরিতেছে, এই চরে, তাহাদের

পাড়ায়, তাহাদের বাড়ীর পাশেই, অথচ যেখানে মৃত্যু, বিভীষিকা নয়—মুক্তির মত কাম্য, সেখানে সে আসে না কেন? মৃত্যুর যদি একটা কোনো নিয়ম থাকিত, তবে এরকম কল্পনার সার্থকতা ছিল। জন্ম যেমন, মৃত্যুও তেমনি একটা খাপছাড়া আকস্মিকতা। অকূল সমুদ্রে কোটি কোটি ঢেউয়ের মধ্যে কেন যে একটা ঢেউ একটু আগে ভাঙিয়া পড়িল, তাহার যদি কোনো নিয়ম থাকে তবে মৃত্যুরও নিয়ম আছে। জন্ম মৃত্যু জীবন তিনই আকস্মিক; আমরা এই তিনকে একত্র করিয়া একটা শৃঙ্খলা রচনার প্রয়াস করিয়াছি। সুতরাং এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ওই তিন আকস্মিক ঘটনা নয় এই অসম্ভবের শৃঙ্খলাপ্রয়াসী আমরা। কাজেই এত প্রয়োজনেও কঙ্কণের বসন্ত হইলনা, আর পাড়ায় বিনা প্রয়োজনে বিনা ইচ্ছায় প্রতি দিন অনেকগুলি করিয়া লোক মরিতে লাগিল।

কঙ্কণের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হইল রাত্রে একাকী গৃহে শয়ন। রাত্রি বেলা বাড়ির আশেপাশে, উঠানে লোকের পদধ্বনি শুনা যাইত, কোনো রাত্রে কে যেন আসিয়া দরজার শিকল নাড়িত, বেড়ায় ধাক্কা দিত। বাদল ছেলে মানুষ সে আর কি করিতে পারে! করিমকে তাহার বাড়িতে আসিয়া শুইবার জন্য কঙ্কণ অনুরোধ করিল। সে কয়েক রাত্রি কঙ্কণের ঘরের দাওয়ায় শুইয়া পাহারা দিল। কিন্তু ব্যাপারটা অশোভন মনে করিয়া তাহাকে আসিতে কঙ্কণ নিষেধ করিল। করিম আপত্তি করিল কিন্তু সে তাহাতে কান দিল না। কঙ্কণ এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল যে শিকল যার খুসি নাড়িতে পারে, কিন্তু অর্গল খোলা তাহার নিজের ইচ্ছার উপর।

কঙ্কণ একাকী ঘুমাইতেছিল। গভীর রাত্রে সে কাহার কণ্ঠ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তারণদাস বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—অন্ধকারে সে পথ দেখিতে পাইতেছে না, কঙ্কণকে আলো ধরিতে অনুরোধ করিতেছে। কঙ্কণ ধীরপদে শয্যা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে করিয়া কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। তাহার মনে হইল, তারণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, সে পিছনে পিছনে পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া আলো দেখাইয়া চলিল।

কঙ্কণকে নিশিতে পাইয়াছে।

নিশি আর কিছু নহে, নিশীথ রাত্রির আত্মা। তখন মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু জগৎ জাগিয়া ওঠে। দিনের বেলা যে-সব বস্তুকে আমরা জড় বলিয়া মনে করি, এই নিশীথ রাত্রে তাহারা সব জাগ্রত হয়। গাছপালা, নদীনির্ঝর, পাহাড়-পর্ব্বত আকাশের তারা এবং পৃথিবীর ধূলি-কণা কিছুকালের জন্য চৈতন্য লাভ করিয়া অবাক ভাবে তাকাইয়া থাকে।

মানুষ যখন জন্মে নাই, প্রকৃতি যখন এই জগতের একমাত্র মালিক ছিল, কিছু কালের জন্য সেই লগ্ন ফিরিয়া আসে। প্রকৃতি বারে বারে মানুষকে ডাকে। নিশি সেই ডাক লইয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষকে ঘুমের মধ্যে জাগিতে হইবে, প্রকৃতির সেই আদিম চৈতন্যের মধ্যে। ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলে

সমস্ত মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু যে ঘুমের মধ্যে জাগিতে পারে সে আশ্চর্য্য এক জগৎ দেখিতে পায়।

নিশীথ রাত্রিই জগতের যথার্থ পটভূমি। দিনের আলো তাহাকে ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত বেশি বোধগম্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। মানুষকে সে আলোকসংশয়িত করিয়া বৃদ্ধের দৃষ্টি দেয়। কিন্তু এই নিশির আহ্বানে মানুষ আবার শিশু হয়, তাহার চোখে প্রকৃতির বাধা সরিয়া যায়, জগতের রঙ্গমঞ্চে সে আর তখন দর্শক মাত্র নয়, সে-ও অভিনেতাদের অন্যতম হইয়া পড়ে।

অন্ধকার নিশীথের মত বিস্ময়কর অদ্ভুত আর কি আছে! আকাশের তারা তখন আলোকবিন্দুমাত্র নয়, শত সহস্র ব্যাকুল দৃষ্টি। বাতাসে কার নিঃশাস গায়ে লাগে, বনের গাছপালা শাখাপ্রশাখা নাড়িয়া নৃত্য করিতে থাকে, মাঠের উপর দিয়া কাহাদের যাতায়াত! দূরে কুকুরের শব্দকে স্বপ্নপুরীর রথের চাকার আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হয়, নদীর তরঙ্গধ্বনিতে সেই স্বপ্নপুরীর সুন্দরীদের কলকণ্ঠ! দিনের পরিচিত সব দৃশ্য অতি-পরিচয়ের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে তাহাদের দলে যোগ দিতে ইসারা করে। সে একপা একপা করিয়া নূতন-চলিতে-শেখা শিশুর মত অগ্রসর হয়, তাহারা হাত তালি দিয়া ডাকিতে থাকে, নিশি নিশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে, পাছে নিশ্বাসের শব্দে তাহার চটকা ভাঙিয়া যায়।

কঙ্কণ পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া চলিল। এ-চলা দিনের আলোর নয়, ইহাতে চেতনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য নাই, এ যেন কোন দৈবের হাতে যন্ত্রের চলা। ডাহিন হাতে প্রদীপটি স্থির, প্রদীপশিখাটির দিকে চোখের দৃষ্টি লগ্ন, তাহাতে পলক নাই। নিশ্চল আলোকশিখায়

তাহার মুখের সম্মুখ ভাগটা, গাল, দুটি ওষ্ঠাধর, কপাল ও বিশেষভাবে নাকের ডগাটি অত্যুজ্জ্বল, আর সব অন্ধকারে লীন।

সমস্ত প্রকৃতি সজীব হইয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। উঠানের গাঁদা গাছগুলি জলন্ত ফুলের চুমকুড়ি দিতেছে, সীমের লতা দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া দিতেছে, কুলগাছের অজস্র মুখর ফলের সম্ভাষণ—সবাই ডাকিতেছে, বলিতেছে, চল, চল, কঙ্কণ আমরাও আছি।

রাত্রিতে জগৎ নিদ্রিত এত বড় মিথ্যা কথা আর কিছু নাই। কান পাতিলে শুনিবে মাটির তলে অসংখ্য কীটের উসুখুসু শব্দ হইতে পৃথিবীতলে অলক্ষ্য জীবনের যাতায়াত। এই সমস্ত প্রাণপ্রবাহ কঙ্কণকে সাথী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। সে শতবার পরিচিত সেই পথ, ক্ষেতের আল, শস্যের ভুঁই, আমের বাগান, শূন্য মাঠ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একেবারে পদ্মার জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে নিশীথ রাত্রির নির্য্যাসের মত পদ্মার অকূল স্রোত! কঙ্কণ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, কি দেখিল জানি না, কিন্তু কি দেখিতে পারিত তাহা বলিতেছি।

সঙ্কীর্ণ গিরিপথের একটি মাত্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বর্ষার দুরন্ত স্রোতস্বিনী যেমন আপনাকে নিঃশেষে নিঃসারিত করিয়া দিবার চেষ্টাতে অজস্র ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করে, তেমনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র তারা সূর্য্য একটি ক্ষুদ্র আকাশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া এই অলৌকিক জ্যোতিষ্কজাল বিস্তার করিয়াছে। ইহার মধ্যে কত স্তরের প্রকাশ! শত যুগের, লক্ষ যুগের, কোটি যুগের, কোটি কোটি যুগের আলোকরশ্মি এক সঙ্গে কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার দৃষ্টি এই জ্যোতিষ্ক-মহলা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, সেখানে আর

কিছু নাই, কেবল নিরঞ্জন নির্ম্মল শূন্য—বিরাট নীলাম্বরীর নীলতম প্রান্ত। আকাশের উত্তর কোণে ওই যে রাশি রাশি কার্পাসস্তূপের মত নীহারিকা পুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কের অবিরাম উদয়াস্তের টানা-পোড়েনে ওই জ্যোতির্ম্ময় অলৌকিক কার্পাস হইতে উর্ণাতন্তুসূক্ষ্ম আলোকময় সূত্র তুলিয়া, এই নীলাম্বরীর ধারে ধারে দু' একটি কল্কা তুলিয়া দেয়, ইহাই আমাদের চিরপরিচিত গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ। কিন্তু সেই নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনবতীর সহিত কোনো জন্মে আমাদের পরিচয় নাই।

কঙ্কণ আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইল! কিন্তু তাহার স্বপ্ন ভাঙিল না। এতক্ষণ সে পিতার অসহায় পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, এবার সে পদধ্বনি মিলাইয়া গেল। তখন সে নত হইয়া পদ্মার স্রোতে দীপটি ভাসাইয়া দিল। অগভীর জলতলের ঘনশ্যাম শেহলার অন্তরালে স্তব্ধ ছোট ছোট মাছগুলির চোখ আলোতে ঝক ঝক করিতে লাগিল। তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীপ ভাসিয়া চলিল—কালো অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা যেন শাদার তালি দেওয়া। ক্রমে আলো মিলাইয়া গিয়া একটি জ্যোতিবিন্দুরূপে তাহার দীপ অকূল পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিল। কঙ্কণ যে ভাবে যে পথে আসিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সেই পথে গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত তবে দেখিতে পাইত, পাড়ার যে কয়েকটি লোক অন্ধকারে মাছ ধরিতে আসিয়াছিল তাহারা তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। এই ঘটনায় তাহার জটিল জীবনজালে আকস্মিকতার আর একটা গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

পরদিন কঙ্কণের নৈশ অভিসারের কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সংবাদটা দুষ্ট শকুনের মত ঘরের একচাল হইতে অন্য চালে উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে কঙ্কণের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। কঙ্কণ অবাক হইয়া গেল। ঘটনা সত্য নয় সে জানে, কিন্তু এতগুলি লোকের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরে তাহা যে মিথ্যা ইহা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। শত্রুপক্ষের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিল, কিন্তু যখন সে শুনিল পাড়ার বৈঠকে স্বয়ং করিমকেও ইহা সকলের সম্মুখে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন তাহার আর কোন ভরসা রহিল না। করিম নাকি বলিয়াছে, সে শেষরাত্রে মাছ ধরিতে গিয়া তারণ দাসের মেয়েকে অতরাত্রে নদীর ধারে দেখিয়াছে ইহার পরে আর ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জগতে সত্য নির্দ্ধারণ এমনি করিয়াই হয়।

ইহার পর হইতে কঙ্কণের শত্রুমিত্র ঘরবাহিরের প্রভেদ ঘুচিয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, তারণদাসের মেয়ের চরিত্র ভাল নয়। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা তাহাকে পথে ঘাটে নানা রকম আকার ইঙ্গিতে অপমান করিত, এবার তাহারা বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে তাহার সহায় ছিল দুইজন, করিম আর বাদল। করিম এখন শত্রুপক্ষের মধ্যে, কারণ তাহার সাক্ষ্যের উপরেই বর্ত্তমান অবস্থাটার ভিত্তি, আর বাদল তো নিতান্ত বালক

কঙ্কণের এখন মৃত্যুই একমাত্র কাম্য। কিন্তু মরণ তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। সেদিন সে পাগলের মত পদ্মার ধারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে তারণ দাস আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জায়গায় আসিয়া কেমন যেন তার চমক ভাঙিল। তাহার মনে হইল, মৃত্যু অবশ্য ইচ্ছা করিলেই আসে না কিন্তু সেজন্য চেষ্টাও তো বেশি করিতে হয় না। এখানেই তো তার পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তখনো সেখানে ডাকবাক্সের ভাঙা এক খানা কাঠ পড়িয়াছিল, চিঠিপত্রের ভস্মাবশেষ, খানিকটা জায়গা ঝলসিয়া গিয়াছে। না তাহার অতটা সাহস নাই, সে অত উঁচু হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারিবে না।

সে ধীরে ধীরে পদ্মার তীর বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। মৃত্যুর কোন অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আছে কি না, এই চিন্তা তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া পন্থা খুঁজিতে লাগিল। তীরের নীচে খানিকটা বালুর চর তার পরেই অগভীর জলস্রোত। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল, স্রোতে ভাসিয়া একখানা ছিন্ন কাঁথা আসিয়া পড়িয়া আছে। বোধ হয়, কোন বসন্ত রোগীর শয্যার অবশেষ। তাহার মনে হইল, এই তো চরে কত লোক বসন্তে মরিতেছে, মরিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই, অথচ তাহার এত আবশ্যক, মৃত্যু তাহার কাছেও আসে না। তখনআবার মনে পড়িল, মৃত্যুর উপায় এত অজস্র এবং সেজন্য চেষ্টাও তো বেশি আবশ্যক হয় না। সে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত নিস্তব্ধ ভাবে ঐ কাঁথাখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে কি মনে করিয়া উঠিয়া গেল। নিকটবর্তী খেজুরের গাছ হইতে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা ভাঙিয়া আনিল। আবার খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপরে পুনরায় উঠিল। কাঁথাখানার কাছে গেল। নিশ্চয় উহা বসন্ত রোগীর শয্যার অবশেষ। তখন সে এক কাজ করিয়া ফেলিল, যাহার মর্ম্ম সে ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারিল না। সেই তীক্ষ্ণ কাঁটা বারংবার ঐ কাঁথাখানায় স্পর্শ করাইয়া বাম হাতের নিটোল কোমল ত্বক ভেদ করিয়া চালাইয়া দিল—কয়েক ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া আসিল ; তাহার প্রথম চমক ভাঙিল রক্ত দেখিয়া, তারপরে হঠাৎ বেদনায়। কাঁটাখানা সে দূরে ফেলিয়া দিল। পদ্মার দিকে চাহিয়া দেখিল—একটা পোড়াকাঠ মন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ওপারের অতিদূরে কূলের কাছে একখানা নৌকার অস্পষ্ট আভাস।

কি সর্ব্বনাশ সে করিয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি হাতখানা সে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিল। নিজেকে আর তাহার বিশ্বাস নাই। ঐ জায়গাটার প্রতি কেমন একটা ভয়ের ভাব তাহার মনে জাগিল—সে দ্রুত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাড়ির দিকে রওনা হইল।

সে রাত্রিটা তাহার ভয়ে ভয়ে কাটিল, পাছে বসন্ত হয়, পাছে জ্বর আসে। রাত্রি কাটিয়া গেল, জ্বর হইল না, ভোর বেলা তাহার মন হইতে ভীতির ভাব চলিয়া গেল। সে যে একটা মস্ত বিপদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, ইহাতে মনে এমন একটা প্রফুল্ল ভাব অনুভব করিল, যেমনটি সে অনেকদিন করে নাই।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার একটু জ্বর হইল ; প্রথমটা সে মনে করিল এমন জ্বর মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। তারপরে গায়ে ব্যথা। দুইদিন পরে অজস্র বসন্তগুটিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। দিন দুই তাহার জ্ঞান ছিল। তারপরে যে কি

করিয়া তাহার একমাস কাটিল তাহা সে নিজেই জানে না। একমাস পরে যখন সে কতকটা সুস্থ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল, সে যে কেমন করিয়া অচিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষার অভাবে বাঁচিয়া গেল, মরিল না, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। একমাস আগের সেই চিন্তা নূতন করিয়া তাহার মনে দেখা দিল—মৃত্যুর জন্য বেশি চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার অজস্র উপায় থাকিলেও যাহার বাঁচিবার সে বাঁচিয়া যায়; মৃত্যু কাহারো নিকটে ইচ্ছা করিলেই আসে না।

১১

বিনয় ভোর বেলা রাজসাহী আসিয়া পৌঁছিল। চৈত্র মাসের ভোরের বেলা যাহারা অনেক দিন পরে বড় সহর হইতে গ্রাম্য সহরে আসিয়াছে, তাহারা জানে ইহাতে কেমন একটা আরামদায়ক স্বস্তি আছে। শ্যামল প্রকৃতির সংস্পর্শে চোখ কান যেন জুড়াইয়া যায়।

বিনয় শিশুকাল হইতে যে-প্রকৃতির কোলে মানুষ, সেই পুরাতন মাতৃ-অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়া যে-শুশ্রূষা পাইল, তাহাতে কলিকাতার বিষদগ্ধ অভিজ্ঞতার গ্লানি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। পৃথিবীর বারো আনা সমুদ্র, বাকি চারি আনার বারো আনা আবার প্রকৃতির অধিকৃত, তাহারি একান্তে কোন রকমে মানুষে বাসা বাঁধিয়াছে। প্রকৃতির অলক্ষ্য সেবার দ্বারা মানুষের জীবন যদি জড়িত না হইত, তবে সে এতদিনে পাগল হইয়া যাইত।

বিনয় বাড়ীতে আসিয়া পদ্মামুখী বারান্দাটায় চেয়ার পাতিয়া বসিল,

দূরে চরচিলমারী, মাঝখানে বিশাল বালুর চর, একপাশে স্বচ্ছ স্রোত। সকালবেলার স্নিগ্ধ বাতাসে ছোট ছোট নৌকা, আমের মুকুলের সুগন্ধ এবং দূর বনান্তের কোকিলের গান ভাসিয়া আসিতেছে।

রাত্রির গরমে বিঘ্নিতনিদ্রা প্রকৃতি এই মাত্র জাগিয়া উঠিয়া অলস ভাবে শয্যার উপরেই যেন বসিয়া আছে, এখনো ক্লান্ত অঞ্চল ও শ্রস্ত বেণী সামলাইয়া লইয়া গৃহকাজের জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

বিনয়ের বন্ধুরা সেদিন নৌকাযোগে সারাদিনব্যাপী বনভোজনে যাইতেছিল। তাহারা ঘাটে আসিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনয়কে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। বিনয়কে তাহাদের সহিত যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। বহুদিন পরে তাহাদের এই অনুরোধ বিনয় কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। বিশেষতঃ যে-পদ্মার সহিত তাহার বহুকালের ও নানা ঋতুর নাড়ির যোগ তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। বিমাতা কলিকাতার আঘাতকে মাতৃস্থানীয়া পদ্মার শুভ্র স্নিগ্ধ হস্তাবলেপের দ্বারা শান্ত করিয়া লইবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বিনয়দের নৌকা নদীর উজান বাহিয়া যাত্রা করিল। এখানকার পদ্মার একটু বিশেষত্ব আছে—নদীটা মাঝখানে চর পড়িয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে; চরটার অপরপারে বড় শাখা,—এ পারেরটা ছোট, গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। এ যেন দুই যমজ বোনের এক জনের বিবাহ হইয়াছে ধনীর বংশে অপর জন পড়িয়াছে সাধারণ গৃহস্থের পরিবারে; একজনের ঐশ্বর্য্যের পার নাই,—অপরের কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

গ্রীষ্মের পদ্মা; দিগন্তবিস্তৃত চরে নদীর স্রোত নানা অংশে বিভক্ত হইয়া বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে; এখনো নূতন নূতন চর

জাগিতেছে ; যে-সব চর শীতের প্রারম্ভে জাগিয়াছিল তাহাদের ধারে জলের প্রান্তে শ্যামবর্ণ উদ্ভিদের রেখা ; বালির উপরে গো-মহিষের ক্ষুরের চিহ্ন ; রাখাল বালকের বালখিল্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ, গরুর গাড়ীর চাকার অত্যন্ত শিথিল চিহ্নরেখা বাতাসে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এক জায়গায় নৌকার একটা লোহার নোঙর। বালির চর বাহিয়া স্বচ্ছ জল অবাধে চিরিয়া নৌকা গুণের টানে চলিতে চলিতে চরায় বাধিয়া ধাক্কা খাইতেছে, সকলে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। পাশেই বালুর চরে জলরেখার কি কারুকার্য্য ; বালির স্তরগুলি কি অপূর্ব্ব কৌশলে বিন্যস্ত, যেন কোন শিল্পী বহু সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এক মনে এই কাজ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার স্বৈরিণী নদী আপনার লক্ষ রকম লীলার চিহ্ন বালুর বুকে রাখিয়া গিয়াছে।

এক হিসাবে জলে ও বালুতে বেশ সাদৃশ্য আছে, উভয়ে গায়ে গায়ে মিলিয়া থাকে, কোন স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিতে পারে না ; জলের উপরে দাগ কাটা যায় না, বালুর উপরে কাটিলেই বা কতক্ষণ ! উভয়কেই যথেচ্ছ আকার দেওয়া যায়। ইহারা দুই-ই যেন শিশুর কল্পনার মত লঘু, স্বচ্ছ, বিচিত্র, এবং ক্ষণস্থায়ী, তেমনি সরল, সুন্দর, শুভ্র এবং সুকুমার। বিনয় জলের দিক হইতে চোখ তুলিয়া তীরের দিকে তাকাইল। উচ্চ বাঁধের তল দিয়া নৌকা চলিতেছে। জেলখানার কাছে একটা বৃহৎ অশথ গাছে লক্ষ লক্ষ রঙীন কিশলয় বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, যেন লক্ষ লক্ষ শিশুর অস্ফুট কলভাষণ। সারিবদ্ধ গুলমোরের গাছে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে অত্যুগ্র রক্তপুষ্পের সম্ভার ; ফুলের রাশিতে পল্লব আচ্ছন্ন। তারপরেই একটা বৃহৎ শিমুল গাছের আপাদমস্তক ফুলে ভরিয়া গিয়াছে ; যেন রক্তবর্ণের তুবড়ি দিয়া দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে। আরো খানিকটা দূরে পলাশের বন;

কালো কালো বৃন্তে কিংশুকের কোমল শিখা বহ্নিলীলা বিস্তার করিয়াছে। গুলমোরে পলাশে শিমুলে যেন বনে দাবানল লাগিয়া গিয়াছে! কবি যে খাণ্ডব-দাহনের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বসন্তকালের অরণ্যেই সম্ভব।

নৌকা চলিতে লাগিল। দুপুরের বাতাসে বালু উড়িয়া আকাশ অন্ধকার; চোখ বন্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে, জলে গামছা ভিজাইয়া গায়ে দিতে হইতেছে, তবু সেদিন বিনয় যে আনন্দ পাইল, যাহা তাহার মনটাকে আজো ভিজাইয়া রাখিয়াছে, হয় তো এ আনন্দ ভবিষ্যতে বাড়িয়াই চলিবে, তাহার হিসাব হয় তো অন্য জিনিষের মত করা চলে না।

ইংরেজিতে আছে সুন্দরী স্ত্রীলোক, ভাল বই ও তাম্রকূটের পরে নদীর মত এমন সঙ্গী নাকি আর নাই। উপরিউক্ত তিনটি বস্তুর মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। এমন কি পুস্তক অপেক্ষা তাম্রকুট-ধূমের সহিত নারীর মিল যেন কিছু বেশী। (পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন, লেখকের অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা এমন কথা বলিয়া নারীর ক্রোধের লক্ষ্য হইব কেন? কিন্তু মনে রাখিবেন, রাগের রংও লাল এবং অনুরাগের রংও লাল; বিশেষ অনেক সময় রাগকে অনুসরণ করিয়া যে ভাব আসে তাহা-ই অনুরাগ, কারণ ভালবাসার উল্টা দিকটায় রেষারেষি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা কোন পন্থাই নয়।)

যাহা বলিতেছিলাম, নারী, নদী, পুস্তক ও তাম্রকূটের প্রধান ঐক্য এই যে, নদীর যেমন উজান ভাটা আছে, অন্য তিনটিরও সেই রকম; অর্থাৎ এ কয়টি পদার্থই নিজের ইচ্ছায় বহিয়া যায়, তবে পাঠক, তাম্রকূটসেবী, নৌবিহারী, এবং হতভাগ্য পুরুষ জাতি ইচ্ছা করিলে কৌশল দ্বারা সেই স্রোতোমধ্যেও যথেচ্ছবিহার করিতে পারে। এই

চারি পদার্থের একটি ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা পুরুষের ব্যক্তিত্বের মত কঠিন ও অনম্য নহে ; ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে যথেচ্ছ বাঁকানো যায় ; ইহারা অবসরযাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও আরামজনক।

বিনয়রা অপরাহ্নের দিকে বসোরা নামে একটা গ্রামে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করিয়া লইল। তারপর আবার নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে-দিকে দৃষ্টি চলে, গাছে গাছে পাটলাভ আমের মুকুল এবং সহস্র বৎসরের স্মৃতি বহন করিয়া তাহার উগ্রমদির গন্ধ। নদীর তীরে সজিনা গাছে শুভ্র স্তিমিত ফুলের স্তবক। যেন আকাশ-সমুদ্রের নীল-তরঙ্গ দিগন্তের উপকূলে প্রহত হইয়া শুভ্রফেনপুঞ্জে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

গুণে আকৃষ্ট হইয়া নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, কোথা দিয়া কোথায় চলিতেছে তাহা কেহই জানে না। তীরে গ্রাম বিরল, কেবল বর্ষার স্তূপাকার বালু, বামদিকে চৈত্রের রৌদ্রে শুষ্ক শূন্য চরে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট শরবনের চিহ্ন ; অসমতল জমি বর্ষার স্রোতের তালে তালে তরঙ্গিত হইয়াছিল, এখনো তেমনি পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে দু'একখানা জেলে ডিঙি, তাহাদের নিকট হইতে পথ জানিয়া লইয়া বিনয়দের নৌকা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এখন আর গুণ টানা চলে না। লগি দিয়া ঠেলা হইতেছে। আকাশের সূর্য্যাস্তের সব রঙটুকু জলের উপর স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। নিস্তরঙ্গ নদী অদূরবর্ত্তী বাঁক পর্য্যন্ত গলিত লাক্ষার মত জ্বলিতেছে। সে রঙে যেন আরো একটু কালো ছায়া মিশিল—আরো একটু—আর এক তুলি—পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত জলতল একটানা একটা বেগুনী রঙের নিস্পন্দ তরঙ্গায়িত চাদর ; এ যেন একটা রঙের নৃত্য চলিয়াছে—ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই ওড়নার

ভঙ্গী নূতন আকার ধারণ করিতেছে, এবার নদীর বর্ণ কপোতের পাখার ন্যায় পাণ্ডুর—ক্রমে ঘন—আরো গাঢ়—এবার যেন বিরাট একখানা বাদুড়ের পাখা—বাদামী এবং ধূসর—কালো এবং পাটল; কত বর্ণের আভাস মাখা; এ যেন বর্ণ নয়—গানের সুর—চোখে ঠিক করিয়া ধরা যায় না—তুলিতে আঁকা আরো দুরূহ; সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া জাল ফেলিতে পারিলে হয় তো ইহার খানিকটা ধরা পড়িতেও পারে। নৌকা একটা মোড় ফিরিতেই বিনয় দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড উঁচু বালুস্তূপের উপর দিয়া সন্ধ্যাতারাটি; তাহারই বা কত বর্ণের চাঞ্চল্য; যেন একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ঝিনুকের খণ্ড; আসন্ন ঝড়ের মুখের জোনাকি; সকাল বেলার স্থলপদ্ম।

প্রকৃতি ও সভ্যতা দুই সপত্নী; একস্থানে থাকিলে বনে না। বিনয় লোকালয়ে প্রকৃতিকে দেখিয়াছে—কিন্তু সেখানে সে মন্দির, মসজিদ, হর্ম্ম্য, অট্টালিকা দ্বারা খণ্ডিতা, মানুষের হাতের চিহ্নদ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিতা; কিন্তু লোকালয় হইতে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে আসিয়া—সে আজ একি দেখিল! শোনা যায়, পুরাকালে কোন কোন নির্জ্জন স্থানে দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করা যাইত—আজ সেই রকম একস্থানে সে আসিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া এক বিরাট সত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা কয়জন লোক—একখানা নৌকাতে—এ যেন তাহার চোখে পড়িয়াও গ্রাহ্য হইল না।

আজ আর প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে চোখে পড়িল না। এই সকলের অন্তরে যে রহস্য আবৃত ছিল—আজ তাহার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী—এই নদীচরের নির্জ্জনতায়, এই সন্ধ্যা-লোকের নিঃশব্দতায় —এই অতিক্ষীণ সন্ধ্যাতারার নিস্তব্ধ প্রদোষালোকে! বিনয় ভাবিতে লাগিল—এ দৃশ্য প্রতিদিন কে দেখে! এ বিচিত্র সৌন্দর্য্যের গভীর

গম্ভীর সুধা প্রতিদিন কাহাকে অমরত্বের স্বাদ জানাইয়া যায়—এমন জন-তৃণতরুহীন বিশ্বলোকের অন্তঃস্থলবর্ত্তী উদারতার মধ্যে সুখদুঃখের অতীত লোকে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-লওয়া উদাসীনতার মধ্যে—কাহার সহিত প্রতিদিন শুভদৃষ্টি হয় প্রকৃতির ! চারিদিকে অনন্ত বালুরাশি—যাহাতে মানুষের চিহ্নটুকুও নাই—আকাশেও না—জলতলেও না—এখানে কেবল আদিমতম প্রকৃতি। আজ লোকালয় হইতে দূরে সেই অত্যন্ত প্রাচীনতম অত্যন্ত সনাতন সত্তার সহিত একি অতর্কিতে একি আচম্বিতে তাহার সাক্ষাৎ। যেমন আদিমতম প্রকৃতি—তেমনি রাগদ্বেষ হিংসা প্রেম বিস্ময় ঈর্ষ্যাবিবর্জ্জিত চিত্তের যে ভাববৈচিত্র্য, তরঙ্গহীন নির্ব্বিকার রূপ—তাহাই এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল—এমন মুহূর্ত্ত কয়টি আসে ! সেই একটি অমূল্য সম্পদ—মহাবিরাটের পদপ্রান্তে প্রণামী রাখিয়া সে চলিয়া আসিল। কে দেখিল—কে না দেখিল জানি না—কাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল—অন্ধকারে কেহ বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি অন্ধকার। এখনও চাঁদ উঠে নাই—নদীর জল অসমান—কোথাও অত্যন্ত গভীর, কোথাও পায়ের পাতাও ভেজে না। পথ চিনিয়া চলা দুষ্কর—অত্যন্ত সাবধান হইয়া লগি মারিতে হইতেছে, যেখানে একেবারেই অচল—সেখানে নামিয়া নৌকা ঠেলিতে হইতেছে, শাদা বালুর চর অস্পষ্টতার মধ্যে জল বলিয়া ভ্রম হয়, আবার জলকে বালু মনে করিয়া বিপদে পড়াও অসম্ভব নয়—অল্প পথ চলিতে বহু সময় লাগিতেছে।

মাথার উপরে অগাধ আকাশমণ্ডল অজস্র তারার ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণবৈচিত্র্যহীন দিগন্তে বালুস্তূপের আড়ালে অষ্টমীর চাঁদ উঠিয়াছে—জলে আলো পড়িয়া অজগরের শরীরের মত মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ

দেখাইতেছে। রাত্রি কত হইবে কে জানে, বোধ হয় মধ্যরাত্রির নিকটে ; অতি দূর লোকালয়ের কাছে শৃগালের ধ্বনি ; চরের জলাশয়ে নিশাচর পাখীর করুণ স্বর—এবং ক্বচিৎ বাদুড়ের অলৌকিক পাখার শব্দ ও বাতাস—আর কোনো শব্দ নাই—দৃশ্য যাহা তাহাও অস্পষ্ট, থাকা-না-থাকার সীমান্তদেশে কাঁপিতেছে।

বিনয়ের মনে হইল, এই মধ্যরাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া ওঠার মত এমন বিস্ময়কর ব্যাকুলতা বুঝি আর কিছু নাই। মাথার উপরে ইটপাথরের ছাদ নয়—একেবারে গ্রহতারকার লীলাক্ষেত্র ; ওখানে স্তরে স্তরে লক্ষযুগের আলো জমাট হইয়া বিরাজ করিতেছে—বর্ত্তমান বলিয়া যে অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মোহ আমাদের ঘরের কোণে সর্ব্বদাই মহাকালকে অবজ্ঞা করিয়া বিরাজ করে—সেই বর্ত্তমান ওখানে নাই, কোটি কোটি সূর্য্য-শশীর কিরণে ভাস্বর হইয়া—অতীতকাল ওখানে প্রত্যক্ষমান ; আর মহাসম্ভাবনার সূচনা বহিয়া বিপুলতর ভবিষ্যৎ তাহারই গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া ; বর্ত্তমানের সেই সূচিতীক্ষ্ণ অব্যর্থ ধারা তাহাদের বিভিন্ন করিয়া, বিদেশী করিয়া রাখে নাই। বিনয় অনেক বার মধ্যরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিতেই মনে মনে নূতন সম্ভাবনার একটা বিষম ধাক্কা খাইয়াছে—গভীর অন্ধকারের ঢেউ তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এমন বিরাট গম্ভীর রূপ অল্পই আছে—হিমালয়ের আর মধ্য-রাত্রির রূপ অনেকটা এক রকম ; হিমালয়ের উপরে যে মধ্যরাত্রি সে না জানি কি অলৌকিক, কি অভিনব, কি আশ্চর্য্য !

বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ রাত্রি সজীব, জীবন্ত ; মানুষকে ঘুম পাড়াইয়া প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে—তারায় তারায় তাহার নিঃশ্বাসের স্পন্দন। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, প্রকৃতি চলিতেছে, আকাশের

তারায় এবং পৃথিবীর শিশিরে, মাটির গন্ধে এবং নক্ষত্রলোকের সঙ্গীতে, বায়ুমণ্ডলের নিস্তব্ধতায় এবং জলতলের স্তম্ভিত বিস্ময়ে, শৃগালের ধ্বনিতে এবং নিশাচর পাখীর অস্পষ্ট পাখার কম্পনে। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ রাত্রি চলিতেছে.—এই নদীস্রোতের নিঃশব্দ সঞ্চরণে; ওই অতিদূর নভস্তলের নক্ষত্ররাজির অলোকসম্ভব অলৌকিক রহস্যলোকযাত্রার তালে তালে। কালপুরুষের কটিবন্ধ ও তরবারি—নত হইতে হইতে একেবারে ঝুলিয়া পড়িয়া দিগন্তরেখা স্পর্শ করিল; সপ্তর্ষি ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মানস সরোবরে পূজাপদ্ম চয়নে অবতরণের জন্য উদ্যত। কে যেন তাহাকে বলিল—একবার কান পাতিয়া শ্রবণ কর—জ্যোতির্ময় অন্ধকারের আবরণের নিম্নে কি আশ্চর্য্য সঙ্গীত; ইহা শুনিবার পক্ষে শুধু কানই যথেষ্ট নহে—যদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একত্র করিয়া কর্ণকুহরে পরিণত করিতে পার—যদি নিজেকে ওই অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী আলোকের সুরে বাঁধিতে পার, তবে শুনিতে পাইবে, দেখিতে পাইবে, সেখানে দর্শন ও শ্রবণে প্রভেদ নাই—সেখানে সুর দৃশ্য এবং বস্তু শ্রবণযোগ্য। তাহার মনে হইল, সে যেন কোন্ রহস্যময় অন্তর্লোকে যাত্রা করিয়াছে মাথার উপরে তারা, চারিপার্শ্বে তারা—জলতল যেন শত সহস্র তারায় কণ্টকিত। ওইযে দূরে দূরে দিগন্তের ধারে ধারে তারার মত, তাহার মধ্যে কোন্‌টি আকাশের তারা এবং কোন্‌টি পৃথিবীর দীপ কে বলিয়া দিবে! কে বলিয়া দিবে, উহার মধ্যে কোনটি তাহাদের ঘাটে তাহাদের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়া ইঙ্গিত করিতেছে! আজ এই দুটির মধ্যে আর ভেদ করিতে সে পারিল না, যে-সত্য মিথ্যাকে দূরে রাখিয়া আপনার পবিত্রতা বাঁচায়—তাহাও সত্য নহে কারণ সে মিথ্যাকে ভয় পায়—যে বিরাট সত্যমিথ্যা দেবদৈত্য জীবনমৃত্যু স্বর্গমর্ত্ত্য এবং আকাশের তারা ও পৃথিবীর দীপকে

আপনার মধ্যে সমন্বয় করিয়া মহত্তম—আজ খেলা করিতে বাহির হইয়া—বিনয় তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, অতি অতর্কিতে অত্যন্ত বিনা সাধনায় এ খেলার স্মৃতি চিরন্তন হউক, পরিবর্ত্তনকে সে ভয় করে না—যখনই রাত্রির চন্দ্রতারাখচিত অন্ধকারের মণিমঞ্জুষাটি খুলিবে তখনই সে দেখিতে পাইবে, বিরাটের এই অতি অমূল্য স্বাক্ষরকরা অঙ্গুরীটি এবং তাহার গাত্রে তাহার এই নৌ-যাত্রার বন্ধুদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং বন্ধন, সখ্য এবং সৌহার্দ্দ্য ; মানুষের তুচ্ছতা সেখানে প্রবেশ করে না, কালের সিঁধকাঠি সেখানে পৌছিতে পারে না—মহাকাল স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মণিহারের মধ্যমণিটি করিয়া গাঁথিয়া লন ; এমন খেলার দিন জীবনে কয়টি আসে !

১২

সেদিন বিকালে সদ্য রোগমুক্ত কঙ্কণ ঘরের দাওয়ায় একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল। রোগ তাহার সারিয়াছে এইমাত্র। শরীর তেমনি দুর্ব্বল ও কাতর। ভীষণ ব্যাধি তাহার সর্ব্বাঙ্গে করাল ছাপ আঁকিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দুর্ণিবার ব্যাধির আক্রমণ হইতে মানুষ বাঁচিয়া উঠিলে, তাহার মনে একটি অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়, একটি শৈশবের ভাব। দেহ ও মনের গ্লানি কাটিয়া গিয়া জীবনটি মেঘনির্ম্মুক্ত প্রাতঃকালের মত শিশিরে শিশিরে ঝলমল করিতে থাকে। পুরাতন জগৎ যেন হঠাৎ নূতনভাবে তাহার চোখে ধরা পড়ে। শিশুর মতই তাহার কৌতূহল,—রঙীন

একখানি পাখীর পালক ইন্দ্রধনুর অসামান্যতা লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। কঙ্কণ সেই ব্যাধিবিমুক্ত শৈশবের দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে দেখিতেছিল।

এমন সময়ে বাদল ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বিনয় আসিতেছে। বিনয় আসিতেছে! আগে হইলে কঙ্কণ এ খবর কখনই বিশ্বাস করিত না, কিন্তু আজ তাহার সম্ভবঅসম্ভব-বর্জ্জিত শিশু-মনের কাছে কিছুই অপ্রত্যাশিত বোধ হইল না। বরঞ্চ তাহার মনে হইল, এইতো তিন চারিদিন আগে সে শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষ্যে সারাদিন অনাহারে ও সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছে—ইহার পরও বিনয় যে আসিবে না—ইহাই তো বিস্ময়ের। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল, দূরে চরের মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি, বিনয় বটে; দশ মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছিবে। কঙ্কণ বাদলকে খেলা করিবার জন্য পাড়ায় পাঠাইয়া দিল।

বাদল চলিয়া গেলে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল, একটু সজ্জিত হইয়া বিনয়ের সম্মুখে বাহির হওয়া আবশ্যক। হায়, এই দুঃখের মধ্যেও, এই দুর্দ্দশাতেও! ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যেদিন রামচন্দ্রের সৈন্যসমাগমে লঙ্কার উত্তর দ্বার চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, অশোকবনে একবেণীধরা সীতাদেবী কখন্ নিজের অজ্ঞাতসারে একটি পুষ্পমঞ্জরী চয়ন করিয়া অলক্ষ্যে কেশে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন—সেওতো এমনি দুঃখের দিনে—এমনি দুর্দ্দশাতেই। আর দ্রৌপদী তো জানিয়া শুনিয়াই, পঞ্চ স্বামীকে নিশ্চিত বিপদের মুখে স্বর্ণপদ্ম আহরণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন! নদীকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে নিম্নগা, ধূমকে জিজ্ঞাসা কর কেন সে উর্দ্ধগামী? তাহাদের স্বভাব! ভূষণপ্রিয়তা নারীর তেমনি স্বভাব! নারীকে মনের মত করিয়া

সাজাইবার জন্যই পুরুষের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, এত পরিশ্রম। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের মূলে পঞ্চপাণ্ডবের পৌরুষে আঘাত,—কুরুসভায় নিরাভরণা দ্রৌপদীর অসহায় চিত্র! আর রামায়ণের সাগরবন্ধন ও লঙ্কাকাণ্ডের মূলেও সেই একই কথা! জানকীর পরিত্যক্ত রত্নভূষণগুলি একে একে রামচন্দ্রের চোখে জলন্ত অঙ্গারের দীপ্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। জানকী নিশ্চয় জানিতেন—যে-পাষণ্ডের জন্য তাঁহাকে নিরাভরণ হইতে হইল, তাঁহার বীর স্বামীর হস্তে তাহার নিষ্কৃতি নাই।

কঙ্কণ বাক্স খুলিয়া সযত্নরক্ষিত সেই বাসন্তী রংএর শাড়ীখানি বাহির করিল, যেখানা সে গতবার দোলের দিনে পরিয়াছিল, সেই বহুস্মৃতি-বিচিত্র শাড়ি। শাড়িখানি পরিয়া আরসীখানা হাতে লইল, এতকাল তাহা অনাদরে দেয়ালে টাঙানো ছিল। আরসীখানা মুখের সম্মুখে ধরিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। হাত নড়ে না, মুখ সরে না! দর্পণে এ কার ছায়া? এই কি কঙ্কণ? কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইল না, ওই ছায়াটা তার, সে দর্পণের মধ্যে ইতস্তত তাহার নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজিতে লাগিল! কিন্তু বারবার সেই একই ছায়া!

এই প্রতিবিম্ব তাহার! ওই বসন্তের দাগে ভরা, ক্লিষ্ট, কালো, শীর্ণ, মুখখানা! জলকণা-বর্ষণোন্মুখ আসন্নবৃষ্টি মেঘের মত তাহার কেশজাল, সে কি ওই? ওই তাম্রশলাকার মত রুক্ষ খিন্ন চুলগুলা? কপোলে কালিমা, শুষ্ক অধর, শীর্ণ গ্রীবা—আজ তাহাকে এই রূপে বিনয়ের সম্মুখে বাহির হইতে হইবে! কেবল চোখ দুটি, হিমালয়ের উচ্চ পাহারায় আবদ্ধ নীলাভ মানস সরসীর মত তাহার চোখদুটি অতীতের আভাস দিতেছে! কিন্তু পূর্ব্ব রূপের আর কিছুই বাকি নাই। তখন দেখিতে দেখিতে সেই অতল স্পর্শ চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, চোখ

ছাপাইয়া সে-অশ্রু গাল বাহিয়া, গ্রীবা বাহিয়া বুকের উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া, অবশেষে অবিরল ধারায় ঝরিতে লাগিল। রোগে তাহার কি সর্ব্বনাশ না করিয়া গিয়াছে!

একদিন স্বেচ্ছাকৃত এই রোগকেই সে মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাকে আমরা যেখানে আসিয়া থামিতে বলি, সে তো সেখানে থামে না। এই রোগ অবশ্য তাহাকে নানা বিপদ হইতে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু একি সর্ব্বনাশ সে করিয়া গেল! এতখানি তো সে চাহে নাই।

কঙ্কণ পাষাণমূর্ত্তির মত দর্পণখানা সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাষাণের যদি অশ্রু থাকে, তবে সে পাষাণমূর্ত্তিই বটে!

না, না, এই রূপ লইয়া বিনয়ের সম্মুখে আজ সে বাহির হইতে পারিবে না। বিনয় যে-রূপের স্মৃতি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, যাহার আকর্ষণে সে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে, এইরূপ দেখিলে তাহা যে বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে, কঙ্কণের পক্ষে তাহা দুঃসহ! বাস্তবে কি হইবে কে জানে, কিন্তু ইহার কল্পনামাত্রেই কঙ্কণকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

সে কিছুতেই ওই আয়নাখানির দিকে চাহিবে না কিন্তু অনিচ্ছাতেও বারংবার তাহার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন আয়নাখানা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু চোখের জলের আর শেষ নাই, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল।

বাহিরে পদশব্দ; ভয়ে তাহার শরীর হিম হইয়া গেল। একবার তাকাইয়া দেখিল, দরজার অর্গলবদ্ধ আছে কিনা! 'বাহিরে পদশব্দ, এ পদশব্দ তাহার বহু দিনরজনীর কর্ণধ্যানে মুখস্থ। বিনয় বাড়ীতে

কাহাকেও না দেখিয়া একবার বাদলকে ডাকিল! কোনো সাড়া নাই। কঙ্কণ এতদিন ভয় করিত পাড়ার ওই যুবকদের, আজ ভয় তাহার সকলের বেশী চির-জীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন ওই বিনয়কে। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ দেখিয়া বিনয় বুঝিল কঙ্কণ ভিতরে। সে কঙ্কণের নাম ধরিয়া ডাকিল। সে আহ্বান কঙ্কণের মর্ম্মে গিয়া তপ্ত স্মৃতির লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল—কিন্তু সে কিছুতেই আজ বাহির হইবে না।

বিনয় প্রথমে ঠাট্টার স্বরে তাহাকে ডাকিল, তারপরে বহুদিন অনুপস্থিতির জন্য মান ভাঙাইতে লাগিল—তারপরে অভিমানের স্বর! কিন্তু না আছে সাড়া, না খোলে দুয়ার। ভিতরে শাড়ির খস্‌খস্ শব্দ, লোক আছে নিশ্চয়—কিন্তু বন্ধ দুয়ার বন্ধই রহিল।

বিনয় ক্লান্ত হইয়া দরজার কাছে দাওয়ার উপরে বসিয়া পড়িল। কঙ্কণ তাহা বুঝিল—তাহার মনে কি হইতেছিল! সে ভাবিতেছিল, মাণিক আমার, তুমি বাহিরে ওই ধূলার উপরে বসিলে, আমার বুকের উপরে বসাইলেও যাহাকে যথেষ্ট সমাদর মনে করি নাই,—সে আজ ধূলায়! একবার তাহার মনে হইল বাহির হইয়া যায়—কিন্তু তখনই আয়নায় ছায়া পড়ে। বিনয় রাগ করিয়া আজ ফিরিয়া যায় সেও ভাল, কিন্তু তাহার রূপ-বুভুক্ষিত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া গেলে সে আর ফিরিবে না!

—কঙ্কণ, লক্ষ্মী, দরজা খোলো—

কোন শব্দ নাই।

—আমি দোষ করেছি, মাপ কর, ক্ষমা কর,—বিনয় দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।

কঙ্কণ আজ পাষাণ! তাহার সমস্ত দেহমন প্রাণ দিয়া বিনয়ের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু ওই প্রতিবিম্ব

সে পথে তীক্ষ্ণ কণ্টক। বিনয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে শুনিতে পাইত, ঘরের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার শব্দ! এপারে বিনয়ের চোখে জল, ওপারে কঙ্কণের সর্ব্বাঙ্গ অশ্রুসিক্ত, মাঝখানে অটল অচল অর্গলিত রুদ্ধ দ্বার।

উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতার কাছাকাছি আনিয়া কে এমনভাবে তাহাকে পঞ্চমাঙ্কের নিষ্ফলতায় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল! তৃতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ আলোতে ঘরের ছায়া উঠানে গাঁদা গাছের উপরে পড়িল, অদূরে লেবুফুলের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ বাতাস আসিতে লাগিল—আর দূর বনের কোকিলের গান লক্ষযুগের বিরহ-মিলনের স্মৃতির স্তর ভেদ করিয়া অক্ষয় তূণের অফুরন্ত সায়কের মত অবিরল ধারায় উভয়ের কানে পৌঁছিতে লাগিল। বাহিরে যখন মিলনের এমন পূর্ণ আয়োজন, তখন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাধা, না জানি সে বাধা কেমনতর দুর্লঙ্ঘ্য।

কঙ্কণ কাঁদিতেছে, বিনয় কাঁদিতেছে, দুজনের ইচ্ছা দুজনের কাছে ছুটিয়া যায়, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ! মানুষের সুখসৌভাগ্যের কোঠায় যে শনিগ্রহ চিরদিন বিরাজ করে, একি তাহারই লীলা! মিলনের কূলে আনিয়া যে ঠেলা মারিয়া অকূলে ঠেলিয়া দেয়, আসন্ন অধর হইতে যে ছোঁ মারিয়া চুম্বন কাড়িয়া লয়, মিলনের পূর্ণ পাত্রকে যে ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে থাকে, তপ্ত অশ্রুকে যে তুষারকণায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ছিনিমিনি খেলে, আর বহুদিনবাঞ্ছিত বল্লভকে দ্বারে উপনীত করিয়া দরজার অর্গল টানিয়া দেয়! এই দুইটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ পতঙ্গ-প্রাণ জীবকে আশার পাত্র দেখাইয়া, এত নিকটে আনিয়া এ কী তাহার খেলা! এই মুমূর্ষু জীবের কণ্ঠে আকস্মিকতার নির্ম্মম পাশ কষিতে কষিতে সে হাসিতে লাগিল। সে নির্ম্মম নিষ্পেষে যতই তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, ততই তাহার হাসি উচ্চতর হইতে থাকে! বিধাতা,

তুমি না মানুষকে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছ, মন দিয়াছ, কোন্ দানব সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলে!

অবশেষে বিনয় উঠিয়া পড়িল, তাহার পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। কঙ্কণের কানে তাহা প্রবেশ করিল। সে ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, ঘরের শুষ্ক ধূলি ভিজিয়া গেল, কিন্তু দয়াময় বিধাতার অবিচলিত মনস্তত্বের একটুও নড়চড় হইল না।

বিনয় চলিয়া গেল। কঙ্কণ পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কঙ্কণ উঠিয়া পশ্চিমের জানালা খুলিল। দেখিল দূর দিগন্তের স্বর্ণবহ্নির বিলীয়মান পটে একটা দিবস অস্ত যাইতেছে আর সেই উজ্জ্বল পটভূমিতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ কৃষ্ণরেখামাত্র মনুষ্য-মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি যেন আর পৃথিবীর নয়—ওই সূর্য্যাস্ত-জগতের! কঙ্কণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল!

বাহিরে তখন তৃতীয়ার চাঁদের আলো, লেবু ফুলের গন্ধ আর বহু যুগের বহু সুখদুঃখের নির্য্যাসের মত ওই কোকিলের কুহুস্বর! ঘরের মধ্যে সেই আয়নাখানা চাঁদের আলোয় এক বিন্দু অশ্রুর মত নিরপেক্ষ বিধাতার চক্ষুতে ছলছল করিতে লাগিল।

১৩

রাজসাহী কলেজের বিস্তীর্ণ নির্জ্জন হাতা শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট, একখানি ছবির মত দেখাইতেছে—অর্দ্ধেক স্বপ্ন, অর্দ্ধেক সত্য। কলেজের পুরাতন অট্টালিকার ছাদের উপরে নারী-

মূর্ত্তিগুলি দীর্ঘছায়াসনাথ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—জ্যোৎস্নার আর একটু সঞ্জীবনী স্পর্শ পাইলেই যেন তাহারা জাগিয়া উঠিবে। বৃহৎ বাড়ির কার্নিস, আলিসার খাঁজে খাঁজে আলো-অন্ধকার। সম্মুখে বাগান-ঘেরা পুষ্করিণী। বাগানের শাদা রঙের ফুলগুলি, রজনীগন্ধা কামিনী, চোখে পড়ে; রঙীন ফুলগুলি এখন কেবল গন্ধ-অনুমান ইতস্তত আলোছায়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। মসৃণ নির্ম্মল রেখামাত্রহীন জলতল—তাহার উপরে নিস্তব্ধ চিক্কণ চন্দ্রালোক। লিচু গাছগুলির তলদেশ শুষ্ক মঞ্জরীর ভারে আকীর্ণ। আমের বন মুকুলে আক্রান্ত। প্রশস্ত মাঠে শ্যামল ঘাস, পায়ে-চলা পথগুলি নূতন ঘাসে ঢাকিয়া গিয়াছে। সমস্ত নির্জ্জন। কেবল মাঠের মধ্যে ইতস্তত দুচারটি মনুষ্যমূর্ত্তি শ্বেতবস্ত্রের দ্বারা আভাসিত।

বিনয় চর হইতে ফিরিয়া এখানে একাকী ঘুরিতেছিল। সে নির্জ্জনে মনের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করিয়া লইতে চায়। কঙ্কণ কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল? শুধু কঙ্কণ তো নয়, পারুলও তাহাকে অপমান করিয়াছে। পারুল ও কঙ্কণ, তবে কি সকলেই একই মাটিতে গড়া। না, তাহাদের কাহাকেও আর নয়।

শৈশব হইতে সে প্রকৃতির কোলে মানুষ। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ অপেক্ষা নিস্তব্ধ প্রান্তরের প্রকৃতির রূপ তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে, বেশি সঙ্গদান করিয়াছে। তখন কোথায় ছিল পারুল, কোথায় ছিল কঙ্কণ! আজ তাহারা অবশ্য অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একদিন ছিল যখন নারীর সঙ্গ তাহার পক্ষে প্রয়োজন ছিল না। আবার কি সেই প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়!

কে বলিল, সম্ভব নয়! এই তো গতকল্য মাত্র, সে নৌ-ভ্রমণে

গিয়া প্রকৃতির কি মহার্ঘ্য রূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছে। সেই বরাভয় ইঙ্গিত তাহার মনে আশার বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল।

শৈশব হইতে সে নিঃসঙ্গ থাকায় প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখিতে শিখিয়াছিল। তারপরে জীবনের জটিলতা যত বাড়িয়াছে, নানা স্রোতের ধারা যত তাহার জীবনে মিশিয়াছে, মানুষকে যত বড় করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততই সেই বাল্যের সহচর মূর্ত্তি দূরে সরিয়া গিয়া ছোট হইয়া আসিয়াছে। আগে প্রকৃতি যেখানে একাকী ছিল, সেখানে মানুষ আসিয়াছে। ক্রমে মানুষ বড় হইয়া উঠিয়া প্রকৃতিকে পটভূমিতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। ইহাতে সে কোন অতৃপ্তি বোধ করে নাই, বরঞ্চ ইহা জীবনের পরিণতি মনে করিয়া সে সন্তুষ্ট ছিল।

কিন্তু কাল লোকালয় হইতে দূরে গিয়া প্রকৃতির সে বিরাট রূপ দেখিল, যে-রূপ মানুষের সহিত অমিশ্র, তাহা বিনয়কে পুনরায় আবাল্যের সেই সত্তাকে মনে করাইয়া দিল।

যে মানুষের কাছে তাহার সবচেয়ে বেশি দাবী, সবচেয়ে বেশি আশা, তাহার কাছে আজ এই প্রত্যাখ্যান। তাহার মনে হইল, আজিকার এই প্রত্যাখ্যানের কথা প্রকৃতি যেন জানিতে পারিয়াছিল, তাই সে বিনয়কে একবার অসম্ভাবিত রূপে দেখা দিয়া সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিল। সে যেন বলিয়াছিল, ভয় নাই, মানুষ না থাকে আমি আছি। না, সে বলিয়াছিল, মানুষ নাই, আমিই আছি।

আর কেহ হইলে পারুল কঙ্কণের এই যুগল প্রত্যাখ্যানের পর অদ্ভুত একটা কিছু করিয়া বসিত। কিন্তু বিনয়ের জীবনের সমগ্র ভারকেন্দ্র মানুষের দ্বার হইতে বিচলিত হইয়া প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লাভ করিল। বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল—বাঁচিয়া গেলাম,

আহা বাঁচিয়া গেলাম! তাহার মনে হইতে লাগিল—মানুষকে কি জন্য প্রয়োজন? শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সুখ, নিসঙ্গতায় সঙ্গ, পরস্পরে ভালবাসা, এই তো! প্রকৃতির হাত হইতে কি সে এ সব দান পায় নাই! বরঞ্চ আরো বেশি পাইয়াছে। প্রকৃতির প্রেমে দ্বন্দ্ব নাই, সে ফিরিয়া আঘাত করে না—তাহার মত এমন বিশ্বস্ত প্রণয়ী আর কে আছে?

সে মনে করিল, আর একবার তাহাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এখানে লোকালয়ে লাজুক প্রকৃতি খণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধেক মাত্র, তাহার বাণী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যেখানে প্রকৃতি নিঃসপত্ন, যেখানে সে একক মাহাত্ম্যে মহীয়সী—সেইখানে গিয়া তাহার শুশ্রূষা লাভ করিতে হইবে। সে স্থান একমাত্র হিমালয়।

হিমালয়ের কথা মনে পড়িতেই বিনয়ের হৃদয় সেই বহুকালবাঞ্ছিত-দর্শন দেবতাত্মা গিরিরাজের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, ভারত ইতিহাসের সান্ত্বনা—অমৃতের ওই অফুরন্ত ভাণ্ডারীকে। ভারতবর্ষের যেখানে যে কেহ ব্যথিত শোকার্ত্ত হইয়াছে, সে-ই হিমালয়ে গিয়াছে। তবে কেন সে না যাইবে! হিমালয়ের চিন্তামাত্রে সদ্যপ্রাপ্ত দুটি ক্ষতে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল! তাহার মনে হইল যাহার চিন্তায় মাত্র এত সান্ত্বনা, তাহাকে দর্শনে না জানি কি আনন্দ!

বিনয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতা হইতে রাজসাহী, রাজসাহী হইতে হিমালয়। প্রকৃতি ক্রমে গাঢ়তর রূপে তাহাকে কোলে টানিয়া লইতেছে। তখনি সে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল, পরদিন সে যাত্রা করিবে। দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে পারুল ও কঙ্কণের কল্পনা এমন হাস্যকর ভাবে তুচ্ছ, যে তাহা মনে পড়িয়া বিনয়ের হাসি পাইতে লাগিল।

হিমালয়

১

বিনয় সন্ধ্যার সময় দার্জ্জিলিং পৌছিয়া ন্যাশনাল বোর্ডিঙ নামে একটি হোটেলে উঠিল। ম্যানেজারের আদেশে যে ঘরে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাতে আর একটি ভদ্রলোক ছিল। বিনয়ের চোখে লোকটিকে অদ্ভুত মনে হইল। তাহার একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

লোকটি বিশালকায়, বিপুলোদর, প্রচুর দাড়ি পাঠানের মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই কানের সহিত জড়ানো। বিধাতা যে হাতে ম্যামথ, জলহস্তী, গণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন, লোকটিও সেই অনভ্যস্ত শিক্ষানবিশী হাতের রচনা। তাহার অঙ্গে সাহেবী পোষাক। সে একখানা গোল টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানচিত্র দেখিতেছিল। বিনয়কে সে মুখ তুলিয়া লক্ষ্য করিল না, যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল মাথাটা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিল—গুড ঈভনিং মঁসিও। বিনয় প্রত্যভিবাদন করিল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ।

বিনয় লক্ষ্য করিল, ঘরের কোণে একটি বন্দুক এবং একপ্রস্থ অশ্বারোহণের পোষাক। শিয়রের কাছে নেপোলিয়ানের একখানা চিত্র, আরকোলার যুদ্ধে নেপোলিয়ান পতাকা হাতে করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

বিনয় ক্লান্ত হইয়াছিল, নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল। হঠাৎ সেই লোকটি টেবিলের উপর এক বিশাল চাপড় মারিল—বিনয় চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। লোকটি বলিল—দেখুন মঁসিও দেখুন, সম্রাট

উল্‌মের যুদ্ধে যে চাল দিয়েছিলেন, সেই রকম যদি করতেন, তবে কি ওয়েলিংটনের সাধ্য! বিনয় কিছুই বুঝিতে পারিল না। লোকটি বলিয়া চলিল—আঃ, গ্রাউচি যদি ব্লুকারকে আর এক ঘণ্টা আটকিয়ে রাখতে পারতো! ইংরেজ-লেখকরা ওয়েলিংটনকে বড় যোদ্ধা প্রমাণ করবার জন্য প্রাণপাত করেছে, কিন্তু ওয়াটারলু যুদ্ধে ওয়েলিংটন তো হেরে গিয়েছিল, এমন কি তার রিজার্ভ সৈন্যদলকে জাহাজে উঠবার আদেশ পর্য্যন্ত দিয়েছিল। কেবল ব্লুকার এসে পড়াতেই—

হঠাৎ থামিয়া বিদ্রূপের স্বরে আরম্ভ করিল—ওয়েলিংটন যে কত বড় বীর স্পেনের যুদ্ধই তার প্রমাণ। স্পেন জয় করতে, মঁসিও, তার পাঁচ পাঁচটি বছর সময় লেগেছিল। তবু তো সেখানে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না—নইলে—হাঃ—

লোকটি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বিনয় এবার ভাল ভাবে লোকটির বিশালতা লক্ষ্য করিল। সে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ নেপোলিয়ানের চিত্রের সম্মুখে থামিয়া সামরিক কায়দায় সেলাম করিল, ফরাসী ভাষায় বলিয়া উঠিল—সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।

বিনয় অবাক্ হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। এইবার লোকটি তাহার কাছে আসিয়া বসিল। সে পকেট হইতে একখানা ভিজিটিং কার্ড লইয়া বিনয়ের হাতে দিল। বিনয় দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—

M. VIKRAMJIT, F. R. H. S.

Fellow of the Royal Hunting Society.

বিনয় ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। লোকটি আবার উঠিয়া পড়িয়া পায়চারি সুরু করিল। পুনরায় নেপোলিয়ানের চিত্রের সম্মুখে থামিয়া পকেট হইতে একটি সোনার নস্যের কৌটা বাহির

করিয়া অন্যমনস্কভাবে খানিকটা নস্য গ্রহণ করিল, তাহার অনেকটাই নাকে না গিয়া জামার উপরে পড়িয়া গেল। তারপরে একটি বিখ্যাত ফরাসী গানের ছত্র গাহিতে গাহিতে পায়চারী সুরু করিল। গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতেছিল—Malbr ouck s'en va-t-en guerre। গান থামিলে সে বিনয়ের কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—দেখুন মঁসিও, শিকার না করেই আমাদের দেশটা গেল। যুদ্ধই যখন সভ্যতার চরম লক্ষ্য, যাদের সে সুবিধে নেই, শিকারেই তাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমার একটা থিওরি আছে, মানুষ প্রথমে শিকার দিয়ে সভ্যতা সুরু করেছিল, কিন্তু ক্রমে দেখতে পেলো জানোয়ার মারা তার পক্ষে অপমানের। সে বুদ্ধিবিদ্যায় জানোয়ারের চেয়ে এত শ্রেষ্ঠ যে নিতান্ত শিভ্যালরির ভাব থেকে জানোয়ার শিকার ছেড়ে, মানুষ শিকার ধরলে, একেই বলে যুদ্ধ।

—কি বলুন ঠিক কিনা! সে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল:— দেখুন আমি আপনাদের মত এম-এ, বি-এ নই, কাণ্ডজ্ঞানের বলেই এ সমস্ত ভেবে বের করেছি!

লোকটির কথাবার্ত্তায় এমন একটা স্বাভাবিক আন্তরিকতার টান ছিল যে বিনয় তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

—আমি শিকারে বেরিয়েছি, হিমালয়ের উপত্যকার গভীর বনে যাবো; বেশী দেরি নেই।

ক্রমে বিনয়ে ও বিক্রমজিতের মধ্যে আলাপ জমিয়া গেল। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—কিন্তু স্বাভাবিক হৃদ্যতার গুণে আলাপে কোনো বাধা পড়িল না।

বিনয়ের মনে দারুণ দুঃখ কিন্তু তবু সে আনন্দের সহিত আলাপে যোগ দিল। বিনয় যদি সর্ব্বজ্ঞ হইত, তবে জানিতে পারিত, এই

শিকারোৎসুক মনেও আর একটা নিদারুণ বিষাদের বাসা। কিন্তু একের মনের ভাব অন্যে জানিতে পারিল না—দুজনেরই মুখে হাসি। সংসারে এমনই হয়। এ যেন অনেকটা নূতন দামী জুতা পরার মত। প্রতি পদক্ষেপে পা কাটিয়া যাইতেছে, তবু মুখে হাসি বিকশিত রাখা চাই।

অনেক রাত্রে একবার বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। এই অবসরে সে বিক্রমজিতের আর একটা অপ্রত্যাশিত পরিচয় পাইল।

বিনয় দেখিল, দেয়ালে একটা টিকটিকি একটা পোকা ধরিয়াছে। বিক্রমজিৎ তাহার মুখ হইতে ওই পোকাটাকে উদ্ধার করিবার জন্য টিকটিকির পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে। ক্রমে টিকটিকিটা চাতালের কাছে গিয়া বিক্রমজিতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল। বিনয়ের মনে পড়িল, বিক্রমজিতের থিওরি। শিকারই সভ্যতার উৎপত্তি। সে মনে মনে বিক্রমজিতের উপাধিটা আবৃত্তি করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

২

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া জানালা খুলিয়া বিনয় বাহিরে তাকাইল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিগন্তের কালো আকাশটাতে তখন কেবল-মাত্র ইন্দ্রাণীর অঙ্গদরচনার জন্য স্বর্গীয় সুবর্ণ কষিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। প্রথমে একটা সোনার রেশ ফুটিয়া তার পরে অকস্মাৎ এক সময়ে সমস্ত দিগন্তখানা কে যেন গলিত কাঞ্চনে মুড়িয়া দিল। কিন্তু এ বর্ণ যেন সজীব, প্রতি পলে পলে তাহাতে নূতন আভাস। সোনার রং

ঘন রক্ত বর্ণে, গাঢ় রক্তিমাফুল্ল গোলাপীতে, গোলাপী স্থলপদ্মের আভাসে, সে আভাস বেগুনী ও পীতবর্ণের মধ্যে দিয়া কখন নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায় আসিয়া পৌঁছিল! আধঘণ্টার মধ্যে একটা ইন্দ্রধনুর বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইয়া গেল। মন্দাকিনীর পুঞ্জীভূত শুভ্র ফেনরাশির মত বিরাট কাঞ্চন-জঙ্ঘার শৃঙ্গ। একটা দিকে সূর্য্যকরোদ্ভাসিত নীহার রেখা, অপর দিকটায় প্রখর সূর্য্যালোকের অভাবে কোমল কালো ছায়া, হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি।

বিনয় চাহিয়া দেখিল, উপত্যকায় তখনো গভীর অন্ধকার। অন্ধকারে ঘন অরণ্য পাহাড়ের গা বাহিয়া গড়াইয়া নামিয়া গিয়াছে, চক্ষু যেখানে আর তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে না।

সে উপরে চাহিয়া দেখিল পাহাড়ের গায়ে ধুপি গাছের শ্রেণী। স্তব্ধ, দীপ্ত আকাশের পটভূমিতে প্রত্যেকটি বৃক্ষ, শাখাপ্রশাখা স্বতন্ত্র সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে। আর আকাশের প্রান্তে স্বচ্ছ ক্ষীণ চন্দ্রকলাখানি মন্দাকিনীর তীরে খসা কেলিশ্রান্ত রাজহংসের পালকের মত পড়িয়া আছে।

এ দৃশ্য বিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। সে এই পার্ব্বতীয় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য বেড়াইতে বাহির হইল। জনতাপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন ক্যালকাটা রোড ধরিয়া চলিল। ডাহিনে পাহাড়, পাহাড়ে অপর্য্যাপ্ত ফার্ণের জঙ্গল, বামে সুগভীর উপত্যকা; সেখানে বিশাল শাল সেগুণের শ্রেণী। সে উপত্যকার পরে আবার উপত্যকা, এমন ভাবে কতদূর চলিয়াছে, কে জানে! পথের পাশে মাঝে মাঝে একখানি বেঞ্চি, বৃষ্টিনিবারণের জন্য উপরে একটি কাঠের চালা। বিনয় অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়া এক স্থানে কয়েকটা সমাধিস্তম্ভের মত দেখিতে পাইল; তাহার পাশে কতকগুলি

নিশান ঝুলিতেছে। সেখানে সে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার সম্মুখেই নিম্নে গভীর উপত্যকার গভীর অরণ্য। বিনয় যেখানে বসিল, সেখান হইতে উপত্যকার তলদেশ নজরে পড়ে না, কেবল বনস্পতি শ্রেণীর উচ্চতম শাখাগুলি দেখা যায়। আর মাঝে মাঝে বাতাসে দূরবনের শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শ্রুত হয়, যে বনে দিন-দুপুরে ভালুক চরিয়া বেড়ায়। বিনয়ের মনে পড়িল, গত কল্য যখন সে শিলিগুড়ি হইতে ট্রেণে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিল, সেই কথা। প্রথম যখন সমতলভূমি ছাড়িয়া ট্রেণ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল, মাঝখানে সরু পথ, দুই ধারে গভীর খাত, গভীর খাতে গহন অরণ্য হাজার বছরের প্রাচীন। চারিধার নিস্তব্ধ, জনমানব নাই, কেবল বৃহৎ বনস্পতির তলদেশে তাহাদের ট্রেণখানি একখানা খেলনার মত, খেলনার মতই তাহা নগণ্য। শ্বাপদ-সঙ্কুল তরাই প্রদেশের শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর তাহার কানে আসিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে দুঃসাহসী কাঠুরিয়ার অদূরে কোথাও কাঠ কাটার শব্দ। নিস্তব্ধ দুপুর, নিশ্চল পর্ব্বত, গভীর অরণ্য সবশুদ্ধ মিলিয়া এমন একটা অলৌকিক মায়া রচনা করিয়াছিল, যাহাতে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

আজও সে অনেকটা সেই রকম অদ্ভুত একটা অলৌকিক ভাব অনুভব করিতে লাগিল। উপত্যকায় চাহিয়া দেখে পাহাড়ের গা বাহিয়া কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জ উপরে উঠিয়াছে। নিম্নে অন্ধকার হইয়া গেল। সে উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল মেঘের পিঠে সূর্য্যকিরণ ইন্দ্রধনুর বল্গা কসিয়া দিতেছে। কিছুকালের মধ্যেই ঐরাবতের বংশধরের মত সেই ধূসরকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জে পর্ব্বতসানু ও বনরাজি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহারা রবিকিরণের মৃণালগুলিকে উপড়াইয়া লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়াইয়া

পড়িল। ক্রমে বিনয়ের পায়ের কাছে, চারিধারে, উচ্চে নীচে সর্ব্বত্র মেঘপ্লাবনে ডুবিয়া গেল—আর কিছু দৃষ্ট হয় না—হিমালয় পর্ব্বত নাই। সূক্ষ্ম শীতল বাষ্পের কণা তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনয় একা। এই নিখিলপ্লাবী অন্ধকারে বসিয়া সে শুনিতে পাইল, আর কোথাও কোন শব্দ নাই, কেবল উপত্যকার কোন্ গভীরতা হইতে বিদেশীয় কোকিলের কু-কৃ-কু কু-কৃ-কু রব ভাসিয়া আসিতেছে।

মেঘ কাটিয়া গেল, উপত্যকায় বৃষ্টি হইয়া গেল, শালবনের বড় বড় ছায়া পড়িতে লাগিল, সহসা বনপ্রান্তে অজ্ঞাত কোন্ নির্ঝরের কলধ্বনি ধুপিবনের মর্ম্মরের সহিত মিলিত হইয়া কানে আসিতে লাগিল। বিনয় সেই শিলাখণ্ড হইতে উঠিয়া পুনরায় ফিরিয়া চলিল।

সে 'ম্যাল'এ আসিয়া পড়িল। দলে দলে স্বাস্থ্য-ভিক্ষু নরনারী 'ফগ' খাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। গিরিরাজের সভায় এই বিদূষকের দল যদি জানিতে পারিত সপারিষদ গিরিরাজ তাহাদের অভিনয়ে কেমন কৌতুক অনুভব করিতেছেন, তবে বোধ করি তাহারা লজ্জিত হইত।

বিনয় 'ম্যাল' ছাড়িয়া ক্রমে অবজারভেটরি গিরিশিখরের দিকে চলিল। উক্ত শৈলের চড়াই-পথে যখন সে উঠিতেছে, হঠাৎ শুনিতে পাইল—মঁসিও, মঁসিও। স্বর শুনিয়া বুঝিল বিক্রমজিৎ। কিন্তু কোথায় সে! অদূরে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। স্বরটা সেখান হইতে আসিতেছে, বিনয় সেই দিকে চলিল।

জনতার কাছে গিয়া বিনয় যাহা দেখিল তাহা দর্শনীয় ত বটেই, বর্ণনীয়ও। বিক্রমজিতকে কেন্দ্র করিয়া একটা ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। বিনয়কে দেখিয়া বিক্রমজিৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—মঁসিও Example is better than lecture! দেখুন, দেখুন কি ব্যাপার!

ব্যাপার গুরুতর বটে। বিক্রমজিতের পরিধানে ইংরেজী ধরণের শিকারের পোষাক। কাঁধে বন্দুক, গরম খাদ্য রাখিবার ফ্লাস্ক, পিঠে একটা থলি। বিক্রমজিৎ সগর্ব্বে একটা গাধার পিঠে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছেন, জন্তুটার মুখে লাগাম। পাছে উক্ত জানোয়ারকে কাহারো গাধা বলিয়া ভ্রম হয়, তাই তাহার গলায় একটা বৃহৎ লেবেল ঝুলিতেছে, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত—THE HORSE.

বিক্রমজিৎ বলিল—দেখছেন আমার অশ্ব। (বিক্রমজিৎ ঘোড়া বলেন না, তাহাতে অশ্বের গৌরবের হানি হইতে পারে)। বিনয় বলিল—লেখা আছে বটে সেই রকম।

বিক্রমজিৎ বলিল—শুধু লেখা নয়, দেখবেন। এই চলো—বলিয়া তিনি লাগামে টান দিলেন। দি হর্স চলিতে চেষ্টা করিল। বিক্রমজিৎ শুধু অশ্বের চলৎশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া আরো দুই একটা বাহ্য ব্যবস্থার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে একজন ভুটিয়া কুলী একটি সরস পল্লব অশ্বের মুখের অদূরে ধরিল—অশ্ব লোভে এক পা তুলিল। আর একজন ভুটিয়া কুলী একটি মশাল জ্বালাইয়া অশ্বের পিছনে ধরিল, অশ্ব ভয়ে আর এক পা তুলিল। তৃতীয় একজন কুলী অশ্বের গলবিলম্বিত একটা রসি ধরিয়া টানিতে লাগিল—সে বাধ্য হইয়া আর এক পা তুলিল। আর উপর হইতে বিক্রমজিৎ কখনো উৎসাহবাক্যে, কখনো অনুরোধে, কখনো অভিমানে তাহাকে চালাইতে লাগিল। বিনয়ের কেবলি মনে হইতে লাগিল—How hard it is to climb!

বিক্রমজিৎ বলিল—মঁসিও পাহাড়ে ওঠা শিখছি। আমার অশ্ব একটু অভ্যস্ত হলেই একেবারে মাউণ্ট এভারেষ্টের দিকে রওনা হব।

বিনয়ের বিষম হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলে পাছে এমন একটা

উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্তের গুরুত্ব কমিয়া যায়, তাই সে বিক্রমজিতকে বলিয়া ফিরিল। বিক্রমজিৎ রুমাল উড়াইয়া বলিল—au revoir! তখনি গান ধরিল—

Malbrouck s'en va-t-en guerre.

৩

বৃষ্টি নামিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙের বৃষ্টি। চারিদিকে অজস্র সুপ্ত নির্ঝরিণী কিঙ্কিণীঝঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। বিনয় একাকী ঘরে আবদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। জানালার বন্ধ শার্সির উপরে বৃষ্টির জলধারা লাগিয়া নানা রকম ছবি আঁকিতেছে, আবার মুছিয়া যাইতেছে। বাহিরের আকাশ পাণ্ডুরাভ ধূসর, দিগন্তে গিরিরাজের আসর জল-যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত, কেবল উপত্যকার বনশ্রেণীর মাথায় সিক্ত শ্যামলতার আভাস।

বাহিরের দৃশ্য লুপ্ত হওয়াতে বিনয়ের মন বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া অন্তরে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে দুইটি মূর্ত্তি।

হিমালয়ে আসিয়া বিনয় অন্তরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে নাই, হয় তো সময় পাইয়া উঠে নাই। গিরিরাজের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় সে এত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিজের কথা মনেই ছিল না। সে যে-বেদনা ভুলিতে এখানে আসিয়াছিল নগাধিরাজের শুশ্রূষায় সেই ব্যথা কেবল সুপ্ত হইয়াছিল, মিলাইয়া যায় নাই। আজ স্বয়ং গিরিরাজ বর্ষার

তিরস্করণীর আড়ালে মুখ ঢাকিয়াছেন। বিনয় হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, দুইটি যুগল ক্ষতচিহ্ন, এক বৃন্তে দুইটি চিরবিকশিত রক্ত-গোলাপ।

কঙ্কণ ও পারুল। কঙ্কণ নববর্ষার পুরবৈঞা বাতাস, পারুল প্রথম ফাল্গুনের দক্ষিণের হাওয়া। একজনের অঞ্চলে স্নিগ্ধ ধানক্ষেতের কোমলতা, অপরের আছে বসন্তের বনের উগ্রমদির গন্ধ। একজন ভাবাইয়া তোলে, অন্যজন মন ভরিয়া দেয়। একজন দূরবীক্ষণের কাচ তাহার ভিতর সুদূর জগতের রহস্য অবারিত হইয়া যায়, অন্যজন দর্পণের মত, দর্শককে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। একজন অঞ্চলের ইঙ্গিতে পুষ্পবনে অজস্র ফুল ফোটাইয়া দেয়, আর একজন সেই ফুলে মালা গাঁথিতে থাকে। একজন প্রভাতের জাগরণ, অন্য জন জাগরণের স্বপ্ন। একজন বর্ষারম্ভের মেঘ, অশ্রু-যবনিকা টানিয়া দেয়, অপরে যৌবনের খাণ্ডবে উচ্চ হাস্যের দাবানলের প্রজ্জলিত শিখা। একজন ধীরসঞ্চারী বর্ষার পূর্ববায়ু, অপরে দিগন্তের বাঁধ-ভাঙা বসন্তের উদ্দাম সমীরণ। একজন নিঃশব্দে জীবনের উপরে যবনিকা টানিয়া দেয়, আর একজন কৌতুক কৌতূহলে সেই যবনিকা উড়াইয়া দিয়া হাসিতে থাকে। একজনের সাধনা আত্ম-বিলোপ অপরের আত্ম-প্রকাশ। একজন প্রেমিক, অপরে প্রেম। একজন দেবী, অন্যজন মানবী। কঙ্কণ ও পারুল।

বিনয় ভাবিয়াছিল, হিমালয়ে আসিয়া সে দুই জনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ঠিক বিপরীত ঘটিল, দুইজনের যুগল স্মৃতি যুগপৎ তাহাকে উন্মনা করিতে লাগিল। বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বয়ং মহাদেবও এই হিমালয়েই গৌরীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উমার শোকে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, গৌরী তাঁহাকে জয় করিয়া লইল

কঙ্কণ,—উমা সে আত্মবিলোপশীলা ; পারুল,—গৌরী, প্রণয়ী-জয়-কারিণী। কে জানে সেই প্রাচীন প্রেম-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি পুনরায় এই পুরাতন হিমশৃঙ্গে হইবে কি না!

বিনয়ের চমক ভাঙ্গিল। বৃষ্টি কখন্ ধরিয়া গিয়াছে। বিনয় দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশ নির্মল, উপত্যকার বনের মাথায় বৃষ্টির মেঘ। সে বেড়াইতে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ছুটিতে ছুটিতে বিক্রমজিৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—মঁসিও মঁসিও, এমন সুযোগ আর মিলবে না, লেট মি ট্রাই—

—ব্যাপার কি মঁসিও বিক্রমজিৎ ?

বিনয় বিক্রমজিতের অনুরোধ ক্রমে তাহাকে মঁসিও বলিয়া সম্বোধন করে।

—আসুন, দেখাচ্ছি।

উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। বিক্রমজিৎ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল।

—যখন আমি শিকারে যাবো, হিমালয়ের অত্যুচ্চ সব শৃঙ্গের উপর দিয়ে, যেখানে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একেবারে নেই বল্‌লেই হয়, তখন কি করবো বলুন তো ?

বিনয় নীরব হইয়া রহিল।

—এই তো আপনি ভেবে পাচ্ছেন না, আমার কি কর্ত্তব্য। আমিও প্রথমে ভেবে পেতাম না : তার পরে হঠাৎ একদিন মনে এল। কাল দেখছিলেন তো আমার অশ্বটা! দুর্গম গিরিশিখরে আমি আরোহণ করা অভ্যাস করছিলাম ওই অশ্বে চড়ে! কিন্তু এমন অনেক সঙ্কীর্ণ পথ আছে যেখানে আমার অশ্বও যেতে পারে না, সেখানে কি কর্ত্তব্য বলুন তো'!

বিক্রমজিৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিল। ভাবটা যেন বিনয়কে চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু ক্ষণ পরে আবার আরম্ভ করিল—অবশ্যই সেখানে পায়ে চলে যেতে হবে, অন্য উপায় নাই।

বিনয় বলিল,—তা তো বটেই, তা ছাড়া আর উপায় কি। বিক্রমজিৎ বাৎসল্যরসমিশ্রিত মৃদু হাসিয়া বলিল—অত সহজ নয় মঁসিও। সে পথে এক পাহাড়ী ছাগ ব্যতীত কোনো প্রাণীও চলতে পারে না।

বিনয়—তবে একটা মজবুত দেখে পাহাড়ী ছাগ কিনে ফেলুন।

—ছাগলের কাজ নয়। সেখানে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে, তবে তার জন্যে অভ্যাস চাই। এই যে বাড়ীর দোতালার কার্ণিস দেখছেন, হাতখানেক চওড়া এর উপর দিয়ে হেঁটে অভ্যাস করে চলতে হবে।

বিনয় ভীত স্বরে বলিল—কিন্তু এটা যে বৃষ্টি হয়ে পিছল হয়ে গেছে।

—সে সব দুরূহ পথে তো সর্ব্বদাই বৃষ্টি হচ্ছে।

—কিন্তু পা পিছলে পড়লে যে একেবারে ত্রিশ হাত নীচে—

বিক্রমজিৎ উৎসাহিত হইয়া বলিল—ত্রিশ হাত নয়, তিনশো হাত, তিন হাজার হাত। সে সব গিরিশিখর থেকে পড়লে একেবারে মিলটনের শয়তানের মত from what a height to what a depth—বলিয়া নিজের রসিকতাতে নিজেই হাসিতে লাগিল।

বিনয় স্তম্ভিত। বিক্রমজিত পিঠে একটা ভারি বোঝা বাঁধিয়া লইল, কাঁধে বন্দুক লইল, পায়ে বুটজুতা পরিল, বাড়ীর কার্ণিসের উপর হাঁটিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে থাকিল।

—আসুন, মঁসিও, দেখবেন আসুন।

উভয়ে বাহির হইয়া গেল। বিক্রমজিৎ দোতালার সেই পিছল সঙ্কীর্ণ কার্ণিসের উপর দিয়া সগর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিল। লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট,—বিনয় ভাবিতে লাগিল, একবার পা ফসকাইলে আর কথা নাই—ত্রিশহাত নীচে একেবারে ওই পাথরগুলোর উপরে। কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল সেই সব গিরিশৃঙ্গ হইতে পাড়লে যে তিন হাজার হাত নীচে!

বিক্রমজিৎ সগর্ব্বে চলিতেছে—লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট। আহা মঁসিও, এই সময় যদি আমার একখানা ছবি তুলে রাখতেন—লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট।

বিক্রমজিৎ চলিতে লাগিল। আর বিনয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—অদ্ভুত এই লোকটা। এমনতরো মানুষ সে আগে দেখে নাই। অন্য সময় হইলে বিনয় ইহাকে হয় পাগল নয় বিদূষক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সে যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার পরে আর কাহাকেও নির্দ্দয় সমালোচনা করিতে মন সরে না। বিনয়ের কেমন যেন মনে হইল—লোকটার জীবনে কোথায় একটা দুঃসহ ব্যথা আছে, সেটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই বীরত্বের এই ছদ্মবেশ। দুঃখে মানুষকে এক করে, বেদনার তীব্র বিদ্যুৎ-ঝলকে অন্ধকার এই মানবজীবনের রহস্য চোখে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, এমন আর কিছুতে নয়।

৪

বিনয় দুপুরের দিকে কার্সিয়াং-এ আসিয়া নামিল। দার্জ্জিলিঙের নিঃসঙ্গতায় সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। একবার কার্সিয়াং

ঘুরিয়া আসিলে মনটা ভাল হইতে পারে ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া সে সহরের দিকে চলিতে সুরু করিল, কিন্তু খানিকটা গিয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। পুনরায় ষ্টেসনে আসিয়া কার্ট রোড ধরিয়া রেলপথের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। মন যখন চিন্তা-ভারাক্রান্ত, তখন অন্য রাস্তায় চলার চেয়ে কার্ট রোড বাহিয়া চলার এক মস্ত সুবিধা আছে—পথটা সমতল, পথের দিকে ততটা মনোযোগ দিতে হয় না।

বিনয়ের ধারণা হইয়াছিল, গিরিরাজের সাহচর্য্যে সে কঙ্কণ-পারুলের কথা ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে চাহিলে দেখিতে পাইত, কঙ্কণ ও পারুলের স্মৃতি টানা-পোড়েনের মত তাহার অগোচরে নিরন্তর এক সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিয়া চলিয়াছে। এই জাতীয় অধিকাংশ স্মৃতিই সেকালের গল্পে শোনা মসলিনের মত, ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে দুঃখরাত্রের অশ্রুশিশিরসম্পাতে সহসা তাহা আর চোখে পড়ে না। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বলিয়াই, হঠাৎ যখন চোখে পড়ে, মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে এমন চমকিত করিয়া দেয়।

পথ পাহাড়ের গায়ে বাধা পাইয়া নূতন নূতন বাঁকে দিগন্তের অপ্রত্যাশিত দৃশ্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের দিগন্তের অবিচলিত গিরি-দৃশ্য এই কয় দিনেই বিনয়ের কেমন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমতল পথ ত্যাগ করিয়া পাশের পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল।

অগণিত বিচিত্র ফুলে ঢাকা পাহাড়। বিনয় যে দিক দিয়া উঠিতেছিল, সে দিকে কোনো পথ ছিল না, সে অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। প্রায় যখন সে শিখরের নিকটে গিয়াছে, দেখিতে পাইল, উপরে ফুলের বনে লাল, নীল পুষ্পরাশির মধ্যে, অপূর্ব্ব আর একটি

ফুল—একটি রমণী মূর্ত্তি। রমণীমূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, মাথায় তার ঘোমটা। তাহার বসিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া বিনয়ের মনে হইল, মেয়েটি পারুল ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু পারুল এখানে কেমন করিয়া আসিবে, বিশেষ এই নির্জ্জন গিরিশিখরে! আগেই বলিয়াছি, বিনয় পাহাড়ের সেই দিক দিয়া উঠিয়াছিল, যেদিকে পথ ছিল না। কিন্তু তার বিপরীত দিকে সুন্দর পথ ছিল। খুব সম্ভব রমণী সেই পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিল।

বিনয় নারীমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া উঠিতে লাগিল। পিছন হইতে নারীমূর্ত্তির মত এমন রহস্যময়ী আর কি আছে! বিশ্বে সকল রহস্যের যেন তাহা প্রতীক। পিছন হইতে নারীমূর্ত্তি অশরীরী; কেবল তাহার বসিবার ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিটি দেহলতার একটি নিশ্চল বিদ্যুৎ-রেখার মত। বিনয় নিঃশব্দে যখন তাহার পিছনে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পায়ে লাগিয়া একটা পাথর সশব্দে গড়াইয়া পড়িয়া গেল, দুজনে চমকিয়া উঠিয়া পরস্পরকে দেখিল—পারুল ও বিনয়।

বিনয় অবাক হইয়া বলিল—তুমি এখানে!

পারুল উত্তর করিল—আপনি!

বিনয় ইতিপূর্ব্বে পারুলকে কখনো 'তুমি' বলে নাই। ভবিষ্যতে তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ করিবে না ভাবিয়াছিল, আর হঠাৎ এই 'তুমি'। কিছুক্ষণ দুজনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল, কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না।

বিনয় মনে মনে পারুলের প্রতি বিমুখতার যে প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছিল, অতর্কিততার এই আকস্মিক আঘাতে এক মুহূর্ত্তে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বিনয় যদি আগে হইতে জানিয়া শুনিয়া পারুলের কাছে যাইত, তবে এ প্রাচীর কখনো ভাঙিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু যখন সে সব চেয়ে অপ্রস্তুত ছিল, সব চেয়ে কঠিন আঘাত আসিল তখনই। পাথরের বাধা ধূলার মত ভাঙিয়া পড়িল। যে-বাধার গৌরবটা তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল; সেটা যখন গেল, তখন আর বিমুখতার ছল করিয়া লাভ কি! যে-আকস্মিকতা বিনয়ের জীবনে বারবার বিরহের প্রহরী হইয়া দেখা দিয়াছে, সে আজ মিলনের দূতীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনয় বসিয়া পড়িল।

বিনয় বলিল—পারুল তুমি এখানে?

পারুল—আমরা সবাই এসেছি।

—তোমার বাবা, মা?

—সকলেই।

—হঠাৎ, কেন?

—একজন সন্ন্যাসীর সন্ধানে।

—কে, আমি?

—হয় তো।

—এখানে যে আছি কি করে জানলে?

—সন্ন্যাসীর সন্ধান হিমালয় ছাড়া আর কোথায় করব? পারুল এইবার হাসিল।

সেই হাসিতে বিনয় চমকিয়া উঠিল। এতো সেই পলাইয়া-থিয়েটারে-যাওয়া পারুলের হাসি নয়। বিনয় এক পলকে এই হাসির চমকে পারুলকে নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। বিনয় তাহার দিকে এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মাথায় ঘোমটা দেখিয় এত স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও বিনয়ের বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল কিন্তু কই, সীঁথিতে তো সিঁদুর নাই। তবে ঘোমটা কেন?

বিনয় দেখিল, পারুলের কপোল দুটিতে পাণ্ডুরাভা। যদি সে

আরো ভাল করিয়া দেখিতে পারিত, তবে দেখিত, তাহাতে সদ্যশুষ্ক অশ্রুজলের দাগ। চোখের পাতার পক্ষ্মগুলি অশ্রুসিক্ত। চোখের মাঝে সদ্যবর্ষণমুক্ত স্বচ্ছ নীলাম্বরের অপরিমেয় গভীরতা। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও দিগন্তের ধারে যেমন দুই একখানি জলভরা মেঘ থাকে, হঠাৎ হাওয়া পাইলে তাহা হইতে অকারণে জল ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তাহার চোখের নীচের পাতা দুটির কোলে দুএক বিন্দু জল জমিয়াছিল, একটু নত হইতেই, তাহা গড়াইয়া গাল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। বিনয় দেখিল, পারুল অনেকটা কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মক্ষীণ নদীর স্বচ্ছ জলধারা যেমন তাহার অন্তরস্থ রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে, এই কৃশতাও তেমনি করিয়া বিনয়ের চোখের সম্মুখে পারুলকে খুলিয়া ধরিয়াছিল।

বিনয় ও পারুল নীরবে বসিয়া রহিল। একদা যে বিনয় কথা কহিবার সুযোগ পাইলে আর কিছু চাহিত না, সে আজ নির্ব্বাক। হৃদয় যখন কানায় কানায় পূর্ণ, বাক্যের তখন অবসর কোথায়! আর যদিই তাদের কথোপকথন পাঠককে শোনাইতে পারিতাম, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। প্রেমিকদের কথাবার্ত্তা প্রজাপতির রঙীন পাখার মত; সূর্য্যালোকিত ফুলের বনে দূর হইতেই তাহার সৌন্দর্য্য। তাহা ছিঁড়িয়া আনিয়া হাতে ধরিলে একান্ত নিরর্থক—কেবল ব্যর্থতা। যদি ওই নির্জ্জন গিরিশিখরের পুষ্পবনে, হিমালয়ের নিভৃত সন্ধ্যালোকে যাইতে পারি; তবেই ওই সব নিরর্থক কথা সার্থক হইয়া দেখা দিবে। দিবাদগ্ধ কলিকাতার হট্টগোলে সে চেষ্টা করিব না। তাহাদের প্রাণের গভীরতম তুচ্ছ কথাগুলিকে হাস্যকর করিয়া তুলিতে আমার ইচ্ছা নাই।

নদীর জলতলের রেখা যখন তটভূমির নিম্নে পড়িয়া থাকে, তখন

কত গর্জ্জন, কত কলরব। কিন্তু যেদিন জলতল আর তটরেখা মুখে মুখে সমান হইয়া যায়, সেদিন কোথায় সে কলগর্জ্জন!

যেখানে দুজনের মনের মিল আছে, বাক্য সেখানে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। অন্তরের ভাবের সহস্রাংশের একাংশও বোধ করি ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না। তাই তো মানুষে চুম্বন আলিঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু তাহাতেই বা সম্পূর্ণ প্রকাশ কোথায়! আমরা দুর্য্যোধনের মত স্বচ্ছ স্ফটিকদেহের চারি পার্শ্বে অনবরত মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া মরি। ভিতরটা দেখা যাইতেছে, অথচ প্রবেশের উপায় নাই। গভীরতম ভালবাসা, নিবিড়তম মিলনও দেহের ঐ চৌকাঠের উপরে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। দেহই মিলনের সেতু আবার দেহই মিলনের অন্তরায়।

বিনয় অনেকদিন পরে আজ মনে শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু পারুলের ঐ ঘোমটাখানা বার বার তাহাকে খোঁচা দিতেছিল। পারুল তাহা বুঝিল, নীরবে হাসিয়া ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেমন করিয়া স্বচ্ছ জলতলের মসৃণ উপলরাজিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি পারুলের হাসিটি স্নিগ্ধ এবং ম্লান।

বিনয় একখানি উচ্চ শিলাসনে বসিল। পারুল তাহার কোলে মাথা রাখিয়া বসিল নীচে। বিনয় তাহার হাতখানি নিজের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিল। এক হাতে সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাত দিয়া বন্য ফুল তুলিয়া পারুলের খোঁপার চুলে, কানে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

চিন্তার আদিম ঊষা হইতে মানুষ জীবনের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিয়াছে কি? জীবন এত বিশাল, এত জটিল, এত বিচিত্র, আর মানুষ এতই তুচ্ছ, তাহার পক্ষে এ অর্থবোধ কখনো সম্ভব নহে। আর যে দুঃসাহসী জীবনকে উপেক্ষা করিয়া সত্যের

আলোকে তাহাকে মুখোমুখী দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে হতভাগ্য এই ভস্মলোচনের সম্মুখে পুড়িয়া মরিয়াছে।

তবু তো জীবন দুর্ব্বহ নয়, নিরর্থক নয়, মানুষের প্রতি শত্রুভাবের নয়। তাহাকে বোধ করি খানিকটা বোঝাও যায়। কিন্তু তাহার জন্য এমনি নির্জ্জন গিরিশিখর চাই। এমনি নিভৃত পুষ্পবন। এমনি ভাবে হাতের মুঠি ধরিয়া কোলের উপর মাথাটি রাখা চাই। এমনি চরম মুহূর্ত্তে হয় তো এক আধ পলের জন্য জীবনের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু এমন পরম লগ্ন জীবনে কতবার আসে! তপস্যা অনেক সহজ, কারণ তাহা একের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু এই পুষ্পবনের সাধনা দ্বৈতমনের সাধনা, দুইটি মন এক সময়ে এক সুরে ধ্বনিত হইয়া ওঠা জগতে সব চেয়ে কঠিন, দুষ্প্রাপ্য।

বিনয়, পারুল কি ভাবিতেছিল জানি না। যাহাদের জীবনে এমন চরম লগ্ন আসে, তাহারা আর কিছু ভাবিয়া দেখে না—একেবারে সোজাসুজি দেখিতে পায়। বিনয়ের মনের কথা জানি না—হাত দিয়া সে ফুল তুলিয়া পারুলের খোপা পুষ্পিত করিয়া তুলিতেছিল। পারুলের মনের কথাও জানি না—বিনয়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল।

এই মোহাবেশ ভাঙিয়া যখন তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখন পারুলের খোপায় অজস্র ফুল আর হিমালয়ের আকাশে অসংখ্য তারা।

বিনয় অকস্মাৎ কলিকাতা ত্যাগ করিলে সর্ব্বেশ্বরীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি পারুলকে অনেক প্রশ্ন করিয়া যেটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, উভয়ের মধ্যে একটা কলহ হইয়া বিনয় চলিয়া গিয়াছে। তিনি সরোষে স্বামীর কাছে গিয়া পড়িলেন—দেখ তোমার মেয়ের কীর্ত্তি। আমি কত কষ্টে জামাই সংগ্রহ করি, তোমার মূর্ত্তিমন্ত মেয়ে……। মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া কি ধিঙ্গিই না করিয়াছ…একটা জমিদার জামাই…ইত্যাদি। অবিনাশবাবু কয়েক টিপ নস্য লইয়া বলিয়া উঠিলেন—আঃ…আর, তোমার নিতাই, সে পড়াশোনা না করিয়া এমন কি আদর্শ পু……পু-ত্র হইয়াছে! সর্ব্বেশ্বরী দেখিলেন, অসম্ভব। স্বামীর সহিত কলহ করিবার সৌভাগ্যটুকুও তাঁর নাই। তিনি সরিয়া পড়িলেন।

বিনয়ের খোঁজ চলিতে লাগিল। প্রথমে রাজসাহীতে। তারপরে তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, সে দার্জ্জিলিং গিয়াছে। রায়-পরিবার দার্জ্জিলিঙের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। সর্ব্বেশ্বরী হাঁপানির রোগী, কাজেই দার্জ্জিলিঙের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত না গিয়া তাহারা কার্সিয়াং-এ বাসা লইল। স্থির হইল, সেখানে ডেরা বাঁধিয়া বিনয়ের খোঁজ চলিবে। এমন সময়ে অকস্মাৎ বিনয়ের সঙ্গে পারুলের সাক্ষাৎ—পাঠক সে কথা জানেন। পারুলের বহু অনুরোধেও বিনয় সে দিন তাহাদের বাসায় যাইতে সম্মত হইল না। তবে কথা দিয়া গেল, দুএক দিনের মধ্যে সে চলিয়া আসিবে।

সর্ব্বেশ্বরী পারুলের নিকট হইতে বিনয়ের সংবাদ পাইবামাত্র নিতাইকে দার্জ্জিলিং পাঠাইয়া দিলেন—যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আনিতেই হইবে। নিতাইকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি সগৌরবে ঘোষণা করিলেন—দেখ, আগেই বলেছিলাম। অবিনাশবাবু নীরবে সমস্ত শুনিয়া আর এক টিপ নস্য লইয়া কনস্তান্তিনোপলের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বেশ্বরী নিজের স্বামীসৌভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বিনয় ও নিতাইএর জন্য ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিত্যসঙ্গী পানের বাটা অনাদরে পড়িয়া রহিল।

নিতাই বিনয়কে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কার্সিয়াং-এ আসিতে সকলের অনুরোধ জানাইল। বিনয় তাহা এড়াইতে পারিল না, বোধ করি ইচ্ছাও ছিল না। সে বোর্ডিংএর দেনা শুধিয়া কার্সিয়াং রওনা হইল। আসিবার সময় বিক্রমজিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাহাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া এক চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিল। তাহাকে একবার কার্সিয়াং গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইল। তারপরে দুইজনে কার্সিয়াং যাত্রা করিল।

সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে একেবারে পাইয়া বসিলেন। একদণ্ড তাহাকে চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। একহাতে পানের বাটা অন্য হাতে বিনয়কে লইয়া তিনি সর্ব্বদা ঘুরিতেন। যখন তখন পান খাইয়া বেচারা বিনয়ের ঠোঁট পুরু হইয়া গেল।

অবিনাশবাবুর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিল না। মাঝে মাঝে তিনি পত্নীর তাগিদে কর্ত্তব্যপরায়ণতায় সজাগ হইয়া উঠিতেন। সজাগ হইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাতে এক ডল্যুম গিবন কিংবা হিরো-ডোটাস তুলিয়া দিতেন। বিনয়ের পক্ষে সর্ব্বেশ্বরীর তাম্বুল অপেক্ষা অবিনাশবাবুর নীরস গিবন অনেক সুখকর ছিল।

যাহারা নিছক প্রেমের বন্ধনের উপর বিশ্বাসী সর্ব্বেশ্বরী সে দলের নহেন। তিনি জানেন, প্রেমের মাধুর্য্যকেও আয়ত্তে রাখিতে হইলে কঠিনতর বন্ধনের আবশ্যক—যেমন আবশ্যক মিছরির দানার মধ্যের সূত্রখানি। বস্তুত ঐ নীরস সূত্রখানা আছে বলিয়া মিছরি দানা পাকাইয়া উঠিতে পারে! মিছরির পক্ষে যেমন সুতাগাছা, বিবাহিত প্রেমের মাধুর্য্যে তেমনি অবহিত শাশুড়ীর সদাজাগ্রত সতর্কতা।

সর্ব্বেশ্বরীকে অবলম্বন করিয়া পারুলের প্রেম জমিয়া উঠিতে লাগিল কিনা জানি না, কিন্তু বিনয়ের মন আসন্ন বৈবাহিক সুখসৌভাগ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। হায়, স্বর্গেও দুঃখ আছে, গভীরতম পত্নীপ্রেমেও শাশুড়ীর খবরদারি আছে!

দিন দুই পরে গৌরচন্দ্রিকার অবান্তর অংশ একেবারে বাদ দিয়া সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা বিনয়, তাহলে শুভকার্য্যটা কোথায় হয়, তোমার ইচ্ছা?

বিনয়ের পক্ষে সকল জায়গাই সমান, কারণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বেশ্বরীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, কাজেই সে বলিল, আপনাদের যেখানে সুবিধা। সর্ব্বেশ্বরী অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, তা তো বটে; তবে একবার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। সর্ব্বেশ্বরীর আনন্দ এতখানি হইয়াছিল যে, শাশুড়ীর এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে কর্ত্তাকে অংশীদার করিতে অসম্মত হইলেন না। অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ

কলিকাতাতে হইবে, যত শীঘ্র সম্ভব, শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগেই। আর, স্থির হইল—অবশ্য ইহা সর্ব্বেশ্বরীর মনে মনে—যে, বিনয়কে বিবাহের আগে হাতছাড়া করা হইবে না। বিনয় সর্ব্বেশ্বরীর নজর-বন্দী হইল। ভাবীপত্নীর নজর-বন্দীত্বে হয় তো কিছু পুলক আছে, কিন্তু ভাবী শাশুড়ীর ?—বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিও।

সেদিন সকলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বাহিরে একটা সোরগোল উঠিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকলে বাহির হইয়া আসিল। রায়-পরিবারের বাসার পাশে খানিকটা সমতল মাঠ ছিল, সেখানে কখনো কখনো ফুটবল খেলা হইত। সেইখানে ব্যাপারটা। যে-দৃশ্য নজরে পড়িল তাহাতে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘটনাটি এই রকম।

বিক্রমজিৎ বিনয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য কাসিয়াং আসিয়া অনেক খুঁজিয়া তাহার বাসার সন্ধান পাইয়া সেখানে আসিতেছিল। সেই গাধাটির উপরে সে আরূঢ়, তাহার গলায় 'দি হর্স' লেখা ঝুলিতেছে, দর্শকদের প্রতি অনুরোধাত্মক সতর্ক-বাণী। বিক্রমজিতের দেহে পূর্ব্বপরিচিত সেই শিকারের পোষাক, এক হাতে লাগাম, অন্য হাতে একখানা পতাকা। বাসার কাছে আসিয়া নিতাইএর সহিত সহিত তাহার সাক্ষাৎ। নিতাই এই অপূর্ব্ব-দর্শন লোকটিকে দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার দোষ নাই—এ-দৃশ্যে স্বয়ং গিরিরাজেরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন। নিতাইএর চপলতায় বিক্রমজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। নিতাই তাহাতে আরও কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ ঘটিল নিতাইএর দৃষ্টির সূক্ষ্মতার অভাবে। সে গাধাটিকে দেখিয়া গাধা গাধা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ততোধিক উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল বিক্রমজিৎ—মঁসিও, অপমান করবেন না,

'ইট ইজ দি হর্স'। বিক্রমজিতের এই দৃঢ়তায় হয় তো গোলমাল মিটিয়া যাইত, হয় তো নিতাই জানোয়ারটাকে 'দি হর্স' বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া লইত। কিন্তু স্বয়ং 'দি হর্স' ইহার প্রতিবাদ করিয়া অত্যন্ত গর্দ্দভ-সুলভ রবে তারস্বর চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে নিতাইএর অপেক্ষা বিক্রমজিৎই যেন অধিক বিস্মিত হইল। তাহার এতদিনের সমস্ত সস্নেহ শিক্ষা ব্যর্থ হইল, গাধার ডাকের উচ্চনিনাদের মধ্যে কোথাও অশ্বের হ্রেষার আভাস মাত্র পাওয়া গেল না। সে গাধার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিল—ডিয়ারি, ডিয়ারি, 'আবাসার্ড' 'আবাসার্ড'। এবং 'আবাসার্ড' কি দেখাইবার জন্য নিজেই ঘোড়ার স্বরের অনুকরণে চিঁহি চিঁহি করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। গাধাটি নিজের কানের কাছে কাল্পনিক হ্রেষা শুনিয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজের স্বর ক্রমে পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিল। তখন বিক্রমজিৎ আর কোন উপায় না দেখিয়া পতাকা ও লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে সজোরে গাধার কণ্ঠ চাঁপিয়া ধরিল—স্নেহে যাহা পারে নাই, শক্তিতে তাহা করিবে। দৃঢ় হাতের নিষ্পেষে দমবন্ধ-প্রায় গাধা আত্মরক্ষার জন্য পিছনের পা-দুটি খাড়া করিয়া দিল, বিক্রমজিৎ গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গাধা ছুটিয়া মাঠের অপর প্রান্তে গিয়া বারংবার মাথা উঁচু নীচু করিতে করিতে, বোধ হয় বহুদিন পরে প্রাণ খুলিয়া স্বজাতিসুলভ ডাক ডাকিতে লাগিল।

বিক্রমজিৎ ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে নিতাই তখনো হাততালি দিয়া হাসিতেছে। বিক্রমজিৎ প্রথম কথা বলিল—আই চ্যালেঞ্জ ইউ। নিতাই সগর্ব্বে বলিল—আই অ্যাকসেপ্ট। বিক্রমজিৎ নিতাইকে নিরস্ত্র দেখিয়া বলিল—নো আনফেয়ার গেম। এই বলিয়া সে নিজের তরোয়ালখানা (কাঠের, উপরে রাংতা জড়ানো) নিতাইকে দিল এবং

নিজের নিশানের ডাণ্ডা হাতে করিয়া দুইজনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তারপরে এক বিষম ব্যাপার। যে দৃশ্য বর্ণনা করিতে সারভাঁত বা সেক্সপীয়রের লেখনীর আবশ্যক, আমি তাহার চেষ্টা করিব না। হিমালয়ের উপরে এমন দুই জীবের অসিযুদ্ধ অসম্ভব না হইলেও দুঃসম্ভব বটে, নতুবা আমাদের পূর্ব্বকবিগণ মহাদেবের কৈলাসে নন্দী-ভৃঙ্গির কল্পনা করিলেন কেমন করিয়া!

বিনয় ও রায়-পরিবার যখন বাহির হইয়াছে তখন দুই জনে অসিযুদ্ধ চলিতেছে। সর্ব্বেশ্বরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও বাবা বিনয়, আমার নিতাইকে মেরে ফেল্লে। সর্ব্বেশ্বরী অত্যুক্তি করেন নাই। ঠিক তখনি নিতাই চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, আর বিক্রমজিৎ জয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—'দি হর্স, দি হর্স'। এতক্ষণে যেন তাহার বাহনের অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল। এমন বাহন-প্রীতি কে কবে দেখিয়াছে, বাহনের অপমানের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করা প্রতিজ্ঞা! গাধাটা বোধ হয় এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিক্রমজিতের পরাজয় কামনা করিতেছিল, সে বিক্রমজিতের জয়গর্ব্বিত 'দি হর্স' রব শুনিয়া পুনরায় বিক্রমজিতের মর্ম্মবিদারক স্বরে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে স্বজাতিয়ত্ব প্রচার করিয়া দিল। বিক্রমজিৎ ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠল—আনগ্রেটফুল। গাধা পিটাইয়া কখনো ঘোড়া হয়? ভালবাসাতেও হয় না। হায় গাধা!

বিনয় তাড়াতাড়ি গিয়া নিতাইকে তুলিল এবং বিক্রমজিৎকে থামাইয়া উভয়ের মধ্যে পরিচয় স্থাপন করিয়া দিল। সে বিনয়কে দেখিয়া ও নিতাইয়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ক্ষমার সুরে নিতাইকে বলিল—মঁসিও, ক্ষমা করবেন, জানতাম না যে, আপনি মঁসিও চৌধুরীর ভাবী শ্যালক—এই বলিয়া সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে

লাগিল। নিতাই মনে মনে বলিল—আর তুমি আমার বর্ত্তমান…। বিনয়ের সহিত দুইজনে বাসায় ফিরিল। সর্ব্বেশ্বরী লোকটাকে দেখিয়া বাসা ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন, অবিনাশবাবু পাশের ঘরে গিবনের মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, পারুল জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বিনয়, নিতাই, বিক্রমজিৎ তিনজনে টেবিলের পাশে বসিয়া আলাপ আরম্ভ করিল। পারুল জলখাবার লইয়া আসিলে নিতাই তাহার পরিচয় দিল। বিক্রমজিৎ তাহাকে সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিল। জলযোগ শেষ হইল। বিক্রমজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ, আপনারা জানেন কাল আমি হিমালয়ের অভ্যন্তরে যাত্রা করব। সে বিপদসঙ্কুল দেশ থেকে না-ও ফিরে আসতে পারি, নাই বা এলাম। যদি দেখেন যে, আমি একমাসের মধ্যে ফিরলাম না, তবে আপনি, মঁসিও বিনয়, খবরের কাগজে আমার একটা বিবরণ প্রকাশ করবেন।—এই বলিয়া সে নিজের শিকারীবেশের একখানা ব্লক পকেট হইতে বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিল—এই আমার ছবি ; ছবির তলায় লিখে দেবেন—"Just for an Ideal he left us." আপনাদের শুভবিবাহে হয় তো আমি উপস্থিত থাকতে পারব না, কাজেই সেই উপলক্ষ্যে সামান্য যে একটি উপহার আমি দিতে চাই, তা এখনি দেব। বিনয় আগে লক্ষ্য করে নাই, এখন করিল, কথা বলিতে বলিতে বিক্রমজিতের মাঝে মাঝে দুই কাঁধ উপরের দিকে ঝাঁকানি দিবার একটা অভ্যাস ছিল। সে পকেট হইতে একটি হাতীর দাঁতের কৌটা বাহির করিল। কৌটাটি সন্তর্পণে খুলিয়া একটি ছোট রূপার ঝিনুক বাহির করিয়া ফেলিল। ঝিনুকটি সগর্ব্বে হাতে করিয়া বলিল—এই আমার উপহার। পারুল লাল হইয়া উঠিল।

—আপনারা একে সামান্য ভেবে তুচ্ছ করবেন না। এর মধ্যে একজন লোকের প্রকাণ্ড অরচিত ইতিহাস আছে। সে বেচারা এই সামান্য নৌকাটি করে সংসারসমুদ্র পাড়ি দেবে ভেবেছিল। নৌকা যখন প্রস্তুত, সমুদ্রতীরে এসে দেখে সমুদ্র শুকিয়ে দুস্তর মরুভূমি হয়ে গেছে। তারপর থেকে সে বহুদিন এই নৌকাটি ঘাড়ে করে ফিরেছে। আজ তাকে আপনাদের হাতে সঁপে দিলাম। আপনারা এর সদ্ব্যবহার করবেন। কি বলেন মঁসিও? কিছু বুঝতে পারলেন না, তাই না? যেন একটা allegory বলে মনে হচ্ছে! হবেই তো, ছোট বেলা কবিতা লিখতাম কিনা! এই বলিয়া সে কৌটা ও ঝিনুকটি পারুলের হাতে দিল। পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিয়া বলিল—মঁসিও, এতে আমার জীবনী আছে, আমার মৃত্যুসংবাদ পেলে এটা ছাপাবেন, এতে শিল্প নেই, কিন্তু সত্য আছে। আজ এই পর্য্যন্ত। এই বলিয়া সে বসিয়া পড়িল।

বিক্রমজিতের এই হাস্যোদ্দীপক কথাবার্ত্তায় এমন একটা করুণা-পূর্ণ সম্ভ্রমের ভাব ছিল যে, নিতাই পর্য্যন্ত তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারা চারিজন নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না। বাহিরের সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া গেল। আর সেই অন্ধকারে চারিটি নিশ্বাসের স্পন্দন তালে তালে ধ্বনিত হইতে থাকিল।

৭

ক্রমে হিমালয় হইতে নামিয়া যাইবার সময় আসন্ন হইল। স্থির হইল, বিনয় রায়-পরিবারের সহিত কলিকাতায় যাইবে, তারপর যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ হইবে।

সেদিন বিকালে বিনয় ও পারুল বেড়াইতে বাহির হইল। দুজনে পাশাপাশি নীরবে চলিয়াছে। সদর পথ ছাড়িয়া তাহারা পাহাড়ের দিকে চলিল। চারিদিকে স্তব্ধ গিরিশিখর, নিম্নে গভীর বন। এই কয়দিনে বিনয়ের মনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের হাত এড়াইবার জন্য সে প্রকৃতির কোলে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল; প্রকৃতি আবার তাহাকে মানুষের হাতে ফিরাইয়া দিল। একদিন তাহার জীবনে প্রকৃতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া মানুষকে পট-ভূমিতে সরাইয়া দিয়াছিল। আবার কখন প্রকৃতি অলক্ষিতে পট-ভূমিতে সরিয়া গিয়াছে, মানুষ রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বয়ং গিরিরাজও মানুষকে আটকাইতে পারেন নাই। বিনয় এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতেছিল। প্রকৃতি ও মানুষ টানা-পোড়েনের মত তাহার জীবন-উত্তরীয় বুনিয়া তুলিতেছে। বিনয় তাকাইয়া দেখিল, পশ্চিমের একটি শিখরের পশ্চাতে সন্ধ্যাসূর্য্য অস্ত যাইতেছে; সেই অস্তসূর্য্যের পটভূমিতে পড়িয়া পাহাড়টা যেন অনেকটা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু সে কতদূরে। আর মানুষ! ঠিক পাশেই তাহার পারুল, যাহার দুএক গুচ্ছ শিথিল কুন্তল তখনো তাহার গায়ে উড়িয়া পড়িতেছিল, কষায়-মধুর যাহার

সৌরভ পথ-ভোলা মৌমাছির মত তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে-ছিল। মানুষের হাতে আজ প্রকৃতির পরাজয় ঘটিল।

যাঁহারা কাসিয়াং-এ গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেখানকার কোনো কোনো গিরি-অবকাশ দিয়া বহুদূর দিগন্তশায়ী সমতল-ভূমি দেখা যায়। পথের অপ্রত্যাশিত বাঁকে মাঝে মাঝে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। সে এক বিস্ময়কর চমক। বিনয়রা এই রকম একটা গিরি-অবচ্ছেদের দিকে যাইতেছিল। সে জায়গায় হিমালয় অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়া যেন দুই দিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া অনন্তকে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহাকে ধরিতে পারিল না, তাহার জন্য নিষ্ফল বাহু মেলিয়া গিরিরাজ পড়িয়া আছে। তাহারা দুইজন সেখানে গিয়া বসিল। বিনয় এ দৃশ্য আগে দেখে নাই। হঠাৎ দূরবর্ত্তী সমতলভূমি দেখিয়া কেমন যেন একটা তৃপ্তি বোধ করিল। এতদিন সে যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, এইবার তাহার কারণ বুঁঝিতে পারিল। সমতলবাসী জীব কিছুদিন পাহাড়ে থাকিলে মনে মনে ব্যথিত হইয়া উঠে, কিন্তু কিসের সে বেদনা বুঝিতে পারে না; বুঝিতে পারে তখনই যখন সে আবার মাটিতে নামিয়া আসে। আজ হঠাৎ দূরবর্ত্তী বাংলাদেশের সমান মাটি দেখিয়া কোথায় তাহার অস্বস্তি সে বুঝিতে পারিল।

পাহাড় সেখানে ক্রমনিম্ন কয়েকটা গিরিশিখরে শেষ হইয়া গিয়াছে—তার পরে সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে সমতল মাঠ। সে এক ব্যাকুলতার চমক-লাগানো দৃশ্য! পায়ের নীচেই বিরাট বনস্পতির অরণ্য, খেলার বাগানের চারাগাছের মত। মহানন্দা নদীটি একটি রূপার রেখা। তিন দিনে অতিক্রম করা যায় না এমন সব উপত্যকা একেবারে মুষ্টিমেয়। তার পরে আর কিছু নাই কেবল একটানা মাঠ,

মাঝে মাঝে কালো কালো দাগে অরণ্যের কাল্পনিক অস্তিত্ব। দিগন্তরে দৃষ্টি চলিতে চলিতে এক সময়ে ধূসর কুয়াশায় বাধা পায়, সন্ধ্যাবেলা সেখানে জোনাকীর মত ক্ষীণ আলোর বিন্দু লাফাইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—শিলিগুড়ির বৈদ্যুতিক বাতি।

বিনয় ও পারুল দুজনেই এ দৃশ্যে চমকিত হইয়া গেল। তাহারা এতটা অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল—কেবল একজনের হাতের উপরে অন্যের হাত উভয়ের অলক্ষিতে পড়িয়া রহিল।

এমন করিয়া বিনয় কখনো বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করে নাই। অনন্তাভিমুখী হিমালয়ের এই পাদপীঠটি, ইহাতে বসিয়া বাংলাকে দেখিবার জন্যই যেন বিশেষ ভাবে ইহা রচিত। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে হঠাৎ সে আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আসিয়া যাহা সে দেখিল, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

বাংলার যে মূর্ত্তিকে সে দর্শন করিল, তাহা রাজনীতিকের আন্দোলন-ক্ষুব্ধ দেশ নয়, না তাহা বিদেশী রাজার অন্যমনস্ক কলমে অঙ্কিত নির্জ্জীব মানচিত্র!

এ সেই বাংলা, অশ্রুতে যার অভিষেক, হাস্যে যার আরতি, প্রত্যেক বাঙালীর হৃদকমলের সৌরভে যার অন্তহীন বন্দনা। এ সেই ভাব, কবির বীণাকে যা অলক্ষিতে চঞ্চল করিয়া তোলে, কবির বাণীতে যা অতর্কিতে নন্দনের মর্ম্মর আনিয়া দেয়। এ সেই ভাব, গায়কের যা কণ্ঠে, শিল্পীর তুলিতে, ভাস্করের যন্ত্রে অভাবিত আকৃতি সঞ্চার করে। ব্যথাকে যা আনন্দ, সুখকে শান্তি, মৃত্যুকে জীবন বর দেয়। এ সেই রূপ, একটি বাঙালীর চোখেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবার জন্য লক্ষ বৎসর যা মাতার ধৈর্য্যে সন্তানের দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এ সেই তারার আলোয় জাগিয়া থাকা, চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখা, দিন রজনীর নিমেষ গোণা, শুক্কথা বাংলাদেশ। এ সেই দেশ, আসন্ন অন্ধকারের বিষন্ন ভাটিয়ালিতে একবার মাত্র যা গোধূলির প্রান্তে দেখা দিয়া যায়, তারপরে সারা রাত্রি কী দুঃখের জাগরণ! এ সেই দেশ, নারিকেল-অরণ্যের মুহুঃশ্বসিত স্পন্দনে একবার মাত্র যার চাপা দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হইয়া ওঠে—তারপরে আত্মবিলয়ের সে কী চেষ্টা।

বর্ষায় তমালী, শরতে সবুজ, হেমন্তে সঘন, শিশিরে শীর্ণ, বসন্তে পুষ্পিত, গ্রীষ্মে সফল—নানা ঋতুর বাংলা। আষাঢ়ে ব্যাকুল, আশ্বিনে মিলিত, অঘ্রাণে খুসী, চৈত্রে চঞ্চল, নানা ভাবের বাংলা। গঙ্গায় পূত, পদ্মায় দুর্দ্দাম, মেঘনায় গম্ভীর, নদীতে কোমল, শস্যে শ্যামল, গিরিতে অটল বাংলা!

আর এ সেই দেশ, অবশেষে একদিন যে হৃদ্‌পদ্মের উপরে তাণ্ডবের তাল শুনিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া ওঠে। তখন কবির কণ্ঠে দীপক বাজে, গায়ক গাহে নট-নারায়ণ, আর ভাস্করের যন্ত্রে পাথরে পায় প্রাণ! প্রেমিক ছাড়ে কোণ, প্রণয়ী ছাড়ে ঘর, ছেলেরা ছাড়ে কোল, মেয়েরা ভাঙে শাসন। নৈমিত্তিক সতর্কতার নিয়ম তুচ্ছ করিয়া বাঙালী সেদিন সুধাভ্রমে বিষভাণ্ড তুলিয়া পান করে, মরে, মরে, আর হাসে। মরিতে মরিতে হাসে, হাসিতে হাসিতে মরে। বাংলা সেদিন কাঁদে, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসে।

বিনয় এই মূর্ত্তি দেখিল, ভাবিল, এমন ভাবে সে দেশকে কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই ভাবসর্ব্বস্ব নারীমূর্ত্তি অতীতের রঙ্গমঞ্চে বসিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে, ললাটের একান্তে বর্ত্তমানের একটি অতিতুচ্ছ কৃষ্ণতিল। সে অভিভূতের মত

বাংলার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল; তাহার সহিত যেন হিমালয়ের শিরও নত হইয়া পড়িল। পারুলেরও একটি প্রণতি বিনয়ের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করিল। উভয়ে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, রাত্রি তখন গভীর, অন্ধকারে হিমালয়ের উচ্চতা ও সমতলের নিম্নতা সব এক হইয়া গিয়াছে।

পদ্মাগর্ভে

১

কঙ্কণ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একমনে একটি টোপর গড়িতেছিল। তাহার পাশে একরাশি সদ্যস্ফুট বেলফুলের মত সুপ্ত একটি শিশু। কঙ্কণ এক একবার টোপর হইতে চোখ তুলিয়া ছেলেটির দিকে তাকায়, একটু হাসে, আবার কাজে মন দেয়। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া আদর করে, কিন্তু শিশুটি ঘুমাইতেছে, হাতের কাজটিও জরুরি।

ইহার আগে আমরা যখন কঙ্কণকে দেখিয়াছিলাম, সে ছিল রুগ্ন ক্লিষ্ট, আসন্ন মাতৃত্বের উপকূলবর্ত্তিনী। আজ তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শরীরের সে কৃশতা নাই, মনের সে বিমর্ষভাব গত। তাহার যা ক্ষতি হইয়াছে শিশুটিকে পাইয়া তাহার অনেকটা যেন পূর্ণ হইয়াছে। নূতন মাতৃত্বে, শুভ্র বসনে, শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, যেন, বর্ষাবিধৌত আশ্বিনের স্নিগ্ধনবীন আলোকটিকে অঙ্কে করিয়া কাশকুসুমফুল্ল শরৎ কালের নদীতীরের নির্ম্মল নির্জ্জন প্রভাতটি।

কঙ্কণের এই নির্ম্মলতার সহিত বাহিরের প্রকৃতির খানিকটা মিল ছিল। যদিও আজ কেবল শ্রাবণ মাসের শেষ, বর্ষার মরসুম পুরাদমে চলিতেছে, তবু গতকাল হইতে আকাশের আলোতে এবং আউশ

ধানের শীষে শীষে অকারণে শরতের আভাস দেখা দিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে এমন ব্যাপার মোটেই অপ্রাকৃত নয়। আকাশের প্রান্তে বনের মাথায় ধূসর কালো মেঘের স্তূপ; কেবল মধ্য-আকাশে এক ঝলক নবজাত শারদীয় সূর্য্যকিরণ; যেন সদ্যোজাত কুমারকে কোলে করিয়া মহাদেবের নন্দীভৃঙ্গী ও প্রমথবর্গ সস্নেহ কৌতূহলে পরীক্ষা করিতেছে। পদ্মার ধারে ইতিমধ্যেই এক রাশ কাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহারা কেমন যেন মন-মরা, বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের এই অকালে নিদ্রা-ভঙ্গ বিশেষ সুখের নয়। আউশের পক্কপ্রায় ধানের ক্ষেত অপ্রত্যাশিত শরতের আলোতে ঝলমল করিতেছে। চরের জলাশয়টাতে একদল বুনো হাঁস অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কলরব করিতে ব্যস্ত। বর্ষাক্লিষ্ট মলিন পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য শারদীয় শুভ্রতা আসিয়াছে, আর আকাশের আলোকে শ্বেত পদ্মবনের পবিত্রতা। পৃথিবীর এই ক্ষণপ্রাণ শরৎকাল একটি বিরাট শুভ্র রাজহংসের মত অতি দূর আকাশের ঐ আলোকের পদ্মবনের জন্য যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

কঙ্কণ একবার এই অকাল শরতের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল, আর একবার নিদ্রিত ছেলেটির দিকে তাকাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে যেন কোথায় একটা ঐক্য আছে। সে কি তাহাদের সদ্যোজাত সৌন্দর্য্যের নবীনত্বে, না তাহাদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে! মাঝে মাঝে সে চমকিয়া ওঠে, নদীর তীর ভাঙিয়া পড়ার বিরাট গর্জ্জনে। বর্ষা যে তাহার দখল ছাড়ে নাই, কেবল অধিকতর উদ্যমে আক্রমণ করিবার জন্য একটু বিশ্রাম করিতেছে, তাহারই প্রমাণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গত বছর হইতে চরে ভাঙন লাগিয়াছে; সে ভাঙনে চরচিলমারীর অর্দ্ধেকের বেশি পদ্মাসাৎ হইয়াছে। কঙ্কণদের যে-জমি ছিল, তাহার প্রায় পনেরো আনা ভাঙিয়া গিয়াছে। কঙ্কণদের বাড়ীর পাশের

মুসলমান-পল্লীর অধিকাংশ গৃহস্থ চর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। কঙ্কণেরও যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোথায় সে যাইবে! সে যে উঠিয়া যাইবে সে শক্তি নাই, এমন কি ইচ্ছাও বোধ করি নাই। এবার বর্ষার প্রথম হইতেই ক্ষুধিত পদ্মা গ্রাসের পরে গ্রাসে চরের জমি গ্রাস করিয়া চলিয়াছে, ক্রমঃপ্রাগ্রসরশীল বুভুক্ষু ওই অজগরটার সম্মুখে কঙ্কণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

কঙ্কণের দিন চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। যে-জমির ফসল তাহার সম্বল ছিল, তাহা পদ্মার উদরে। করিম তাহার আশ্রয় ছিল, সে কয়েক মাস পূর্ব্বে বিপক্ষের দলে যোগ দিয়াছে, সম্প্রতি সে চর ছাড়িয়া গিয়াছে। বাদলকে কঙ্কণ তাহার মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে, এখন সে একাকী, সে আর তাহার মাস দুয়েকের ছেলেটি। উদরান্নের জন্য এখন সে শোলার টোপর, মালা প্রভৃতি গড়িয়া থাকে। টোপর গড়িয়া পরিচিত কাহারো হাতে দেয়, সে সহরে বেচিয়া পয়সা আনিয়া কঙ্কণকে দেয়। যখন সে রকম লোক মেলে না, ছেলেটিকে কোলে করিয়া নিজেই সহরে যায়। টোপর গড়া প্রায় এক রকম সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আবার তাহা ধরিয়াছে। বিবাহের জন্য টোপর গড়িতে গেলেই তাহার বিনয়কে মনে পড়ে! তাহার মনে পড়ে, বিনয় যেদিন হাঁসটি ফেরৎ দিতে আসিয়াছিল, সে একটি টোপর চাহিয়াছিল। কঙ্কণ ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, টোপরে তাহার কি প্রয়োজন! অপ্রতিভ বিনয় বলিয়াছিল, টোপরটি সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিবে। বিনয়ের সেই অপ্রস্তুত ভাব মনে পড়িয়া এতদিন পরেও কঙ্কণের হাসি পাইল। কঙ্কণের প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল, বিনয়ের বিবাহে সে টোপর গড়িয়া দিবে। জীবনের কত আশাই না অপূর্ণ রহিয়া যায়, এ আশাও তাহার পূর্ণ হইল না।

দুইদিন আগে বিবাহের জন্য একটি টোপর গড়িবার ফরমাস সে পাইয়াছিল। অন্যবারের মত কেন যেন তাহার এটাকে গতানুগতিক ভাবে তৈয়ারী করিতে ইচ্ছা হইল না! তাহার সমস্ত কারুকার্য্য, নিপুণতা, সমস্ত উপাদান দিয়া বহু যত্নে সে টোপরটি গড়িতেছিল। গড়িতেছিল আর ভাবিতেছিল বিনয়ের বিবাহে এমন একটি মুকুট গড়িয়া দিবার কল্পনা তাহার মনে ছিল।

পাছে শিশু জাগিয়া উঠিয়া তাহার কাজে বাধা দেয় কঙ্কণের এই ভয় ছিল, ঘটিলও তাই। শিশু জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন কঙ্কণ মুকুট রাখিয়া তাহাকে কোলে লইল। খোকার বোধ করি ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া সে ঘর হইতে এক বাটি দুধ আনিয়া তাহাকে ঝিনুক দিয়া পান করাইতে সুরু করিল। মায়ের কোলে উঠিয়া তাহার কান্না থামিল, সে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অকারণ হাসিতে লাগিল।

আজ এক মাস হইল বাদল মামার বাড়ী গিয়াছে। এই একমাসের মধ্যে কঙ্কণের কথা বলিবার লোক এই শিশুটি মাত্র। মায়ে আর ছোট ছেলেতে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। খোকা হাসে, মা হাসে; খোকা কাঁদে, মা কাঁদে; খোকা হাত নাড়ে, মা হাত নাড়িয়া উত্তর দেয়। মা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, খোকা অতীতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। মা বিশ্বাস না করিয়া হাসে, খোকা আকাশের চাঁদকে সাক্ষী মানে।

কঙ্কণ খোকাকে দুধ পান করাইয়া, গা মুছাইয়া চোখে কাজল পরাইয়া দিল। তাহার কুন্দফুলের মত শুভ্র মোটা সোটা নরম দুই-খানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া কত কি বকিয়া চলিল। খোকা

তাহা শুনিয়া কখনো হাসিল, কখনো কাঁদিল, কখনো কেবল মার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন কঙ্কণের কি মনে হইল জানি না, সেই মুকুটখানি লইয়া খোকার মাথায় পরাইয়া দিল। সেই ক্ষুদ্র মস্তকের অনেকটাই মুকুটের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। খোকা মজা ভাবিয়া হাসিতে লাগিল, এবার মায়ে খোকায় অমিল হইল, কঙ্কণের চোখে জল দেখা দিল। কঙ্কণ দেখিল খোকার চোখ ও কপালের গঠন বিনয়ের মত, তাহার হাসিতেও যেন বিনয়ের হাসির আভাস। খোকার মাথায় মুকুট পরাইয়া সে ভাবিল বিনয়ের মাথায় পরাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে যেমন সুখী হইবে সে ভাবিয়াছিল তেমন কিছুই হইল না, অকারণে অকস্মাৎ দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। খোকা এত কথা বুঝিল না, সে হাসিতেই থাকিল।

হঠাৎ নদীর তীর ভাঙার বিশাল শব্দে কঙ্কণ চোখ তুলিয়া দেখিল, দিনের আলো বুজিয়া আসিয়াছে। শরৎ আলোর পদ্মবনে মেঘের দিগ্‌গজ প্রবেশ করিয়া সব তছনছ করিয়া দিল। ধানের ক্ষেত মেঘের কালো ছায়ায় ম্লান হইল, কাশের বন ধূসর হইল, পদ্মার ঘোলা স্রোত ঘোর বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ওপারের বন-রেখাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া বৃষ্টির ধাবমান জলযবনিকা ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বৃষ্টিপতনে পদ্মার স্রোত ঝর ঝর করিয়া উঠিল, ধানের ক্ষেত সর সর করিয়া উঠিল, অবশেষে ঘরের চালে তাহা ঝম ঝম শব্দে ঝরিতে লাগিল। আহার-অন্বেষী কাকের দল পাখা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গাছে আশ্রয় লইল, রাখাল-ছেলেদের টোকা মাথায় দিয়া ভেজা ছাড়া আর উপায় নাই। মাঝে মাঝে পিতল-রঙা বিদ্যুৎ শাখাপ্রশাখা মেলিয়া নাচিয়া উঠে, তার পরে মেঘের চাপা আর্তনাদ।

কঙ্কণ বসিয়া শ্রাবণের বর্ষা দেখিতে লাগিল। পূবে হাওয়া নিম

গাছের ডালপালা দোলাইয়া তাহার গায়ে জলের ছিটা দেয়, কঙ্কণ সরিয়া বসে—আবার আর একটা দমকা বাতাস আসে, জল ছুটিয়া আসে, সে আর একটু সরিয়া যায়।

অবশেষে সে ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। বাহিরে আকাশে বাতাসে বর্ষায় গাছেপালায় মাতামাতি। অবিশ্রাম বৃষ্টির নিরন্তর ঝর্ঝর। কেবল রহিয়া রহিয়া পদ্মার দ্বিগুণিত কলধ্বনির মধ্যে ছেদ আনিয়া দেয় পাড় ভাঙার কামানগর্জ্জন। সারাদিন ধরিয়া পাড় ভাঙিতেছে, কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিনামাতে সে শব্দ একান্ত অবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিল। কঙ্কণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, আর দিন-দুই এই রকম পাড় ভাঙা চলিলে তাহার খোকার কি হইবে! কিন্তু যাহার জন্য ভয়, সে হাসিতে থাকে, কঙ্কণ সেই হাসিতে হাসে। চোখের জল গড়াইয়া ওষ্ঠের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে, অমনি সেখানে এক ঝলক হাসি ফুটিয়া ওঠে। হাসিকান্নাকে আমরা যত পর ও দূর ভাবি বোধ হয় তাহা তত নয়।

২

গ্রামের নাম কার্ত্তিকপুর। জেলার নাম মুর্শিদাবাদ। গ্রামখানি ছোট, আগে পদ্মা হইতে দূরে ছিল, এখন ভাঙনে পদ্মার ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। এ সেই রায়-পরিবারের পৈতৃক গ্রাম, যেখানে সর্ব্বেশ্বরীর বাহান্ন বিঘার জমিদারী।

বিনয় ও পারুলের বিবাহ কলিকাতায় হইবে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু যতই বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল, ততই নানা বাধা

বন্ধুবান্ধবের পরামর্শরূপে দেখা দিতে লাগিল। সর্ব্বেশ্বরীর বন্ধুরা ও পারুলের সঙ্গিনীরা আনন্দ জ্ঞাপনের ছলে এমন সব কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল, যাহাতে সর্ব্বেশ্বরী বুঝিলেন, কলিকাতায় থাকিলে শেষ মুহূর্ত্তে হয় তো বিবাহ ভাঙিয়া যাইবে। তিনি স্থির করিলেন বিবাহ কাত্তিকপুরে হইবে। কাত্তিকপুরের বাড়ীতে একজন কর্ম্মচারী থাকিত, তাহাকে একখানা চিঠিতে বিবাহের আয়োজন করিতে লিখিয়া দিয়া রায়-পরিবার ও বিনয় বিবাহের একদিন আগে কাত্তিকপুর যাত্রা করিল!

ব্যাপার এমন হঠাৎ ঘুরিয়া বসিল যে, অধ্যাপক রায় গিবনের পুস্তক আলমারীতে রাখিবারও সময় পাইলেন না, তাঁহাকে গিবন হাতেই গাড়ীতে চাপিতে হইল। বিবাহের দিন প্রত্যুষে রায়-পরিবার ও বিনয় কাত্তিকপুরে পৌছিল।

এদিকে বেচারা কর্ম্মচারী মনিব-গৃহিণীর পত্র পাইয়া দুই দিনের মধ্যে গ্রামে যাহা আয়োজন সম্ভব তাহা করিল, অর্থাৎ তাহার মধ্যে না করার অংশই বারো আনা। এতক্ষণ চরকির মত তাহার দেহটা ঘুরপাক খাইতেছিল, এখন সর্ব্বেশ্বরীর তাড়ায় তাহার মাথা সুদ্ধ ঘুরিয়া গেল।

গ্রামে পৌছিয়াই সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে লইয়া বাহির হইলেন। সম্মুখে যাহার ক্ষেত পড়িল সর্ব্বেশ্বরী তাহাই নিজের বলিয়া দেখাইয়া দিলেন—সুবিধা এই যে ক্ষেতের গায়ে মালিকের নাম লেখা থাকে না। কিন্তু তবু যেন পৈতৃক সতেরো বিঘা ও স্বোপার্জ্জিত পঁয়ত্রিশ বিঘা একুনে এই বাহান্ন বিঘা দেখানো হয় নাই মনে করিয়া, তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পদ্মার ভাঙনটা দেখাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—বাবা বিনয়, রাক্ষুসী আমাদের কি সর্ব্বনাশই না করেছে! বিনয় দেখিল পদ্মার পাগল

জলরাশি—আর অতি দূরে একখণ্ড ছোট চর, একদিন যাহা তাহার জীবনের কেন্দ্রে ছিল, আজ তাহা দূরে গিয়া পড়িয়াছে, একেবারে বিস্মৃতির দ্বীপান্তরে।

৩

ছোট গ্রামে একদিনের মধ্যে বিবাহের যা আয়োজন সম্ভব, সর্ব্বেশ্বরীর কর্ম্মচারী রাশু তাহা করিতে ত্রুটি করে নাই। সে সকাল হইতে কোমরে গামছা জড়াইয়া এত ছুটিয়াছে এবং তাহারো বেশী এত হাঁকডাক করিয়াছে যে, তাহাকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। সর্ব্বেশ্বরী যখন কোনো ত্রুটি দেখেন, রাশুকে বকেন, রাশু গিয়া রশুন-চৌকিওয়ালাদের উপরে পড়ে, তাহারা মনের খেদ নানাবিধ রাগ-রাগিণীতে আলাপ করিতে থাকে।

তবু রক্ষা এই যে, বিবাহে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নহে। সময়ের অল্পতা হেতু সর্ব্বেশ্বরীদের দু'চার জন আত্মীয় মাত্র আসিয়াছে, বিনয়ের তরফে কেহ আসিতে পারে নাই। দু'একজনের আসিবার কথা আছে, তবে তাহারা বোধ করি বিবাহের আগে আসিয়া পৌছিতে পারিবে না।

বিবাহ-বাড়ীতে বাহিরে দু'খানি ঘর; একখানি বৈঠকখানা, সেখানে বিনয় উঠিয়াছে। আর একখানাতে ভাণ্ডার; সরা, ভাঁড়, খুরি, দই, সন্দেশে পূর্ণ।

ভিতরে তিন চার খানি ঘর; একখানাতে সর্ব্বেশ্বরী, পারুল ও

আর দুইচারজন মেয়েরা আছেন। অন্যগুলিতে পাক ও আহারের ব্যবস্থা। বাড়ীর ভিতরে গাত্র-হরিদ্রার বস্ত্রে সদ্যবিবাহ-উৎফুল্লা পারুল অকালবসন্তলক্ষ্মীর মত শোভা পাইতেছে। তাহার হৃদয় বসনভূষণে সাজসজ্জায় উন্মীলিত হইয়া গিয়াছে, একটু অবধান করিয়া দেখিলেই তাহা চোখে পড়ে। হঠাৎ কেহ ভোরবেলা উঠিয়া রাত্রির সুস্বপনকে সত্য বলিয়া দেখিলে তাহার যেমন ভাব, পারুলেরও অনেকটা তেমান। তাহার প্রতি-পদক্ষেপে সৌভাগ্যশ্রী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আগের মত অবশ্য ক্ষণে ক্ষণে তাহার ওষ্ঠাধরে হাসি ঝলকিয়া উঠিতেছে না, মুখের স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় সে হাসি সারা দেহে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বেশ্বরী জিনিষ-পত্র মিলাইয়া লইবার জন্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন। রাশু সর্ব্বনাশ গুণিয়া কলাপাতা আনিবার ছলে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া পলাইতেছিল, গৃহিণী পথ আটকাইয়া বলিলেন, রাশু কুশাসন কই? রাশু পাশ কাটাইয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিল,—দুই-ই এক সঙ্গে আসবে মা। সর্ব্বেশ্বরী বিরক্ত হইয়া ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—একেবারে স্তূপীকৃত পান, সাজা এবং গোটা। তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল,—নাঃ, লোকটা কাজ বোঝে বটে—কেবল সময়ের অভাবেই—। তিনি গোটা কয়েক পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিলেন।

এতক্ষণে গৃহিণী বাড়ীর ভিতরে গিয়াছেন মনে করিয়া রাশু ভাণ্ডারের জানালায় উঁকি মারিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা রাশু এখনো ত টোপর আসেনি।

—এই এল বলে মা।

—কিন্তু বাপু টোপর না হ'লে তো বিয়ে হ'তে পারে না।

—টোপর না এসেই পারে না, আর আগাম দাম দিয়েছি, পৌঁছে দেবার কথা আছে।

গৃহিণী বলিলেন—ওইতো হয়েছে খারাপ, দাম পেয়েছে, আর কি তার তাগিদ আছে। তোমার যদি বাপু একটু বুদ্ধি থাকে!

নিরুপায় রাশু গিয়া বাজনাওয়ালাদের উপর পড়িল।—একেবারে সব নবাব। চুপ করে বসে আছে দেখ না। বাজা! বাজা! শানাইওয়ালা মনের দুঃখে করুণ ভৈরবী আলাপ করিতে লাগিল।

৪

দুপুরের দিকে একটি রমণী রায় বাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি কচি ছেলে, অপর হাতে ডালায় একটি টোপর। গৃহিণী তখন ভাণ্ডারে ছিলেন, কেবল পারুল বারান্দায় একাকী বসিয়াছিল। সে সোজা পারুলের কাছে গিয়া টোপরের ডালাটি নামাইয়া রাখিল। মেয়েটি পথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পারুল তাহাকে বসিতে বলিল—বাঃ, ছেলেটিতো বেশ ফুটফুটে। কত বয়স হ'ল?

কঙ্কণ বলিল,—এই দুই মাস চলেছে। ছেলের প্রশংসায় কঙ্কণের মুখে আনন্দশ্রী ফুটিয়া উঠিল। পারুল ছেলেটিকে কোলে লইল। সে পারুলের কোলে গিয়া জাগিয়া উঠিল। পারুল ভাবিয়াছিল, সে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিবে। কিন্তু ছেলেটি হাসিতে লাগিল। পারুল বলিল,—এমন লক্ষ্মী ছেলে তো দেখিনি—আমাকে দেখে হাসছে। কঙ্কণ বলিল,—এখনো মা চিনতে পারে না, মেয়ে মানুষ দেখলেই মা ভাবে। বড় হলে দেখো, খুব দুষ্ট হবে।

—তখন বুঝি কেবলি কাঁদবে?

—তারো চেয়ে বেশি কাঁদাবে—

পারুল বলিল—না, না, ছিঃ, অমন করে' বলতে নেই। তোমার ছেলে বড় হয়ে খুব বড়লোক হবে।

—তোমার আশীর্ব্বাদ দিদি—

পারুল জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বয়স কত ভাই ?

—বয়সের হিসাবে আমিই বড়। পারুল বাধা দিয়া বলিল,—অন্য হিসাবে তুমি বড়, তোমার বিয়ে হয়েছে আমার আগে! কঙ্কণ অনেক চেষ্টা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিল। সে বুঝিল, তাহার একটা পরীক্ষা উপস্থিত।

পারুল বলিল,—তোমার বাড়ি কোথায় ভাই ?

—ওই চরে।

—নদী পার হ'য়ে এলে ?

—তা ছাড়া আর আসবো কি করে ?

—এসেছ বেশ করেছ, আজ রাতটা থেকে যাওনা, আমি মাকে বলবো। থাকো আর না থাকো, তোমার ছেলেটিকে আমি ছাড়ছি না।

কঙ্কণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—তা রাখোনা। একটু থামিয়া আবার বলিল,—ভাবনা কিসের, বছর খানেক পরে এসে তোমার ছেলেটিকে আমি নিয়ে যাবো। পারুল লাল হইয়া বলিল,—দূর!

কঙ্কণ বলিল,—কিন্তু তোমার বরকে দেখা হ'ল না তো! দেখতে কেমন ? পারুল অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিল,—বি—শ্রী!

কঙ্কণ হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা বিশ্রী কি সুশ্রী, একবার দেখে যাবো।

পারুল ঠাট্টার সুরে কহিল,—সর্ব্বনাশ, তোমাকে দেখলে আর তাকে ধ'রে রাখা যাবে না।

—কেন, আমি কি মন্তর জানি?

—মন্তর যে ভাই তোমার রূপে! এমন সময় অদূরে রাশু ও সর্ব্বেশ্বরীকে দেখা গেল। কঙ্কণকে দেখিয়া রাশু গৃহিণীর কানে কানে কি যেন বলিল। সর্ব্বেশ্বরী অগ্রসর হইয়া আসিয়া কঙ্কণকে বলিলেন, বাছা এখানে বসে' কি করছ? টোপরটা বাইরে গোলাঘরে পৌছে দাওগে। কঙ্কণ ছেলে ও টোপর লইয়া প্রস্থান করিল। তখন গৃহিণী ভর্ৎসনার স্বরে মেয়েকে বলিলেন,—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। যে সে লোকের সঙ্গে মেলামেশা অত ভাল নয়। পারুল কিছু না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হ'য়েছে মা? গৃহিণী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ওসব মেয়ের চরিত্র ভাল নয়।

—কি সুন্দর খোকাটি!

গৃহিণী গলার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া কহিলেন,—সুন্দর হলেই হয় না; ওর বিয়ে হয়েছে কিনা, তার ঠিক নাই। যাও বাপু তুমি কাপড়খানা ছেড়ে ফেলো। আজকার শুভদিনটায় যত সব অলুক্ষণে··· বলিতে বলিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

কঙ্কণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া ভাণ্ডারের দিকে যাইতেছিল। সম্মুখেই বৈঠকখানার দ্বারে একজন ভৃত্য বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বর কোথায়!

ভৃত্য বলিল,—এই ঘরেই আছেন। কঙ্কণ অনুরোধ করিল,— দরজাটা খুলে দাওনা, একবার দেখি! ভৃত্য দ্বার মোচন করিল।

কঙ্কণ দেখিল,—বিনয়; বিনয় দেখিল—কঙ্কণ! বিবাহের বেশে বিনয়; বিবাহের মুকুট হাতে কঙ্কণ, কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু। দুইজনে এক পলকের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল, কাহারো কোনো কথা বলিবার শক্তি হইল না। এক পলক কিন্তু এক লক্ষ যুগ!

আগেকার কঙ্কণ হইলে মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত, কিন্তু দুঃখের পাঠশালায় সে পাঠ লইয়াছিল, সে মূচ্ছিত হইল না। অশ্রু-তুষার-নির্ম্মিত মর্ম্মরমূর্ত্তির মত সে স্থাণু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি দীর্ঘশ্বাস সরিল না, একটি অশ্রু ঝরিল না, এমন কি চোখের পাতাও একবার পড়িল না। ভৃত্য কিছু বুঝিল না, সে কিছুক্ষণ পরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে রাশু গোলাঘরের দিকে যাইবার সময় বলিয়া উঠিল —আ মলো যা, টোপরখানা বৈঠকখানার সম্মুখে রেখেই মেয়েটা চলে গেছে! নবাব আর কি! সে সন্তর্পণে মুকুট লইয়া ভাণ্ডারের দিকে প্রস্থান করিল।

কঙ্কণ চলিয়া গেল—বিনয় একটি কথাও বলিতে পারিল না। তাহার জীবনে আকস্মিকতা কত অদ্ভুত খেলা খেলিয়া গিয়াছে, কত বিষম গ্রন্থি পাকাইয়া দিয়াছে, আজ একেবারে চরম করিয়া গেল। নূতন অট্টালিকা গৃহপ্রবেশের লগ্নে ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিলে যেমন হয়, বিনয়ের অবস্থাটা সেই রকম। সে পাথরের মত বসিয়া ভাবিতে লাগিল, অতীত জীবনের কথা। দুঃখে অতীতকালকে মনে পড়ে, সুখে পড়ে ভবিষ্যৎকে। তাহার গত জীবনের অনেক অস্পষ্টতা বেদনার এক বিদ্যুৎ ঝলকে আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।—চর-চিজমারীতে হাঁস শিকার, পৌষ পার্ব্বণের পিঠা, চরের পুকুরে মাছ

ধরিবার চেষ্টা, দোলের দিনে কঙ্কণের সাজ, ভাদ্রমাসের ভরা নদীতে সেই বিদায়, আর কয়েক মাস আগে তাহার প্রত্যাখ্যান। এই সমস্ত দৃশ্য ছায়াবাজির ন্যায় স্মৃতির শোভাযাত্রায় তাহার চোখের উপর দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিল। ঘটনার সঙ্গে স্মৃতিগুলির প্রভেদ এই যে ঘটনাকালে যাহা নগণ্য ছিল, স্মৃতির সঞ্জীবনী স্পর্শে তাহার অনেকগুলাই অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিনয়ের মনে গত দুই বছরের স্মৃতির তরঙ্গ তোলপাড় করিতে লাগিল। ভবিষ্যতের কথা তাহার মনেই আসিল না। কঙ্কণের ওই বিস্ময়-কাতর মুখচ্ছবি, কোলের ওই নির্ভয়-সুপ্ত শিশুর নিদ্রা, আর কঙ্কণের হাতের বিবাহের মুকুট, এই চরম লগ্নে আকস্মিকতার তীব্রতম শ্লেষের মত বিনয়ের নিকটে বোধ হইল। তাহার মনে পড়িল কঙ্কণের সেই পরিহাস—'বিবাহের সময় আপনাকে মুকুট গড়ে দেবে!' সেই তো আজ বিবাহ, সেই তো ওই মুকুট, তবে এত বেদনা, দুঃখ কিসের! মানুষ ঘটনাকে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার সমাপ্তি মানুষের মুঠার অপেক্ষা অনেক বড়। গিরি-সানুতে যে নির্ঝর অনায়াসে পার হওয়া যায়, সমতল ভূমিতে সেই প্রবাহ-জাত নদীতে ডুবিয়া মরা মোটেই বিচিত্র নয়। জীবনের খেলাঘরে বিনয় যাহাকে পরিহাসের ছলে জীবন দিয়াছিল, সে আজ আরব্যোপন্যাসের জালে-পড়া বিরাট সেই দৈত্যটার মত তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে।

আসন্ন অপরাহ্ণে অন্তঃপুরে বিবাহের কোলাহল বাড়িয়া চলিল, কিন্তু সেদিকে বিনয়ের কান ছিল না। হঠাৎ তাহার কানে পদ্মার কল্লোল প্রবেশ করিল। বিনয় বাহিরে তাকাইয়া দেখিল আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আসন্ন দুর্যোগের স্তব্ধতায় পদ্মার কল্লোল দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মবিস্মৃত বিনয় ঘর হইতে বাহির হইয়া

পড়িল। বিবাহের দিনে বর সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য, কাজেই কেহ তাহার খোঁজ করিল না। সে পদ্মার তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৬

পদ্মার সে এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি—যেন অসুরবধের অব্যবহিত পূর্ব্বে চণ্ডী। এখনো সে জাগিয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার আসন্ন ভীষণতার পরিচয়ে সমস্ত প্রকৃতির অঙ্গ ছম ছম করিতেছে। আকাশ ছেঁড়া-ছাড়া বারুদবর্ণ ধূসর মেঘে পূর্ণ; কেবল এখনো দিগন্তের কালো বনের মাথার উপর দিয়া এক ফালি বিবর্ণ আকাশ দৃশ্যমান। পশ্চিমে মেঘের চোরা পাথরে লাগিয়া যেখানে সূর্য্যাস্তের ভরাডুবি হইয়াছে, সেখান হইতে বিবর্ণ পাটল একটা আলোআঁধারি ভাব চারিদিকের অন্ধকারকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

এ পদ্মা যেন মানুষের বহুদিনের জানা সে নদী নয়। মানুষের কোনো পরিচয় ইহার আশেপাশে নাই। জলে একখানি নৌকাও নাই, তীরে শস্য নাই, গরু নাই, রাখাল নাই—জনপ্রাণী নাই। যতদূর চোখ চলে পূবে পশ্চিমে উত্তরে—কেবল জল থৈ থৈ করিতেছে—ঢেউয়ের পরে ঢেউ, তারপরে ঢেউ। বর্ষার ঘোলা স্রোত অলৌকিক অন্ধকারে মসীবর্ণ, অজগরের চর্ম্মের মত। পৃথিবীতে যেন আর কোনো শব্দ নাই, কেবল কোটি কোটি তরঙ্গের করতালের অদ্ভুত একটা একতান। মনোযোগ দিলে তাহা কর্ণগোচর হয়, নতুবা সে এমনি, বিরাট যে হঠাৎ শ্রুতিগোচর হইতে চাহে না। বিনয়

চমকিয়া উঠিল—বিরাট একটা গর্জ্জন। তাহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। তবে কি সত্যই পদ্মা জাগিয়া উঠিল, না, পাড়-ভাঙার শব্দ। সে শব্দ যে কি ভীষণ, কি অপার্থিব, তাহা যে পদ্মার এমন অবস্থায় না শুনিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বুঝান যাইবে? বিনয়ের মনে হইল, যেন একটা জগৎ ভাঙিয়া চুরিয়া তলাইয়া যাইতেছে। আবার সেই গর্জ্জন!

একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বিনয়ের চোখে পড়িল মাঝ-পদ্মায় কালো একটি রেখা; অনেক স্মৃতির চরচিলমারী। ভাঙন কি ওইখানে! তাহার মনে পড়িল, আজ বছর দুই হইল চরে ভাঙন লাগিয়াছে; অত বড় চরটা কতটুকু হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ আবার সেই শব্দ! বিনয়ের আর কোনো সন্দেহ রহিল না যে, এ শব্দ ওই চরচিলমারীর ভাঙনের। বিনয়ের কাছে দুইটি পথ, একটি পিছনে ওই বিবাহ-বাড়ীর, আর একটি সম্মুখে এই নদী পার হইয়া ওই চরের। তীব্র পূবে বাতাস মন্থন করিয়া আসন্ন উৎসবের শানাইয়ের করুণ মিনতি তাহার কানে আসিতে লাগিল। আবার হঠাৎ চোখে ভাসিয়া উঠিল—দুপুর বেলাকার সেই ছবি। সেই ভীত বিস্মিত কঙ্কণ, সেই নির্ভয়-সুপ্ত শিশু! একদিকে চরভাঙার গম্ভীর বৈরাগ্যের ধ্বনি, আর একদিকে ঘর-বাঁধার আশা আনন্দের করুণ শানাই! একদিকে কঙ্কণ, অন্যদিকে পারুল! চর-ভাঙার ঘন ঘন শব্দে বিনয়ের মনের চিন্তা অবধি ধাক্কা খাইয়া বাধা পাইতে লাগিল। সে নদীর ধারে ধারে দৌড়িয়া নৌকা খুঁজিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অন্ধকারে ঘুরিয়া সে একখানি ডিঙি-নৌকা দেখিতে পাইল। ছুটিয়া গিয়া নৌকায় উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া দিয়া ওই চর ভাঙার আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া সে হাল ধরিয়া বসিল। শানাইয়ের করুণ মিনতি তাহাকে বাধা দিতে পারিল না, পাড়-ভাঙার আর্ত্তনাদ তাহাকে আহ্বান করিতেছে!

পদ্মা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে আর নদী নয়, কাল-নাগিনী, প্রলয়ের সহোদরা। সে ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, ফুঁসিয়া, গর্জ্জিয়া, আকাশের গায়ে লেজ আছড়াইয়া, পৃথিবীর উপরে ছোবল মারিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে দেহ পাকাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে তারা নাই, পৃথিবীতে আলো নাই—নাগিনীর ক্রুদ্ধ চক্ষুর মত মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। সেই গিল্‌টি-করা আলোতে যে দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়, তাহা এই নিরেট অন্ধকারের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কোনো খানে স্থলের চিহ্ন নাই, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে ঢেউয়ের মাথায় নিকষকালো ভাস্বরতা, পাশেই গভীর অন্ধকার! মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, দুরন্ত পূবে বাতাস বৃষ্টিধারার বর্শা বাঁকা করিয়া ধরিয়া ঘোড়সওয়ারের মত ছুটিতেছে। বজ্র গর্জ্জিতেছে, বিদ্যুৎ নাচিতেছে, বাতাস শ্বসিতেছে, জল ডাকিতেছে; বজ্র বিদ্যুৎ, জল হাওয়া সকলে মিলিয়া পৃথিবীটাকে একেবারে উচ্ছন্ন দিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়াছে।

বিনয় অনুমানে চরচিলমারী লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। চারিদিকের বিপুল গর্জ্জনে এমন প্রলয়ঙ্কর একতান উঠিয়াছে যে, সব সময় তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। মাঝে মাঝে আর্ত্ত জলচর পাখীর তীব্র চীৎকারে শরীর শিহরিয়া ওঠে। এতদিন যে সমস্ত হতভাগ্য পদ্মার কবলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আজ যেন তাহারা বিনয়কে দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। পূবের বাতাসে তাহাদেরই নিশ্বাস, বৃষ্টির শীতলতায় তাহাদেরই অস্থিসার আঙুলের স্পর্শ, পাণ্ডুর বিদ্যুতে তাহাদেরই দন্তহীন মুখের হাসি। এক একবার বিদ্যুৎ চমকায়, বিনয়

দেখিতে পায়, একলক্ষ ডাকিনী সঙ্গে করিয়া মুক্তকেশী পদ্মার বীভৎস নৃত্য। জল বজ্রের অনুকরণে কড়্ কড়্ করিয়া ডাকিতেছে, পূবে বাতাস একদল পলাতক বন্য ঘোড়ার মত হ্রেষা তুলিয়া ছুটিতেছে, বিনয় হাল ধরিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে।

এই একতান ভেদ করিয়া একটা অদ্ভুত প্রলয়ের রব বিনয়ের কানে আসিল, সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিল, বিনয় দেখিল একটা কালো দাগ—চরচিলমারীর ভগ্নাবশেষ! সে শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হইতে লাগিল —যেন একদল সৈন্য উন্মত্তভাবে কোন্ দুর্গপ্রাকার আক্রমণ করিতেছে, বারংবার বিফল হইয়া অন্ধ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। সেই অবিচ্ছিন্ন আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া, এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্য সব শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া পাড় ভাঙিবার ধ্বনি। সে ধ্বনি ক্রমে অবিরল হইয়া উঠিল, চরচিলমারীর আজ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

একবার বিদ্যুৎ চমকিল, বিনয় দেখিল, তাহার নৌকা চরচিলমারীতে পৌঁছিয়াছে। চরটা এত ভাঙিয়া গিয়াছে যে, আর চিনিবার উপায় নাই। নৌকা একেবারে কঙ্কণের বাড়ীর কাছে আসিয়া লাগিল। পুনরায় বিদ্যুৎবিকাশে বিনয় দেখিতে পাইল সদ্যোভগ্ন মাটি ভেদ করিয়া বনঝাউ ও খেজুরের শিকড়জাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা ব্যাকুল মুষ্টিতে মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। গাছগুলি কাত হইয়া পড়িয়াছে, স্রোতের তাড়নায় দু'চারবার কাঁপিতেছে, তারপরে তলাইয়া গিয়া একবারের জন্য জাগিয়া উঠিয়া ভাসিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। বিনয় বিদ্যুতালোকে দেখিল একটা গাঙ্ শালিক খোপ ছাড়িয়া উড়িয়া বাহির হইল, তাহার গোটাদুই শাবক জলে পড়িয়া গেল, পাখীটা বারকয়েক আর্ত্তনাদ করিয়া সেখানে চক্রাকারে ঘুরিল তারপরে

আর কিছু দেখা গেল না। মাঝে মাঝে এক খণ্ড ধানের ক্ষেত নিঃশব্দে ধীরে জলের তলে তলাইয়া যাইতেছে।

কঙ্কণের অবস্থা যে কত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, বিনয় তাহা এই প্রথম বুঝিল। সে উচ্চস্বরে কঙ্কণের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। প্রকৃতির সেই কোলাহলময় নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বরেই বিনয় চমকিয়া উঠিল।

কোথায়ও জনপ্রাণী নাই, কোথায়ও মানুষের কোন চিহ্ন নাই, কেবল বিনয়ের সেই আর্ত্তকণ্ঠ মাঠে মাঠে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। বিদ্যুতের আলো—বিনয় দেখিল অদূরে একটি রমণী-মূর্ত্তি। বারংবার বিদ্যুৎ-সঞ্চারে সে দেখিল, কঙ্কণ শিশুটিকে কোলে করিয়া আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। মাথায় তাহার গুণ্ঠন নাই, প্রলম্বিত কেশ বাহিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতেছে। সিক্ত শ্বেতবস্ত্র গায়ের সহিত সংলিপ্ত হইয়া গিয়া নিশ্চল সেই মূর্ত্তিকে ভাস্কর্য্যের স্থাণুত্ব দিয়াছে। বিনয় একটা শক্ত গাছের গুঁড়িতে নৌকা বাঁধিয়া তাহার নিকটে গেল। বিদ্যুতের সর্ব্বনাশা আলোতে দুজনের শুভদৃষ্টি হইল। কঙ্কণ বিনয়কে দেখিয়া মোটেই বিস্মিত হইল না। শিশুপুত্রকে লইয়া জগৎশেষের জীবযুগ্মের মত সেই দুই মূর্ত্তি—আর চতুর্দ্দিকে ঘনায়িত মৃত্যু। জগৎব্যাপী যে প্রলয়ের স্রোত বহিতেছে, যাহার এক তরঙ্গের শীর্ষে পৃথিবীর জীবলীলা তাহারই অন্য তরঙ্গের মাথায় এই তিনটি প্রাণীর সমাবেশ। উদ্যতখড়্গ ঘাতক যেমন সৌজন্যের খাতিরে দণ্ডিতের নিকটে অনুমতি গ্রহণ করে তেমনি করিয়া তাহাদের পদপ্রান্তে আসিয়া স্বয়ং মৃত্যুকেও একবার থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

কঙ্কণ আজ কাঁদিল কিন্তু আকাশপ্লাবী বৃষ্টিধারায় সে অশ্রু দেখা গেল না। কঙ্কণ আজ হাসিল কিন্তু মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবিকাশে তাহা

মিলাইয়া গেল। হাসিকান্নায় যতখানি প্রকাশ কঙ্কণ করিল, বুকের ভিতর আর কোনো ভাব থাকিলে তাহা মুখের ভাষায় প্রকাশ পাইত না।

বিনয় কঙ্কণকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেল, কঙ্কণ শিশুটিকে তাহার কোলে সমর্পণ করিল। বিনয়ের বুকের ভিতরে ছাঁৎ করিয়া উঠিল, এই পাষাণ-প্রতীক কি সেই কোমলহৃদয় কঙ্কণ! কিসে তাহাকে এমন কঠিন করিয়া তুলিল! বিনয়, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, সমস্ত পাথরই এক কালে কোমল মাটি ছিল! বহু লক্ষ বৎসরের দুঃসহ নিষ্পেষে ভূস্তর প্রস্তর হইয়া উঠিয়াছে। বিনয় বুঝিল ওই নারী মূর্ত্তি অদূরে হইলেও বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—কঙ্কণ! কঙ্কণ অতি মৃদুস্বরে যেন প্রাণের মধ্য হইতে উত্তর দিল—বিনয়! তবে তো সে দূরে নয়, কিন্তু এত নিকটেই বা কেন? যে দূরত্বকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরা যায়, আজ যেন সর্ব্ব রকমে তাহার অতীত!

—কঙ্কণ, নৌকা তৈরী, চল।

কঙ্কণ বলিল—চল। বিনয় একটু স্বস্তি বোধ করিল, তবে তো সে এখনো আয়ত্তের অতীত নয়। দুই জনে নৌকার দিকে চলিল।

বিনয় শিশুটিকে লইয়া নৌকায় চাপিল, কঙ্কণ তীরে দাঁড়াইল। বিনয় বলিল,—কঙ্কণ, নৌকায় ওঠো, কখন যে কোন জায়গা ভেঙে পড়ে ঠিক নাই।

কঙ্কণ এক পা-ও নড়িল না। বিনয় পুনরায় ডাকিল—কঙ্কণ, লক্ষ্মী,—এসো।

কঙ্কণ নড়িল না। বলিল,—শোনো বিনয়—

তাহার স্বরে কি ছিল জানি না, বিনয়ের গা ছম ছম করিয়া উঠিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

কঙ্কণ বলিল,—শোনো বিনয়। মনে অনেক কথা ছিল, বলবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কেন জানি না, কোনোদিন প্রকাশ করতে পারিনি।

বিনয় নিস্তব্ধ নীরব।

—বিধাতা নাকি অন্তর্য্যামী, তিনি নাকি মনের সব কথাই জানেন, কিন্তু তার মধ্যে কেন বিদ্রূপটাকেই সত্য করে তোলেন, তিনিই জানেন।

চকিতের মধ্যে বিনয়ের মনে বছর দুই আগেকার এক কথা, আর আজ দুপুরের এক দৃশ্য সঞ্চারিত হইয়া গেল।

—বিদ্রূপটা হয়ত তার স্বভাব, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সান্ত্বনাও তিনি—

কঙ্কণের কথা শেষ হইতে পারিল না, যে জমিখণ্ডে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা কোনো প্রকার সঙ্কেত মাত্র না করিয়া নিঃশব্দে তলাইয়া গেল। বিনয় চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে যে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে সে উপায় নাই—কোলে শিশুটি।

বিসর্জ্জনের প্রতিমার মত নিশ্চল কঙ্কণমূর্ত্তি অগাধ জলের তলে উন্মত্ত স্রোতের টানে, কোথায় চলিয়া গেল।

বিনয় পাগলের মত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—কিন্তু কেহ উত্তর দিল না, কোনো দিক হইতে জীবনের কোনো সাড়া আসিল না।

যে বিধাতা মানুষের মনে এত কথা দেন, যে বিধাতা শেষ মুহূর্ত্তে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা দেন, প্রকাশের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি এমনি করিয়াই তাহাকে জলের তলে তলাইয়া দেন। কঙ্কণের শেষ মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা হয়তো জীবনের শেষ অভিজ্ঞতা।

'বিদ্রূপকরা বিধাতার স্বভাব, কিন্তু সান্ত্বনাও তিনি'—! সত্যই কি তিনি সান্ত্বনা দেন! কেমন করিয়া বলিব? কঙ্কণের মনে কি ছিল, তাহাতো জানিতে পারা গেল না।

শিশুপুত্রকে লইয়া বিনয় নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের দুর্য্যোগের কাছে প্রকৃতির দুর্য্যোগ তুচ্ছ হইয়া গেল। পদ্মা মানুষের সুখদুঃখের কোনো সন্ধান করিল না, সে আপন মনে আপন সত্তায় সঞ্জীবিত হইয়া বহিয়া চলিল। সেতো মানুষের নদী নয়, সে বিরাট কালনাগিনী—প্রলয়ের সহোদরা।